সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬

১৯-২৫ জুলাই

জল আছে যেখানে মাছচাষ সেখানে

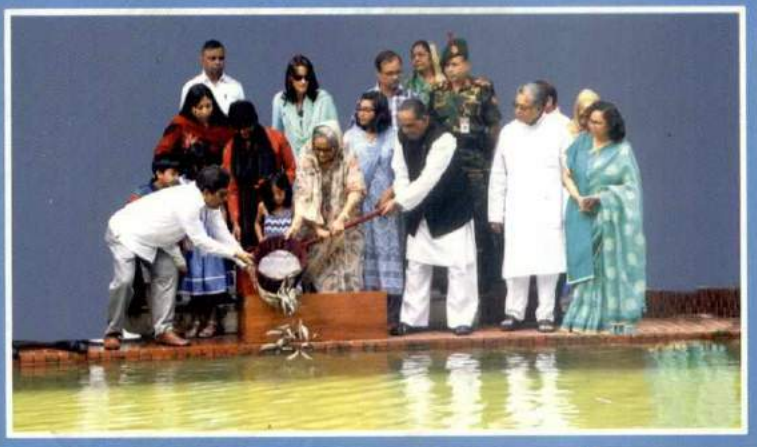

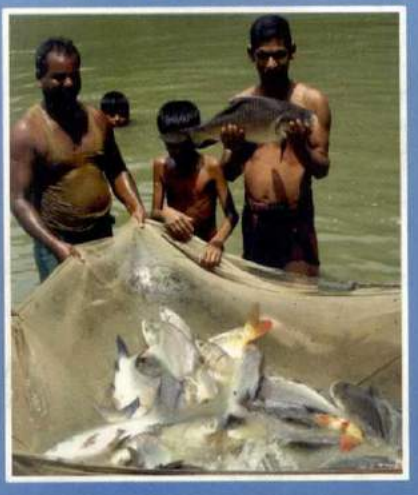

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬

জল আছে যেখানে
মাছচাষ সেখানে

সম্পাদনা পরিষদ

সৈয়দ আরিফ আজাদ	মহাপরিচালক	প্রধান উপদেষ্টা
পরিমল চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	সভাপতি
মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপপরিচালক	সদস্য
মোঃ আবুল হাশেম সুমন	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (পিআরএল)	সদস্য
মোঃ মজিবুর রহমান	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ হুমায়ুন কবির খান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ	সহকারী পরিচালক	সদস্য
কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
আয়েশা সিদ্দিকা	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মনোয়ার হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৬

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমি, মৎস্য অধিদপ্তর

প্রচার সংখ্যা
৮,৫০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ ও অলংকরণ
স্প্যারো কমিউনিকেশন
২৭৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা
sparrow.com@gmail.com

Citation: DoF.2016. National Fish Week 2016 Compendium (In Bengali).
Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 148p.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৪ শ্রাবণ ১৪২৩
১৯ জুলাই ২০১৬

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, ব্যবসায়ী, মৎস্য বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান অপরিসীম। জনগণের শতকরা ৬০ ভাগ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহসহ গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাতের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সরকার মৎস্য খাতের বিপুল সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উন্নত প্রযুক্তির মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাটকা সংরক্ষণ, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ফলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ আহরণে বিশ্বে ৪র্থ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যা মৎস্য খাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় দেশের অর্থনীতিতে বিশাল সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দেশের সমৃদ্ধি ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মৎস্য খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে একাত্ম হয়ে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'জল আছে যেখানে, মাছ চাষ সেখানে' যথার্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬' এর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ শ্রাবণ ১৪২৩
১৯ জুলাই ২০১৬

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও "জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ" উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীসহ মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর প্রতিপাদ্য "জল আছে যেখানে, মাছ চাষ সেখানে" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত। বর্ধিত জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ দেশের ১১ শতাংশের বেশী মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্যখাতের ওপর নির্ভরশীল।

সরকার মৎস্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও কুচিয়াসহ সকল প্রকার মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার, জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তি মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণের ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৩৬ লক্ষ ৮৪ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষে বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিটি জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনা একান্তভাবে প্রয়োজন।

মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আমরা গভীর সমুদ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মালিকানা অর্জন করেছি। বিশাল এই সমুদ্র এলাকার মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে আমরা বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় করেছি। এই জাহাজের মাধ্যমে আমরা সমুদ্র এলাকায় মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ করতে সক্ষম হব। এছাড়া আমরা বিশাল সমুদ্র এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এসকল পদক্ষেপ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মৎস্য আহরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছে। বিপুল সম্ভাবনাময় মৎস্যখাত এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মৎস্যখাতের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাই আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৪ শ্রাবণ ১৪২৩
১৯ জুলাই ২০১৬

বাণী

আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ জনগোষ্ঠি তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে অনাদিকাল হতে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ওপর নির্ভর করে আসছে। দ্রুত বর্ধণশীল জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদার প্রায় ৬০ ভাগ যোগান দিচ্ছে মাছ। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ উন্নত ও সহজপাচ্য আমিষ হওয়ায় জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে মাছ অত্যন্ত উপযোগী একটি খাদ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের চিংড়ির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উভয় ধরনের মৎস্যসম্পদের এমন বিশাল ভাণ্ডার সারাবিশ্বে বিরল। অমিত সম্ভাবনাময় আমাদের সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ও সহনশীল ব্যবহার প্রয়োজন। ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। বর্তমান সরকার আমাদের সমুদ্রসীমায় গবেষণা ও জরিপকাজ পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মাছের মজুদ নির্ণয় এবং মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সর্বোচ্চ আহরণমাত্রা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে আর ভি মীন সন্ধানী নামে একটি অত্যাধুনিক জরিপ ও গবেষণা জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্যে সমুদ্রে ৬৫ দিন বাণিজ্যিক ট্রলারের মাধ্যমে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জরিপকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক ও মৎস্যবান্ধব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সকলের অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাও একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের উন্নয়নের গতিধারাকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছরের ন্যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর এবারও ১৯-২৫ জুলাই **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** উদযাপন করতে যাচ্ছে।

এবারের প্রতিপাদ্য **জল আছে যেখানে, মাছ চাষ সেখানে**। আসুন আমরা এ বার্তা ছড়িয়ে দেই সবার কাছে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের দেশ মৎস্যসম্পদে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৪ শ্রাবণ ১৪২৩
১৯ জুলাই ২০১৬

বাণী

বৈচিত্রময় জলজসম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অপরিসীম। সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিশাল সামুদ্রিক জলরাশি ও মিঠাপানির আধার এ দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৯-২৫ জুলাই পর্যন্ত **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** উদযাপিত হচ্ছে।

পরিবেশ বান্ধব টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে মৎস্য সেক্টর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়ে সমুদ্র বিজয়ের ফলে স্বাদু পানির মৎস্যচাষ ও আহরণের পাশাপাশি লোনা পানির মৎস্যচাষ ও আহরণের বিপুল ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

জাটকা সংরক্ষণ, মা ইলিশ রক্ষা কর্মসূচি এবং ইলিশের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সফলতার সাথে পালিত হচ্ছে। যার ফলে বিগত কয়েক বছরে ইলিশের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া নিরাপদ উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরুষ ও নারী মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ করা হচ্ছে। মৎস্য সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ বেশ লক্ষ্যণীয়। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জল আছে যেখানে, মাছ চাষ সেখানে এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** উদযাপন উপলক্ষে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৪ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৯ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিস্তীর্ণ সাগর, পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় জলাশয়ে পূর্ণ আমাদের বাংলাদেশ। আবহমান কাল থেকে মাছ ও মৎস্যসম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান ৩.৬৫ শতাংশ। কৃষিজ জিডিপিতে এখাতের অবদান প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩.৮১ শতাংশ)। রপ্তানি আয়ের প্রায় দুই ভাগ আসে মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। বিশাল এ জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে অতি আহরণ, জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। কৃষিতে ক্ষতিকর কীটনাশকের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ ও কারখানার দূষিত বর্জে আমাদের প্রাকৃতিক ও মুক্ত জলাশয় ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। আর এ দূষণের অন্যতম শিকার হচ্ছে আমাদের মৎস্যসম্পদ। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সাধারণ মানুষকে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন করা এবং এ সম্পদকে সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** উদযাপিত হচ্ছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য মৎস্যসম্পদের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও মজবুত ও স্বনির্ভর করা এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে দেশবাসীকে অধিকতর সচেতন, নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ ও আগ্রহী করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা ও পেশাজীবীসহ সকল মহলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

'জল আছে যেখানে
মাছ চাষ সেখানে'

এবারের **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** এর উপরোক্ত শ্লোগানটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ মৎস্য সপ্তাহের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ সপ্তাহের সকল কর্মসূচী সাফল্যমন্ডিত হউক এ কামনা করি।

(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৯ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

মুখবন্ধ

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ, সুচিন্তিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাঙ্ক্ষিত প্রণোদনা প্রদান, কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা ও চাষি ভাইদের নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে মাছের মোট উৎপাদন হয়েছে ৩৬.৮৪ লক্ষ মে.টন। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৩.৬৫ শতাংশ মৎস্যখাত হতে আসে। বিগত ১০ বছরে এখাতে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৩১ শতাংশ এবং বিগত সাত বছরে এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর। মৎস্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ সারাবিশ্বে আলোচিত ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কার্যকর ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের ফলে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরো দৃঢ় ও স্বনির্ভর করার পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের চাষ উপযোগী প্রতিটি জলাশয়ের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **"জল আছে যেখানে, মাছচাষ সেখানে"** এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ১৯-২৫ জুলাই দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** উপলক্ষে মৎস্য বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ মূল্যবান সংকলনটি যাদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে আমরা তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে স্থানাভাবে কিছু লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি, এজন্য আমরা দুঃখিত। একই কারণে কিছু লেখা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাই তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংকলনটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ডফিশ, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রকাশনার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের মৎস্যসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়নে সকল উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণকর্মী, মৎস্যবিজ্ঞানী, উন্নয়ন সহযোগী, মৎস্যচাষের অগ্র-পশ্চাৎ সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবো- **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬** উদ্‌যাপনের সন্ধিক্ষণে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সৈয়দ আরিফ আজাদ

সূচিপত্র

মৎস্যখাতে অর্জন ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ১৩
সৈয়দ আরিফ আজাদ

অপ্রচলিত জলজ সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও সম্ভাবনা ২২
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

মৎস্য উৎপাদনের স্থিতিশীলতা রক্ষায় কৌলিতাত্ত্বিক ধারণা ২৭
ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারে আহরিত বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির বর্তমান অবস্থা ৩২
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন ও সুমন বড়ুয়া

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : মৎস্য সেক্টর পরিপ্রেক্ষিত ৩৬
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে নারীর সম্পৃক্ততা ঃ ইকোফিস প্রকল্পের উদ্যোগ ৩৯
সাফিনা নাজনীন ও ড. এম এ ওহাব

ব্লু-ইকোনমি ঃ সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত ৪৩
মুহাম্মদ মামনুর রশিদ, কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান ও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন

মহানন্দা নদীতে খাঁচায় মাছচাষ ঃ একটি সফল সম্প্রসারণ উদ্যোগ ৪৭
ড. মোঃ আমিমুল এহসান ও এম আই গোলদার

মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রমের গুরুত্ব ঃ প্রেক্ষিত বাইক্কা বিল ৫১
ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন ও ড. মোঃ আবদুল কাইয়োম

ইলিশ উৎপাদনে ভরা প্রজনন মৌসুমে ১৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ের প্রভাব ৫৪
ড. মোঃ আনিছুর রহমান, ফ্লোরা ও মোঃ মেহেদী হাসান প্রামানিক

চরম সংকটাপন্ন মহাশোল ঃ বর্তমান অবস্থা ও সংরক্ষণে করণীয় ৫৮
মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির, ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার ও ড. মোঃ ফজলুল আউয়াল মোল্লাহ্

নারীর ক্ষমতায়নে মৎস্যচাষ ৬২
আয়েশা সিদ্দিকা ও ড. মোহাঃ সাইনার আলম

মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়ার সাথে মাগুর ও গুলশা মাছের মিশ্র চাষ ৬৫
ড. এএইচএম কোহিনুর ও মোঃ মশিউর রহমান

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণে ইকোফিস প্রকল্পের উদ্যোগ ৬৮
ড. এম জলিলুর রহমান, এম আই গোলদার ও ড. এম এ ওহাব

নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ৭১
মোঃ হুমায়ুন কবির খান, নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও আ ক ম আজিজুল হক মোল্লা

স্বাদুপানির কুঁচিয়ার নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল ৭৬
ড. ডেভিড রিন্টু দাস, সোনিয়া শারমীন ও মোঃ মাহমুদুর রহমান

বাংলাদেশে কাঁকড়া চাষ ৭৯
ড. বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে লিফদের ভূমিকা ৮৪
জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক ও সৈয়দ মোঃ আলমগীর

মৎস্যখাতের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ জনবল তৈরির আবশ্যকতা ৮৭
ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার ও মনিকা দাস

বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিস ড্রায়ার - মানসম্মত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ শুঁটকি মাছ তৈরির উপযোগী পদ্ধতি ৯০
এহসানুল করিম ও ড. মো: ইনামুল হক

সংযোগ মৎস্য চাষি জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন কাইয়ার সাফল্যগাঁথা ৯৩
বেগম ফরিদা বেগম, মোঃ আব্দুল মজিদ ও এসএম রেজাউল করিম

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সঙ্কটে বাংলাদেশের মৎস্যখাত : জলবায়ু অভিযোজন বিষয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ৯৫
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক ও মোঃ হুমায়ুন কবির

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিরোধের কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধান ৯৯
অজিত কুমার পাল, ড. আইভিন রসকাফট ও নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

পারসে মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন ১০২
ড. শ্যামলেন্দু বিকাশ সাহা ও সৈয়দ লুৎফর রহমান

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত : মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ১০৬
ড. সৈয়দ আলী আজহার

সাগর বেহুন্দি ও ভাসান জাল নির্ভর জেলেদের কর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ১১২
মোঃ কদর আহমদ

খাবারে আফলা টক্সিনের ঝুঁকি প্রশমন ১১৭
প্রফুল্ল কুমার সরকার

বাংলাদেশের মাছ ও জলজ সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ১২০
ড. জুবাইদা নাসরীন আখ্‌তার ও ড. মো. খলিলুর রহমান

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৬ ১২৪

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ ১২৬

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১৩৩

মৎস্যখাতে অর্জন ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

Achievement and Development Potential in Fisheries Sector

সৈয়দ আরিফ আজাদ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ -এর তথ্যমতে এদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৩.৬৫ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.৮১ শতাংশ) মৎস্য খাত হতে আসে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক বা ১ কোটি ৮২ লক্ষ লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্যখাত দেশের রপ্তানি আয়েও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষের নব-নব উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, পল্লী অঞ্চলের বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সরকারের উন্নয়ন দর্শন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ২০১২-১৩ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্যখাতে অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো-

- ভিত্তি বছরের তুলনায় চাষকৃত মাছের উৎপাদন ১৮.৬০ লক্ষ মে.টন হতে ৪৫ শতাংশ এবং মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন ৯.৬১ লক্ষ মে.টন হতে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি;
- ভিত্তি বছরের তুলনায় ইলিশের উৎপাদন ৩.৫১ লক্ষ মে.টন হতে ২০ শতাংশ এবং সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ৫.৮৯ লক্ষ মে.টন হতে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি;
- দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬০ গ্রামে উন্নীতকরণ;
- হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য হতে রপ্তানি আয় ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীতকরণ;
- বেকার যুবক ও যুব-মহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

চিত্র: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন লেকে পোনামাছ অবমুক্ত করেন

- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ; এবং
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ।

মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি: সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদামাফিক কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৩৬.৮৪ লক্ষ মে.টন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মে.টন। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৮.৫৫ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়।

বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এখাতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.২২ শতাংশ এবং এ ক্ষেত্রে প্রায় স্থিতিশীলতা বিরাজমান (মৎস্যসম্পদ জরিপ রিপোর্ট, ২০১৫)। প্রবৃদ্ধির এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। ফলে ২০২০-২১ সালে দেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রক্ষেপিত মৎস্য চাহিদা ৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন পূরণ করা সম্ভব হবে।

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, প্রায় ১৪ লক্ষ নারী মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিকের ৮০ শতাংশের অধিক নারী। দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৭ বছরে এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত প্রায় ৬ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, যথা- নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ৭ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয় -পুকুর, মৌসুমী চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘেরের পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গ কিমি. এবং সমুদ্র উপকূল ৭১০ কিমি.। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন; তিন দশকের ব্যবধানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৬.৮৪ লক্ষ মে.টন। এ সময়ের ব্যবধানে মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষে এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় আঠার গুণ। বিগত ৩২ বছরের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৭.৭৯ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫.৯৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন হ্রাস না পেলেও প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি মূলত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে। দেশের স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের বিশাল সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে Blue Economy -এর অপরিমেয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

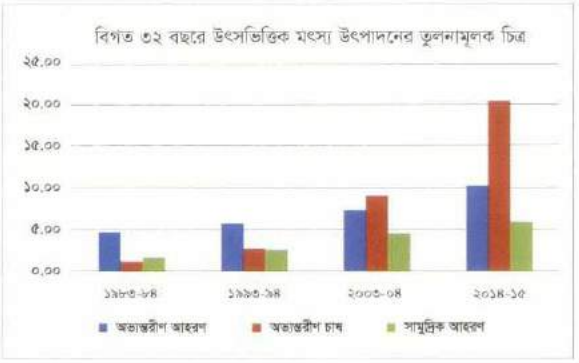

বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ: মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের ৩.৭২ লক্ষ হে. পুকুর-দিঘিতে বার্ষিক হে. প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৪.৩৩ মে.টন। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে হে. প্রতি মৎস্য উৎপাদন ৫.০০ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় খাস জলসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ

চিত্র: পুকরে উৎপাদিত রুইজাতীয় মাছ

এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৩টি সরকারি পুকুর/দিঘি/জলাশয় নিয়ে নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রকল্প ২০১৪ সাল থেকে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জলাশয় খনন ও পুনঃখনন, হ্যাচারি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহের নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় মেরামত, সুফলভোগী নির্বাচন, দল গঠন, সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নয়নকৃত জলাশয়ে পোনা মজুদ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন, উন্নত ব্রুডমাছ, মাছ ও পোনা উৎপাদন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের নিমিত্ত উল্লিখিত চারটি উপজেলার ৮,২৬৮ জন সুফলভোগীকে নিয়ে ৫৪৬টি সুফলভোগী দল গঠন করে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মোট ৫,৪৮৮ হে. আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। এর মধ্যে ঝিনাইদহ ও যশোর জেলার ৬টি বাঁওড়ে মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সরকার মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করেছে। এ সব বাঁওড়ে

চিত্র: দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বাঁওড়ের একাংশ

৯৩৫ জন সুফলভোগী নিয়ে ৬৭টি দল গঠনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বাঁওড় সমৃদ্ধ যশোর এলাকার মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি বৃহত্তর যশোর এলাকায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। জনগণের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁওড়সহ বিভিন্ন জলাশয়ের সংস্কার ও ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। মাছচাষ ও বিভিন্ন সহযোগী কার্যক্রম, যেমন- মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, নার্সারি স্থাপন, বিপন্নপ্রায় দেশীয় মাছের পোনা মজুদ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে।

পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় পার্বত্য এলাকায় ৮২৮টি ক্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬১৮.২২ হে. আয়তন বিশিষ্ট ৬১২টি ক্রিক উন্নয়ন করা হয়েছে, ২১৬টি ক্রিক উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নতুনভাবে উন্নয়নকৃত ক্রিকে ২০১৫ সালে প্রতি হে.-এ গড়ে ৮৬৫ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য জনগণের মাছের চাহিদা পূরণের সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া উন্নয়নকৃত এ সকল জলাশয়ের পানি মাছচাষ ছাড়াও সেচ, গৃহস্থালী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৫,২৫০ জন সুফলভোগীকে মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, ৮২৮টি ক্রিকে প্রায় ২,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে।

চিত্র: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নকৃত একটি ক্রিক

পরিবেশবান্ধব চিংড়িচাষ সম্প্রসারণ: আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি ও পিএল নার্সিং -এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি ঘের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০টি জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস -এর যৌথ উদ্যোগে পিসিআর প্রটোকল তৈরির পাশাপাশি পিসিআর পরীক্ষিত পোনা মজুদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা

হচ্ছে। এলক্ষ্যে কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে আরও একটি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা বর্তমানে কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে।

চিত্র: পুকুরে উৎপাদিত গলদা চিংড়ি

বর্তমানে এসপিএফ (Specific Pathogen Free) বা রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ি আমদানির মাধ্যমে পিএল উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫ সালে প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ এবং ২০১৬ সালে প্রায় ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ পিএল বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্বাদুপানির চিংড়িচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যেই ১৯টি পুরাতন গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং ৬টি নতুন গলদা চিংড়ি হ্যাচারি নির্মাণ করে পিএল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব হ্যাচারিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ৪৫.০০ লক্ষ গুণগত মানসম্পন্ন পিএল উৎপাদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যেই ৪৫,৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কক্সবাজার জেলায় সীমিত পরিসরে আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়িচাষ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪ -এর আওতায় পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়িচাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন: বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের এক-দশমাংশের অধিক আসে শুধু ইলিশ থেকে। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নবায়নযোগ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা। প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সুরক্ষার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৩ দিন ও পরের ১১ দিন (মোট ১৫ দিন) উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ রয়েছে। ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম আশ্বিন মাসে প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন ও পরের ১৭ দিনসহ মোট ২২ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ সংশোধন করে ৪টির স্থলে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। আরো একটি অভয়াশ্রম স্থাপনের বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। কারেন্ট জালের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারদের বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাটকাসমৃদ্ধ ১৫টি জেলার ৮০টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২,৩৬,১৭৬টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৭,৭৮৮ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬,৯০৬ মে.টন। সেখানে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৮ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ১,৯৬,৫৬৯ মে.টন। তাছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় একই সময়ে সর্বমোট ৩২,৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/রিক্সা চালানো, সেলাই মেশিন, মাছ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছচাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সীমিত সম্পদের প্রেক্ষিতে দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী ও স্বাবলম্বী করে তোলা এবং আপদকালীন জীবন-জীবিকা পরিচালনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের

চিত্র: জাতীয় মাছ ইলিশ

তহবিল গঠনের লক্ষ্যে 'একটি বাড়ী, একটি খামার' প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য অনুসৃত মডেলের অনুরূপ সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকারি অনুদানভিত্তিক ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এবং WorldFish বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন USAID সহায়তাপুষ্ট ECOFISH^{BD} প্রকল্পে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন ৪.০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। বিগত দু'বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ২৮৪টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে স্থাপিত অভয়াশ্রমের সংখ্যা ৪৬টি।

চিত্র: টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় স্থাপিত বন্যাবাড়ী মৎস্য অভয়াশ্রম

তাছাড়া ইতোপূর্বে স্থাপিত অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে। অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা- একঠোঁট, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, বাইম ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশী কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। রংপুর বিভাগে মাছের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে তিস্তা ব্যারেজ সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতি সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড -এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। নীলফামারী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলাধীন তিস্তা সেচ ক্যানেল পার্শ্ববর্তী প্রকৃত সুফলভোগীদের নিয়ে সমাজভিত্তিক দল গঠন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

চিত্র: অভয়াশ্রমে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমারোহ

পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন: উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি এবং বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত দু'বছরে উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ১,৪৩১ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। এ সময়ে স্থাপিত বিল নার্সারির সংখ্যা ৯৮৬টি। এ কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত মোট ১৫,০০০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ১,৩০৫ মে.টন পোনা অবমুক্ত এবং ১,৩৬৩টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭০১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। এতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিরও পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় ২ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। এতে জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে ও সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: বিল নার্সারিতে উৎপাদিত পোনামাছ

মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন: প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সব জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত ৭ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২,৬৫০ হে. অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মোট প্রায় ৩২৫ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এ সব জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জলাশয় পুনঃখনন

প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ: রুই-কাতলাজাতীয় মাছের একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের চারণক্ষেত্র এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সরকার প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীকে রক্ষায় নানামুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি. দীর্ঘ মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত ৬ বছরে হালদা নদী থেকে মোট ৩,১৫৯ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ মানের রেণু সংগ্রহ করা হয়েছে, বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৫২৭ কেজি।

উল্লেখ্য, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চার বছরে মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ৮৩২ কেজি; বার্ষিক গড় উৎপাদন ২০৮ কেজি। উপরন্তু হালদার তীরবর্তী অঞ্চলে ৬টি আধুনিক মৎস্য হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। ডিম আহরণকারীরা এসব হ্যাচারি থেকে উন্নত পদ্ধতিতে ডিম পরিস্ফুটন করে অক্সিজেন সহযোগে দেশের দূর-দূরান্তে সরবরাহ করে থাকে। ফলে মাছের রেণু পোনার মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

মৎস্য আইন বাস্তবায়ন: বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রশাসন, পুলিশ, কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর অংশগ্রহণে মৎস্যসম্পদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বেহুন্দী জাল, কারেন্ট জাল, খুটা জালসহ অবৈধ অন্যান্য জাল অপসারণে ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। দুই দফায় ১ মাস ব্যাপী পরিচালিত এ অপারেশনে মোট ২২৫টি মোবাইল কোর্ট ও ৪৩৩টি অভিযানের মাধ্যমে ৬,৩৪৪টি বেহুন্দী জাল, ২,২৯৪টি খুটা জাল, ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার মিটার কারেন্ট জালসহ অন্যান্য আরও ১,০৮৮টি বিভিন্ন রকমের ক্ষতিকর জাল বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করা হয়, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা। এ কার্যক্রমের ফলে ইলিশসহ উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। চলতি বছর থেকে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ রক্ষার্থে সরকার এসআরও নং-৯৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৭ মে ২০১৫ এর মাধ্যমে Marine Fisheries Ordinance 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983) -এর Section 55 -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Marine Fisheries Rules, 1983 -এর Rules ১৮ -এর পর নতুন Rule ১৯ সংযোজন করে। এ নতুন রুলের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য নীতি এবং মৎস্য সংগনিরোধ আইন অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান: প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধিকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক

চিত্র: জেলেদের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ

বাস্তবায়নাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ জেলের নিবন্ধন এবং ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী এক বছরের মধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের আইডি কার্ড প্রদানের ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যথা- ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস এবং জলদস্যুর আক্রমণ, বাঘের থাবা, কুমির ও সাপের কামড়ের কারণে জীবননাশ ঘটলে জেলে-পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত ৪৮৭টি জেলে-পরিবারকে মোট ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিমি. এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত-করণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। জাহাজটি গত ৯ জুন ২০১৬ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে এসে নোঙ্গর করেছে। আগামী নভেম্বর ২০১৬ থেকে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

চিত্র: সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ জাহাজ আরভি মীন সন্ধানী

বাংলাদেশের উপকূল ও সমুদ্রে মোট ৬৭,৬৬৯টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান সহযোগে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মৎস্যজীবী মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে সর্বমোট ২৪৭টি বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে মৎস্য আহরণে ২১০টি এবং চিংড়ি আহরণে মোট ৩৭টি ট্রলার নিয়োজিত। বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-inforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে। চলমান বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ১৩৩টি ফিশিং ভেসেলে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নির্ভর Vessel Tracking and Monitoring System (VTMS) ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে ডিভাইস সংযোজনকৃত ভেসেলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় আহরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ৪টি long liner প্রকারের ফিসিং ট্রলার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) -এর সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Cooperating Non-contracting Party -এর মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং নিরাপদ মাছ সরবরাহ: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে। পরীক্ষণ পদ্ধতির সক্ষমতার মান বিচারে ৩টি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ISO 17025:2005 -এর মান অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। ল্যাবরেটরিসমূহ বিভিন্ন টেস্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলতার সাথে পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করে চলেছে।

চিত্র: মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত এনআইআর মেশিন

বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, এনআরসিপি বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের আধুনিকায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিগত ২০০৯ সনে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানিকৃত ৫০টি কনসাইনমেন্ট বিভিন্ন দূষণের কারণে র‍্যাপিড এ্যালার্টভুক্ত ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল; ২০১৩ সালে র‍্যাপিড এ্যালার্ট শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬২৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এনআরসিপি (NRCP) কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণের জন্য এনআরসিপি ডাটাবেজ (NRCP database) তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র: রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াজাত বাগদা চিংড়ি

বিগত ২০-৩০ এপ্রিল ২০১৫ সময়কালে EU-FVO Audit Team ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের Official Control System এবং Residues & Contaminants Control System -এর ওপর অডিট পরিচালনা করে। এ সময় অডিট টিম ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলায় অবস্থিত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত ট্রলার, মৎস্য ও চিংড়ি খামার সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা, যেমন- ডিপো, আড়ত, বরফকল ইত্যাদি এবং ফিস ফিড মিল ও পশু চিকিৎসার ওষুধের দোকান পরিদর্শন করে। উক্ত অডিট টিমের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক সময়ে খুব অল্প সংখ্যক বাংলাদেশি নন-কমপ্লায়েন্ট কনসাইনমেন্ট বিবেচনায় ইউরোপীয় কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানিকৃত মৎস্য পণ্যের প্রতিটি কনসাইমেন্টের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক দূষণ পরীক্ষা সংক্রান্ত অ্যানালাইটিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট প্রেরণের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত বিধান বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

চিত্র: চিংড়ির ভ্যালু অ্যাডেড প্রডাক্ট

বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৩,৫২৪ মে.টন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ৪,৬৬০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭৫,৩৩৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৪,২৮৩.০০ কোটি টাকা।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্যসম্পদ: বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যখাত বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও বিপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশিরভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে; এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় মৎস্যখাতের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন: কোন সংস্থাকে জনমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে উন্নত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে। মৎস্য খাতে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করে সেবার মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতকে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মৎস্যখাতে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার সুফলভোগীকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন তৃণমূল পর্যায়ের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় একটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ ইনস্টিটিউট থেকে ৪ ব্যাচে ৭০ জন মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেছে। একই উদ্দেশ্যে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের অর্থায়নে গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জে ৩টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এ সব ইনস্টিটিউট থেকে প্রতি বছর ১৬০ জন করে প্রশিক্ষিত কর্মী সৃষ্টি হবে।

চিত্র: জেলে পরিবারের সদস্যদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান: সরকারের ডিজিটাল উদ্যোগের মেরুদন্ড আইসিটি। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রণয়ন করা হয়েছে (www.fisheries.gov.bd)। এতে মৎস্য বিষয়ক সব আইন, বিধি, নীতি-নির্দেশিকা এবং সব ধরনের প্রকাশনা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে যে কেউ এ ওয়েবসাইট থেকে মৎস্যচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, ক্রয়-টেন্ডার, বদলী, পদোন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যায়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা প্রদান এবং অধিদপ্তরের কার্যসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক করার মাধ্যমে অধিকতর গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজড্ সফটওয়ার তৈরি ও প্রচলন করা হয়েছে, যথা- Fish Advise System, E-book, DoF-PDS, MIS, Computer Distribution কাস্টমাইজড্ সফটওয়ার, ইত্যাদি। মাছচাষ ও রোগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানে মোবাইল অ্যাপস্ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ সারা দেশের সকল কর্মকর্তাকে দাপ্তরিক ওয়েবমেইলের আওতায় আনা হয়েছে। কার্যকর ও অতিদ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে দপ্তর ও পদবিন্যাস অনুযায়ী গ্রুপ মেইল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর LAN -এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে; এর মাধ্যমে ডাটা শেয়ার, প্রিন্টার শেয়ার এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের প্রয়োজনীয় ফাইল সার্ভারে রাখতে পারেন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২,৩১২.৮৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও ২০১৬-১৭ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনা
- প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
- উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন
- ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- অবক্ষয়িত জলাশয় সংস্কার ও অভয়াশ্রম স্থাপন
- প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ
- মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা
- বঙ্গোপসাগরে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিলেন্স পদ্ধতি জোরদারকরণ
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ।

উপসংহার

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০২১ সালে ৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন মাছের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে বর্তমান প্রবৃদ্ধির ক্রমধারায় আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মধ্যেই দেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর মাছের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। উপরন্তু মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের দায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' এ হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদমুক্ত এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
dg@fisheries.gov.bd

অপ্রচলিত জলজ সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও সম্ভাবনা

Commercial Use and Prospects of Non-conventional Aquatic Resources

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

Abstract

This paper highlights the commercial importance and prospects of non-conventional aquatic organisms from inland and marine ecosystems of Bangladesh. Besides fish and shrimp, we have large varieties of non-conventional aquatic organisms those have immense potentialities for nutrition security and export earnings. Therefore, the non-conventional aquatic organisms such as snail, mollusk, eel, turtle, crocodile, etc of our inland waterbodies could be brought under culture system. Farming of eel and turtle (especially soft-shell turtle) exists in many Asian countries including Japan, Taiwan, Thailand and Vietnam. Snail, mollusk, eel and turtle are traditionally consumed by minority and tribal communities in the country and have large export potentialities. The meat of crocodile is very costly item in several countries. The skin of crocodile is used to produce bag, wallet, belt and purse. Bone of crocodile is used for producing costly perfume. On the other hand, in marine ecosystem, seaweeds have great potentials in blue economy. Lobster, squids, jelly fish, mud crab and horseshoe crab have also immense potentialities for nutrition supply and export earnings

জলজ সম্পদে আমাদের দেশ খুবই সমৃদ্ধ। আমাদের জলাশয়ে প্রায় ৮০০ প্রজাতির মিঠা ও লোনাপানির মাছ ও চিংড়ি রয়েছে। মিঠাপানির মাছ উৎপাদন বর্তমানে মূলত চাষ নির্ভর এবং লোনাপানির মাছ আহরণ নির্ভর। মৎস্য খাতের উন্নয়ন ভাবনায় আমরা প্রধানত মাছ ও চিংড়িকে বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু মাছ ও চিংড়ি ছাড়াও আমাদের জলাশয়ে বৈচিত্রময় জলজ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু, জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এ দেশের প্রাকৃতিক জলাশয় হতে মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিভিন্ন জলজ প্রাণিকূলের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। দেশের জলজসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত জলজ প্রাণী যেমন- শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচিয়া, কুমির, কচ্ছপসহ সামুদ্রিক প্রাণীর উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রজনন, চাষ ও সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবি। এদেশের জলবায়ু ও পরিবেশ এসব প্রাণীর প্রজনন ও প্রতিপালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এসব অপ্রচলিত কিন্তু অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জলজসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আমিষ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার্জন করা সম্ভব। এতে দেশের অর্থনীতি একদিকে যেমনি সমৃদ্ধ হবে; পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ অবারিত হবে।

মাছ ও চিংড়ির ন্যায় কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক, ঝিনুক, লবস্টার ইত্যাদি সহজে পাওয়া গেলেও, বাণিজ্যিকভাবে এগুলোর চাষ এখনও শুরু হয়নি। তবে দেশে উদ্যোক্তা পর্যায়ে অপ্রচলিত প্রাণী যেমন কুমিরের খামার গড়ে ওঠেছে। এসব জলজ প্রাণীর ব্যাপক পারিবেশিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও এসব প্রাণীর চামড়া দিয়ে ব্যাগ, পার্স, বেল্ট, ওয়ালেট, কাফলিংক প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

অপরদিকে সী-উইড একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ সামুদ্রিক খাদ্য যার তেমন ব্যবহার আমাদের দেশে নেই। অথচ এটি উপকূলীয় অঞ্চলে একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হতে পারে। অপ্রচলিত মৎস্য বা জলজ সম্পদ বিষয়ে গবেষণা এদেশে অত্যন্ত সীমিত। চাহিদা ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ বিষয়ে তাই গবেষণা জোরদারকরণসহ লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও সম্ভাবনার বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

শামুক-ঝিনুক চাষ
(Snail aquaculture)

বাংলাদেশে শামুকের প্রায় ৪৫০টি প্রজাতি রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্য দুটি প্রজাতি হলো *Pila globosa* (আপেল শামুক) ও *Viviparus bengalensis* (পন্ড স্নেইল)। সাধারণত শামুকের মাংসল অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা খাদ্য হিসেবে শামুক গ্রহণে অভ্যস্ত নই। তবে এদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী খাদ্য হিসেবে শামুক আহার করে থাকে। এছাড়া শামুকের ব্যাপক ব্যবহার হয় বাগদা বা গলদা চিংড়ির খাদ্য হিসেবে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চিংড়ি ঘেরগুলোতে দিনে প্রায় গড়ে ৬৬.৫ কেজি/হেক্টর শামুকের মাংস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর একটি অংশ শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীতে ক্ষুদ্র পরিসরে পুকুরে শামুকের চাষ করে থাকে। শামুক পুকুরে বায়ো-ফিল্টারের কাজ করে বিধায় পানির গুণাগুণ ভালো থাকে। মানুষ ও মাছের খাদ্য হিসেবে শামুকের চাহিদা থাকায় বাংলাদেশে শামুক চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শামুক চাষে দেশের অনগ্রসর উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বল্প খরচে আমিষ চাহিদা পূরণ হতে পারে। পুকুরে মাছের সাথে শামুকের পরিকল্পিত সমন্বিত চাষ বা এককভাবে শামুকের চাষ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাদু ও লবণাক্ত পানিতে প্রায় ১৬ প্রজাতির ঝিনুক পাওয়া যায়। সুদূর অতীত থেকে ঝিনুক হতে মুক্তা আহরণ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে জলাশয়ে ঝিনুকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ঝিনুকে আর আগের মতো মুক্তা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে স্বাদুপানির ঝিনুক থেকে মুক্তা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। বিশেষ কৌশলে ঝিনুকে মেন্টাল টিস্যু ঢুকিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গভীরতার পুকুরে লালন করা হয়। এতে ৮-১০ মাসেই ঝিনুকে ২ থেকে ৩ মিমি সাইজের মুক্তা উৎপাদিত হয়; যা রাইস পার্ল নামে পরিচিত। এছাড়া ঝিনুকে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তিও ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যচাষি বিশেষত গ্রামীণ মহিলাদের মাঝে সম্প্রসারিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও নারীর ক্ষমতায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে, ঝিনুকের খোলস থেকে উন্নতমানের চুন তৈরি এবং এদের মাংসল অংশ হাঁস-মুরগির খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। জলজ পরিবেশে ঝিনুকের সহনশীল মাত্রায় উৎপাদন বজায় রাখার জন্য এর চাষাবাদ অপরিহার্য। জলজ পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং শামুক-ঝিনুকের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে শামুক-ঝিনুক চাষ বিষয়ক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া সাগর উপকূলে প্রাপ্য শামুক-ঝিনুক আহরণ বা চাষের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে অবদান রাখা সম্ভব।

চিত্র: চাষযোগ্য শামুক

কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি
(Crab aquaculture)

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে কাঁকড়ার অবদান অনস্বীকার্য। কাঁকড়া (mud crab, *Scylla* spp.) দেশের উপকূলীয় এলাকা হতে বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা হয়। স্ত্রী কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং এবং পুরুষ কাঁকড়ার হার্ডেনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বাজারে বিক্রির উপযোগী আকারের অপরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়ার (গোনাড পরিপুষ্ট নয়) আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা নেই। ফলে এগুলোকে নির্দিষ্ট ঘনত্বে কাঁকড়া চাষের উপযোগী জলাশয়ে রেখে নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার সরবরাহ করা হয় যাতে এগুলো গোনাড পরিপুষ্ট হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়।

চিত্র: নরম খোসার কাঁকড়া চাষ

কাঁকড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় বিএফআরআই গত এক দশকের অধিক সময় ধরে কাঁকড়ার ওপর গবেষণা করে ফ্যাটেনিং কৌশল উদ্ভাবন করেছে যা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফ্যাটেনিং করা কাঁকড়া চীন, হংকং, তাইওয়ানসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি এবং লোনাপানি কেন্দ্র হতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। এতে দেশে কাঁকড়া চাষ সহজ ও ত্বরান্বিত হবে। একই সাথে উপকূলে নরম খোসার কাঁকড়া চাষ রপ্তানি বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হলে প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশের উপকূলে কাঁকড়া চাষ ক্রমশ সম্প্রসারিত হবে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। কাঁকড়ার অন্য একটি ভক্ষণযোগ্য প্রজাতি নীল কাঁকড়া (blue swimming crab, *Portunus pelagicus*) আমাদের সাগরে প্রচুর ধরা পড়ে। বাণিজ্যিক মাছ ধরার ট্রলার বা আর্টিসেনাল নৌকায় সারা বছরই এ কাঁকড়া আহরিত হয়ে থাকে। এ ধরনের কাঁকড়ার আন্তর্জাতিক বাজারে যথেষ্ট বাণিজ্যিক চাহিদা রয়েছে।

চিত্র: খাবার উপযোগী সাগরের নীল কাঁকড়া

কুচিয়া চাষ
(Culture of freshwater eel)

দেখতে সাপের মতো হলেও কুচিয়া এক প্রকার মাছ। এরা স্বল্প অক্সিজেন ও উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। কুচিয়া বাংলাদেশের হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর, ধানক্ষেতে ও বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে পাওয়া যায়। অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ হতে কোরিয়া, হংকং, চায়না, তাইওয়ানসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশে কুচিয়া রপ্তানি হয়ে আসছে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে এ মাছের গুরুত্ব না থাকলেও দেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়। পুষ্টিমান বিবেচনায় কুচিয়ায় পুষ্টির পরিমাণ অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। রক্তশূন্যতা দূরীকরণ, উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে কুচিয়া মাছ খুবই উপকারী। এদেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে কুচিয়ার প্রজাতি পাওয়া যায়, সেটি হলো *Monopterus cuchia.*

চিত্র: প্রণোদিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত কুচিয়া পোনা

কৃত্রিম উপায়ে কুচিয়ার পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন কৌশল বিএফআরআই থেকে ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কুচিয়ার পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি ও প্লাবনভূমি উপকেন্দ্রে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ কুচিয়া চাষের জন্য বেশ উপযোগী। তাই বাংলাদেশে অপ্রচলিত এ কুচিয়া মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র: প্রণোদিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত কুচিয়া

কচ্ছপ চাষ
(Turtle farming)

বিশ্ববাজারে মানুষের উপাদেয় খাদ্য হিসেবে কচ্ছপের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ২৫টি প্রজাতির কচ্ছপ রয়েছে। তবে এদের মধ্যে ১১টি প্রজাতি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কচ্ছপের বিভিন্ন প্রজাতি সাগর থেকে শুরু করে নদী-নালা, পুকুর, ডোবা ও স্থলেও বাস করে। মিঠাপানির কচ্ছপের অধিকাংশই তৃণভোজী এবং এ কারণে এরা জলজ শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতির জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে। ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ এশিয়ার অনেক দেশেই কচ্ছপের বাণিজ্যিক চাষ হয়। এদেশে বিদ্যমান কচ্ছপের বিভিন্ন প্রজাতিসমূহের মধ্যে নরম খোলসধারী কচ্ছপ (*Aspiderestes gangeticus, A. huruma* ও *Lissemys punctata*) চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রণোদিত প্রজনন ও চাষ কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে কচ্ছপের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কচ্ছপ চাষ অনেকাংশে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত বাচ্চা ও সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই এ চাষ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কচ্ছপের কৃত্রিম প্রজনন, ব্যাপক পোনা উৎপাদন ও সম্পূরক খাদ্য তৈরির কৌশল বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক

চিত্র: চাষযোগ্য নরম খোলসধারী কচ্ছপ

পরিবেশে কচ্ছপের প্রাচুর্য নিরূপণের জন্য বিভিন্ন পরিবেশগত অঞ্চলে জরিপ পরিচালনা আবশ্যক। তাছাড়া কচ্ছপের যেসব প্রজাতির বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলোকে শনাক্ত করে এদের প্রজনন আচরণ, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস এবং চাষ পদ্ধতি উন্নয়ন সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।

কুমির চাষ
(Crocodile farming)

অতীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে মিঠাপানির কুমির এবং দক্ষিণাঞ্চলের লোনা পানির নদীতে লোনা পানির কুমির পাওয়া যেত। কিন্তু প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বিভিন্ন নদ-নদী হতে মিঠাপানির কুমির হারিয়ে গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে তিন প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়; মিঠাপানির কুমির (*Crocodylus palustris*), লোনাপানির কুমির (*Crocodylus porosus*) ও ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*)।

IUCN-এর বাংলাদেশ রেড লিস্ট অনুসারে মিঠাপানির কুমির এখন বিলুপ্তপ্রায়, অপর ২টি প্রজাতিও বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। সুন্দরবনের করমজলের নদীতে লোনাপানির কুমিরের প্রজননে সফলতা পাওয়া গেছে, যদিও সুন্দরবনের নদীতে কুমিরের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। পদ্মা ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থল গোদাগাড়ী অঞ্চল, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা এবং যমুনা ও পদ্মার সংযোগস্থল আরিচা-গোয়ালন্দ এলাকায় খুব অল্প সংখ্যক ঘড়িয়াল দেখতে পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে উদ্যোক্তা পর্যায়ে ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ও বান্দরবানে ৩টি কুমিরের খামার গড়ে ওঠেছে। প্রায় এক দশক পূর্বে মালয়েশিয়া থেকে আমদানিকৃত মিঠাপানির কুমির চাষ ও প্রজননের মাধ্যমে এখন বিদেশে কুমিরের মাংস ও চামড়া রপ্তানি হচ্ছে। কুমিরের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। কুমিরের মাংস খাদ্য হিসেবে, চামড়া থেকে ব্যাগ, পার্স ও বেল্ট, হাড় থেকে সুগন্ধি, দাঁত থেকে গহনা এবং চোয়াল চাবির রিং তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কচ্ছপ ও কুমির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রপ্তানিযোগ্য অপ্রচলিত মৎস্য পণ্য হিসেবে বৈদেশিক

চিত্র: খামারে উৎপাদিত কুমিরের বাচ্চা

মুদ্রার্জনেও এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অপ্রচলিত মৎস্য পণ্য হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে কচ্ছপ ও কুমিরের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই এ সম্পদের বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুন্দরবন এলাকায় কুমিরের আধুনিক খামার স্থাপন করে এর উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সুন্দরবন ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলকে পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে। বস্তুত দেশে কচ্ছপ ও কুমিরের ব্যাপক আবাসস্থল ও অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকার কারণে এর ফলপ্রসূ গবেষণা ও প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে এদের রপ্তানির সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপকূলে সী-উইড চাষ
(Sea-weed culture)

সী-উইড সাগরের এক প্রকার তলদেশীয় জলজ উদ্ভিদ। সী-উইড বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ জলজ সম্পদ, পুষ্টি গুণের বিচারে যা বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচ্যে বিশেষত জাপান, চীন ও কোরিয়ায় সনাতনভাবেই দৈনন্দিন খাদ্যে সী-উইড ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপে এর ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও ডেয়রি, ঔষধ, টেক্সটাইল ও কাগজ শিল্পে সী-উইড আগার কিংবা জেল জাতীয় দ্রব্য তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জমিতে সার, প্রাণী

চিত্র: উপকূলে চাষকৃত সী-উইড

খাদ্য ও লবণ উৎপাদনেও সী-উইড ব্যবহার করা যায়। সী-উইডে প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্য বিদ্যমান থাকায় খাদ্যে অণুপুষ্টি হিসেবে এর ব্যবহার গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কক্সবাজার জেলার টেকনাফসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ইনানী ও বাঁকখালী মোহনার আশপাশের পাথুরে ও প্যারাবন এলাকায় জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী স্থানেই অধিকাংশ সী-উইড দেখতে পাওয়া যায়। কক্সবাজার ও পার্বত্য অঞ্চলের রাখাইন ও অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সালাদ ও চাটনি হিসেবে সী-উইড আহার করে থাকে। বিভিন্ন মাছে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়, সী-উইডে তার থেকে বহুগুণ বেশি পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কেবল সেন্টমার্টিন নয় কক্সবাজার উপকূলের অনেক স্থানে সী-উইড চাষ করা সম্ভব। গবেষণা ফলাফল ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের উপকূলে সী-উইড চাষের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

লবস্টার, স্কুইড আহরণ ও মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন
(Capure of lobster and squid and production of value added product)

আমাদের সুবিশাল সমুদ্র জলসীমা অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে রয়েছে মৎস্যসম্পদসহ অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ। এসব সামুদ্রিক সম্পদ নবায়নযোগ্য হওয়ায় টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় অনন্তকাল পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব। সাগরে চিংড়ি ট্রলারসহ আর্টিসেনাল ফিসিং-এ লবস্টার, স্কুইড ধরা পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো বাণিজ্যিকভাবে দেশে-বিদেশে ব্যবহৃত হয়। লবস্টার একটি মূল্যবান আকর্ষণীয় সামুদ্রিক খাদ্য। স্কুইড আমরা না খেলেও বিদেশে এদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত স্কুইড প্রজাতির মধ্যে *Loligo edulis* প্রজাতিটি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র: সাগর হতে আহরণকৃত লবস্টার

আমেরিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে এটি মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্কুইড মেদ কমায়, হাড় মজবুতসহ আর্থ্রাইটিস দূর করে। স্কুইডের নানাবিধ ঔষধি গুণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টিউমারের আরোগ্য সাধন করা। প্রতি ১০০ গ্রাম স্কুইডে প্রায় ৯২ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। মূল্য সংযোজিত পণ্য হিসেবে এদের আহরণ ও বাজারজাতকরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের আলোচিত ব্লু-ইকোনমিতে এ ধরনের মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

চিত্র: সাগরে আহরণকৃত স্কুইড

জেলি ফিসের সম্ভাবনা
(Prospects of jelly fish)

জেলি ফিস সাগরের একটি অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী। শক্তির আধার হিসেবে পরিচিত জেলি ফিস যারা অন্ধকারে নিজেদের শরীরে উজ্জ্বল আলো উৎপাদন করতে পারে। এর দেহে রয়েছে বিশেষ ধরনের গ্রিন ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিন (জিএফপি)। এ প্রোটিন ব্যবহার করে এরা জ্বালানি উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র কোষ তৈরি করতে সক্ষম। ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ মাছের বিশেষ প্রোটিন থেকে সহজেই শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। উন্নত বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ন্যানো পর্যায়ে অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রোডের ওপর জিএফপি প্রোটিন প্রয়োগ এবং তারপর অতিবেগুনি রশ্মি প্রক্ষেপণ করে শক্তি উৎপাদন করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। জেলি ফিস আহরণ ও চাষাবাদের দিকে আমাদের নজর দেয়া প্রয়োজন।

রাজ কাঁকড়ার সম্ভাবনা
(Prospect of horseshoe Crab)

সামুদ্রিক আর্থ্রোপড রাজ কাঁকড়া জীবন্ত জীবাশ্ম (living fossil) হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে ২টি প্রজাতির রাজ কাঁকড়া (*Carcinoscorpius rotundicauda* ও *Tachypleus gigas*) পাওয়া যায়। রাজ কাঁকড়ার রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে না; নীল রক্তে amoebocytes নামক বিশেষ রোগ বিনাশী উপাদান থাকে। যে কারণে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে বাণিজ্যিকভাবে রাজ কাঁকড়ার চাষ ও পরিচর্যা করা হয়। মূলত রক্ত সংগ্রহের পর এদের সাগরে ছেড়ে দেয়া হয়। ঔষধি গুণাবলি ছাড়াও রাজ কাঁকড়ার ডিম একটি মূল্যবান খাবার। অনেক দেশের মানুষ, বিশেষ করে থাইল্যান্ডে রাজ কাঁকড়ার ডিম অভিজাত খাবার হিসেবে পরিচিত। রাজ কাঁকড়ার ডিমে কোনো কোনো সময় টেট্রডোটক্সিন (tetrodotoxin) নামক এক ধরনের বিষ পাওয়া যায়। তাই রাজ কাঁকড়া ডিম খাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া, রাজ কাঁকড়া থেকে টেট্রডোটক্সিন আহরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। অ্যানেসথেসিয়ায় টেট্রডোটক্সিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চমূল্যে তা বাজারে বিক্রয় হয়। অপরদিকে রাজ কাঁকড়া ক্যান্সার প্রতিরোধের ঔষধ হিসেবে সারাবিশ্বে সমাদৃত। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করা গেলে এটি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

চিত্র: রাজ কাঁকড়া

উপসংহার (Conclusion)

দেশের জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন এসব জলজ সম্পদের উৎপাদন, প্রজনন ও সংরক্ষণ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দেশের জলবায়ু ও পরিবেশ এসব প্রাণীর প্রজনন ও প্রতিপালনের জন্য বিশেষ উপযোগী। এসব অপ্রচলিত কিন্তু অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলজসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এতে দেশের অর্থনীতি একদিকে যেমন সমৃদ্ধ হবে পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। আশার কথা, বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকার এ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

মৎস্য উৎপাদনের স্থিতিশীলতা রক্ষায় কৌলিতাত্ত্বিক ধারণা

Genetic Implications for Sustainable Fish Production in Bangladesh

ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্

Abstract

Fish production of Bangladesh is increasing every year. It has registered a yearly rate of increase at 5.35% during last several years. The production was 3.68 million MT in 2014-15. The production has been mainly achieved from aquaculture in inland closed waters and although production from inland open waters of beels, rivers, baors and haors has been on increase since last few years, its contribution to total production has been decreased by about 50% during the last 3-4 decades which is alarming. Fisheries biodiversity of the openwaters has been drastically reduced; the abundance of many species has so much reduced that they appeared to have reached to bottleneck condition and rapidly going to be extinct from the nature. This is really shocking, for, biodiversity of natural waters being subservient to the biological wellbeing of the hatchery populations engaged in seed production for aquaculture. The hatchery stocks of the cultured species are prone to loss of genetic variability in the process of seed production and are needed to change with fresh stocks from nature; the natural stocks are referred to as the repository of hatchery stocks. So, aquaculture production can not be sustained without having been attained an ability to manage and conserve the counterpart natural populations in the openwaters. There is scope of increase of fish production through intensification of aquaculture in the country, however, that would entail a strong preparation for producing genetically good quality fish seed of such a big quantity of the species employed in hatchery which is again daunting at the backdrop that a big array of untrained people engaged in seed production in about 1000 public and private hatcheries leading chances of availability of quality fish seed of such big quantity at a bleak. At this juncture the capability of the DoF with respect to trained manpower and quality of supply and services for extension would be really determining for achieving sustainability of fish production in the country in the near future.

আবহমানকাল ধরে মাছ আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আমাদের খাদ্য, পুষ্টি, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মাছের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জিডিপি'তে মাছের অবদান শতকরা ৩.৬৫ ভাগ এবং কৃষিজ জিডিপি'তে শতকরা ২৩.৮১ ভাগ। দেশের রপ্তানি খাতে মাছের অবদান শতকরা ২ ভাগেরও অধিক। আমাদের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগের যোগান আসে মাছ থেকে। এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগেরও বেশি তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে; যার মধ্যে ১৪ লক্ষেরও বেশি নারী। বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। বিগত ২০১৩-১৪ বছরে মোট ৩৫ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। বিগত এক দশক ধরে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গড় হার শতকরা ৫.৩৫ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

চিত্র: বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা

বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের খাতগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- (১) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় (আহরণ), (২) অভ্যন্তরীণ আবদ্ধ জলাশয় (চাষ) ও (৩) সামুদ্রিক (আহরণ)। বিগত প্রায় তিন দশকের উৎপাদনের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দেশের মোট মাছ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ঘটলেও তাতে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের অবদান ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে। এ দেশে মুক্ত জলাশয় ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯.০৬ লক্ষ হেক্টর ও ৭.৯৪ লক্ষ হেক্টর। বিগত ২০১৩-১৪ বছরে মুক্ত জলাশয় থেকে আহরণ এসেছে প্রায় ১০ লক্ষ মে.টন এবং আবদ্ধ জলাশয়ের চাষ থেকে উৎপাদন এসেছে ২০ লক্ষ মে.টন। সত্তর-আশির দশকে মুক্ত জলাশয়ের অবদান যেখানে শতকরা ৭০ ভাগের কাছাকাছি ছিল বর্তমানে তা শতকরা ২৫-৩০ ভাগে নেমে এসেছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে এত বিপুল পরিমাণ মুক্ত জলাশয়ের আহরণ-অবদান কমতে থাকা নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক এবং অশনিসংকেত। দেশের মুক্ত জলাশয়ের মাছের সার্বিক আন্তঃসেক্টর ব্যবস্থাপনা-পরিকল্পনায় যে একটি বড় রকমের অসাবধানতা (inattention) ও প্রমাদ (wrong) সাধিত হয়ে চলেছে তা অনুমান করা যায়। মুক্ত জলাশয়ের মাছের পপুলেশন হোক কিংবা চাষের মাছের পপুলেশন হোক, তাদের কৃতি (performance) এবং কল্যাণের (welfare) জন্য ঐ পপুলেশনের জেনেটিক উপাদান এবং পরিবেশের গুণাগুণ তথা নন-জেনেটিক উপাদানের উপস্থিতি আদর্শিক পরিমাণে থাকা আবশ্যক।

এ উভয় প্রকারেরই উপাদানের ঘাটতি হলে পপুলেশন প্রকৃতিতে অভিযোজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; পপুলেশন তখন আর ভাল কার্যসাধন (perform) করতে পারে না; এর প্রাচুর্য হ্রাস পায় এবং ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হয়।

মৎস্যচাষের সহজাত দুর্বলতার কারণে হ্যাচারি-উৎপাদিত পোনা মাছে জেনেটিক বৈচিত্র্য লোপ পায়। অর্থাৎ হ্যাচারিতে প্রজননের জন্য ব্রুডমাছ সংগ্রহকালে প্রাকৃতিক পপুলেশনের সঠিক প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা পপুলেশন সংগ্রহ করতে না পারলে সংগৃহীত পপুলেশনে বিভিন্ন জিনের পৌনঃপুনিকতা (gene frequency) হ্রাস পায় যাকে জেনেটিক ড্রিফট (genetic drift) বলা হয়। তাছাড়া ব্রুড মাছ যদি বংশসূত্রে ঘনিষ্ঠ হয় অর্থাৎ তারা যদি একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট হয় তবে তারা একই জিন ধারণ করে; ফলে ওরকম মাছের মধ্যে প্রজননকে অন্তঃপ্রজনন (inbreeding) বলা হয় এবং অন্তঃপ্রজনন সংঘটিত হলে উৎপাদিত পোনা মাছে জিনের সমসত্ত্বতা (homozygosity) বেড়ে যায় এবং অসমসত্ত্বতা (heterozygosity) কমে যায়। ড্রিফট সংঘটিত হলে অন্তঃপ্রজননের হার বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে চাষের পপুলেশনের জেনেটিক বৈচিত্র্য লোপ পায়; পপুলেশন তখন আর ভালো বিবেচিত হয় না; চাষের জন্য দরকারি বৈশিষ্ট্যসমূহের নিরিখে তারা হেয় হয়ে পড়ে। কেবল চাষের উৎপাদন বাড়িয়ে মাছের উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা সম্ভব নয়। এ উৎপাদন স্থিতিশীল রাখতে হলে একদিকে যেমন হ্যাচারি ও ব্রুডমাছের ব্যবস্থাপনায় জেনেটিক নীতি- কৌশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে বদ্ধ জলাশয়ে চাষের জন্য উন্নত জেনেটিক মানের পোনা মাছের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে; তেমনি মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ-প্রতিবেশের উন্নতি ঘটিয়ে মাছের পপুলেশনের প্রাচুর্য/জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

মৎস্য পপুলেশন ও মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ভাবনা
(Fish populations and thoughts on openwater environment)

ক. কৃষির সাথে মাছের স্বার্থের সংঘাত
(Conflicts of interest of fisheries and agriculture)

মুক্ত জলাশয়ের মাছের স্বার্থের সাথে অন্যান্য সেক্টরের যেসব সংঘাত রয়েছে সেগুলোর ভৌগোলিক, পরিবেশ-প্রতিবেশিক এবং জীব-বৈজ্ঞানিক অভিঘাত বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন। বস্তুত কৃষির স্বার্থের সাথে মুক্ত জলাশয়ের মাছের স্বার্থের সংঘাতটি একেবারে প্রাথমিক এবং সবচেয়ে বেশি; প্লাবনভূমি, বিল বা অন্যান্য নিচু এলাকায় ধান চাষের জন্য বন্যার প্লাবন একটি অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত হলেও মাছের জন্য তা আশীর্বাদ। কেননা আমাদের দেশের প্রায় সব প্রজাতির মাছের প্রজনন বন্যার সাথে সম্পর্কিত। অধিক ধান উৎপাদনের সুবিধার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে বহুকাল আগে থেকেই দেশের প্রায় সব প্রধান নদ-নদীর দু'পাড় বেধে দেয়া হয়েছে। ফলে বন্যার সাথে সাথে মুক্ত জলাশয়ের মাছের নদীর দু'পাড়ে ছড়িয়ে পড়ার যে বৈশিষ্ট্যময় উল্লম্ব (longitudinal) এবং আনুভূমিক (lateral) প্রজনন-অভিপ্রয়াণ তা থমকে গেছে; এতে বংশবৃদ্ধি থেমে গিয়ে মুক্ত জলাশয়ের মাছের যারপর নাই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এছাড়া চাষের কারণে বিল/হাওর ভরাট হয়ে যাওয়া, সেচ কাজের ফলে জলাশয় শুকিয়ে যাওয়া, কীটনাশক/বালাই-নাশক ব্যবহারের দূষণ, স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড - পুল/ব্রীজ, রাস্তাঘাট, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণের কারণে মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতির সাথে সাথে মাছের সাধারণ বিচরণ ও প্রজনন-অভিপ্রয়াণে বিঘ্ন ঘটায় মৎস্য জীববৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের নিদারুণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

খ. স্বার্থ-সংঘাতের জেনেটিক ভিত্তি - পপুলেশন বটলনেক
(Genetic basis of the conflicts- population bottleneck)

পরিবেশ-প্রতিবেশ ও মৎস্য জীববৈচিত্র্যে এবং জনসংখ্যার বাড়তি চাপে অতিআহরণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক যথাযথ মানসম্পন্ন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে মুক্ত জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পপুলেশনসমূহে জেনেটিক বৈচিত্র্য (genetic variation) লোপ পায়। ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে ঐ পপুলেশনসমূহ অভিযোজন করার ক্ষমতা (capacity of adaptation) আশঙ্কাজনকভাবে হারিয়ে ফেলে। পপুলেশন জেনেটিক্স-এর তত্ত্ব মতে, কোনো প্রাকৃতিক পপুলেশনের এ রকম অবস্থায় পতিত হওয়াকে পপুলেশন বটলনেক হিসেবে অভিহিত করা হয়। বটলনেক অবস্থায় পতিত হলে ঐ পপুলেশন প্রকৃতি থেকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। আমাদের মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ প্রতিবেশের বৈচিত্র্য এবং মাছের প্রজাতি পপুলেশনের প্রাচুর্য ও জীববৈচিত্র্যের বর্তমান যে নাজুক অবস্থা তাতে অধিকাংশ প্রজাতিই যে বটলনেক অবস্থায় পতিত হয়নি তা সন্দেহ না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে এ অবস্থায় পপুলেশনের কৌলিতাত্ত্বিক উপাদানে (DNA/Genes)-এ র‍্যান্ডম মিউটেশন সংঘটিত হতে পারে। ফলে নতুন জেনেটিক বৈচিত্র্য (genetic variations) সৃষ্টির মাধ্যমে অনেক দিনে পপুলেশনের অভিযোজন ক্ষমতা ফিরে আসতেও পারে। যেহেতু এ রকম মিউটেশন অনির্দিষ্ট প্রকৃতির; তাই এর কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। যা হোক, বিজ্ঞানভিত্তিক যথাযথ মানসম্পন্ন পরিবেশ ও পপুলেশন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পপুলেশনের বটলনেক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার নজির রয়েছে।

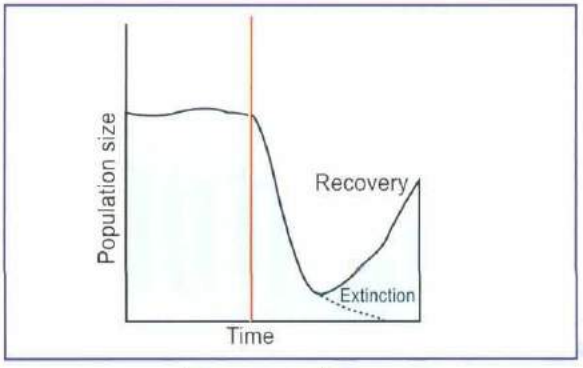

চিত্র: পপুলেশন বটলনেক

গ. মৎস্য অভয়াশ্রম ও স্লুইসগেইট ব্যবস্থাপনা
(Management of fish sanctuaries and sluicegates)

মুক্ত জলাশয়ের পপুলেশনের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে gear ban, season ban ও size ban এর সাথে সাথে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার দ্বারা মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। এ যাবত সারা দেশের নদ-নদী, খাল, বিল, বাঁওড় ও হাওরে যত মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলোর শতভাগ নিবিড় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার সাথে সাথে আরো বেশি মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডের জোরদার অভিযান (campaign) চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের মুক্ত জলাশয়ের প্রজাতির বর্তমান প্রেক্ষিতে যে সম্ভাব্য পপুলেশন বটলনেক অবস্থার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় কঠোরতা (stringency) আরোপের দ্বারা পপুলেশনের বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আর কাল বিলম্বের কোনো সুযোগ নেই।

মুক্ত জলাশয়ের মাছের প্রজনন অভিপ্রয়াণে বন্যা নিয়ন্ত্রণের অভিঘাত বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সারা দেশে নদী-সংলগ্ন বিভিন্ন প্লাবনভূমির সাথে সংযুক্ত খালের মুখে অতীতে যেসব স্লুইস গেইট নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোর কোনোটিই মৎস্যবান্ধব নয়। অর্থাৎ পরিকল্পনার সময় ঐকান্তিক হলে ঐসব গেইটে বন্যার সময় মাছ যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য সফল করা যেত। 'গতস্য শোচনা নাস্তি' মেনে বন্যার পূর্বাভাস অনুসরণে প্লাবনভূমি এলাকায় চাষকৃত ধান ও অন্যান্য ফসল-চক্রের সাথে সমন্বয় করে স্লুইস গেইটের ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনার কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু আমাদের প্রায় সব প্রজাতিই বর্ষার শুরুতে বন্যার আগমনে প্রজনন করে থাকে; মাছের প্রজনন সুবিধার জন্য মৌসুমের প্রারম্ভিক বন্যার পানি তাই প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করতে দিতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও এলাকার সুফলভোগী জনসাধারণের সমন্বয়ে স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও এর কার্যকারিতা কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উচ্চ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করে বন্যার সাথে কৃষি, মৎস্য, নৌ-চলাচল, স্থানীয় সরকারের বহুমাত্রিক সমস্যা-সংঘাত রয়েছে তার নিরিখে সমাধান বের করে মাছকে প্রকৃতিতে বাঁচাতে হবে।

মাছ চাষের নিবিড়তা এবং জেনেটিক বিবেচনা
(Culture intensification and genetic considerations)

চাষ থেকে মাছের উৎপাদন বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে ৩.৭২ লক্ষ হেক্টর জলাশয়ের মধ্যে যথাক্রমে ৫৮ হাজার, ২ লক্ষ ২১ হাজার, ৮১ হাজার ও ১১ হাজার হেক্টর সম্প্রসারিত (extensive, 1.5 MT/ha), আধা-নিবিড় (semi-intensive 1.5-4.0 MT/ha), নিবিড় (intensive 4.0 10 MT/ha) এবং অতি নিবিড় (highly intensive 10 MT/ha) পর্যায়ে মিশ্র মাছচাষ হচ্ছে (এফআরএসএস, ২০১৩-১৪)।

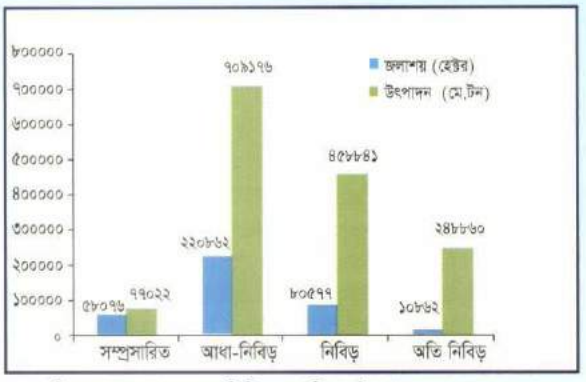

চিত্র: পুকুরে মাছচাষে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন ও জলায়তন

এতে প্রতীয়মান হয়, মাছচাষে নিবিড়তা বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আমাদের আছে। কিন্তু এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন নির্ভর করে মাছচাষ প্রযুক্তি উন্নয়নের স্থিতিশীলতা অর্জনের সক্ষমতায়; একটি প্রযুক্তি হলো আসলে একটি প্যাকেজ এবং সেই প্যাকেজের প্রতিটি অঙ্গ/উপাদান প্রযুক্তি প্রয়োগে যাতে স্থিতিশীল থাকে তার নিশ্চয়তা অর্জনই হলো সক্ষমতা। মাছচাষ প্রযুক্তি-প্যাকেজের উপাদানসমূহ হলো মাটি, পানি, খাদ্য, সার, বীজ, রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ও শ্রমিক। উন্নত জেনেটিক-গুণগত মানের পোনা মাছ ছাড়া ভালো উৎপাদন আশা করা যায় না। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, পোনা মাছে জেনেটিক বৈচিত্র্যের উপস্থিতিই হলো তার জেনেটিক গুণগত মান এবং আদতে পানি, মাটি, খাদ্য ও সারের সম্মিলিত উন্নত ব্যবস্থাপনায় মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও উন্নীত হওয়ার ক্ষমতাই কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ (genetic quality) নির্ণিত করে। তাই বুঝতে পারা যায় যে, মাছচাষে উৎপাদন বাড়াতে হলে কেবল ব্যবস্থাপনার মান বাড়ালেই হয় না; চাষে ব্যবহৃত পোনা মাছের জেনেটিক মান (genetic variability) যেন অক্ষুণ্ন থাকে; হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনে তার নিশ্চয়তা বিধান একান্ত জরুরি। দেশের মোট ৩.৭২ লক্ষ হেক্টর পুকুর-জলার মধ্যে মাত্র ১১ হাজার ও ৮১ হাজার হেক্টর জলা যথাক্রমে অতি নিবিড় ও নিবিড় পর্যায়ে প্রধানত রুইজাতীয় মাছের চাষ হচ্ছে; তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস মাছও উল্লেখযোগ্যভাবে চাষের আওতায় এসেছে। বাকী জলা যেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আধানিবিড় পর্যায়ে চাষ হচ্ছে; এসব পুকুর নিবিড় বা অতি নিবিড় পর্যায়ে চাষের আনতে হলে আগামিতে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে জেনেটিক-গুণগত উন্নত মানের পোনা মাছের চাহিদা অনেকগুণ বেড়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্যাকেজের স্থিতিশীলতা অর্জন একটি খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

ক. পোনা মাছের জেনেটিক গুণাগুণ
(Genetic quality of fish seed)

অতীতে পুকুরে মাছচাষের জন্য পোনা মাছের চাহিদার সিংহভাগই নদ-নদীর প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত হতো; প্রাকৃতিক

প্রজননভূমি আশঙ্কাজনক হারে বিনাশ হবার ফলে এখন পোনামাছের চাহিদার সবটাই হ্যাচারি-উৎপাদিত পোনা দিয়ে মেটানো হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বর্তমানে দেশে ৯৬৪টি মৎস্য হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হ্যাচারিতে পোনা মাছ উৎপাদনের সহজাত জেনেটিক সমস্যাগুলো হলো জেনেটিক ড্রিফট (genetic drift), অন্তঃপ্রজনন (inbreeding), ঋণাত্মক নির্বাচন (negative selection) ও ইন্ট্রোগ্রেসিভ শংকরায়ন (introgressive hybridization)। এসব বিষয়ের বিস্তারিত ধারণা/মতবাদ প্রকারান্তরে বিভিন্ন সংকলনে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। মৎস্য বিশেষজ্ঞগণের এসব সমস্যার সম্যক ধারণা থাকলেও হ্যাচারি কর্মকান্ড তথা ব্রুড মাছের ব্যবস্থাপনা ও হ্যাচারিতে প্রজনন কাজ পরিচালনায় নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এসব সমস্যার ব্যাপারে অপ্রশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। জেনেটিক নিয়ম-নীতি ও আদর্শ মেনে ব্রুড মাছ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা এবং উন্নতমানের পোনা উৎপাদন তথা দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির স্থিতিশীলতা অর্জন একটি বিরাট বড় প্রশ্ন। মুক্ত জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র্য চাক্ষুস ধ্বংসের পটভূমিতে মৎস্য উৎপাদনের স্থিতিশীলতার এ প্রশ্ন এখন আরো বেশি করে দেখা দিয়েছে; হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রজাতির পপুলেশনসমূহও, উপরোল্লিখিত জেনেটিক ড্রিফট এবং অন্তঃপ্রজননের কারণে তাদের জেনেটিক বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলতে পারে, এমনকি বটলনেক অবস্থায়ও পতিত হতে পারে। এজন্য হ্যাচারি পপুলেশনের পরিবর্তন এবং/অথবা পুনর্ভরণ করার জন্য তাদের প্রতিরূপ (counterpart) প্রাকৃতিক পপুলেশনের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক পপুলেশনের বৈচিত্র্যের যে করুণ অবস্থা তাতে সেই সুযোগের সম্ভাবনাও হয়তো দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে।

খ. হ্যাচারি কর্মী/টেকনিশিয়ানদের মৎস্য জেনেটিক্স প্রশিক্ষণ
(Genetic training of hatchery workers/technicians)

সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ১০০০ হ্যাচারিতে যে বিস্তৃত শ্রেণি ও প্রকৃতির বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী হ্যাচারি কাজে নিয়োজিত আছে তাদের জন্য ব্রুড মাছ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার জেনেটিক নীতি-আদর্শ ও কৌশল বিষয়ে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। জেনেটিক্স জীববিজ্ঞানের একটি জটিল বিষয় হওয়ায় মৎস্য প্রজনন সংশ্লিষ্ট জেনেটিক্স-এর বিষয়সমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে সহজ-সরল মাতৃভাষায় উপস্থাপন করে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। এটি যেমন একটি দুরূহ ব্যাপার; এই জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত করা না গেলে চাষের উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা যাবে না।

কৌলিতাত্ত্বিক ও ডমিস্টিকেশন সিলেকশন কার্যক্রম
(Genetic selection and domestication selection)

প্রাকৃতিক ও হ্যাচারি পপুলেশনের ভগ্নদশার সত্যিকার মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই আমাদের চাষের প্রজাতিসমূহের উৎপাদনমুখী বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য (production related commercial traits) যেমন দ্রুত বর্ধন (faster growth) ও রোগবালাই সহ্যক্ষমতা (disease resistance) ইত্যাদির প্রেক্ষিতে কৌলিতাত্ত্বিক নির্বাচন (genetic selection) কার্যক্রম এখনই জোরদারভাবে হাতে নিতে হবে। এছাড়াও চাষ থেকে ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাড়াতে হলে চাষের ক্ষেত্রে আরো নতুন নতুন প্রজাতির অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে, অনতিবিলম্বে ডমিস্টিকেশন সিলেকশন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে; এ রকম অনেক চমৎকার প্রজাতি আমাদের দেশে আছে যেমন- শোল, গজার, আইড়, চিতল, পাঙ্গাস ইত্যাদি।

মাছচাষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ
(Control of culture environment)

মাছচাষের নিবিড়তার সাথে পুকুর/খামারের পরিবেশের ভারসাম্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিবিড় চাষ কার্যক্রমে উচ্চ মজুদ ঘনত্বের সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে যায়; পানির গুণাগুণ প্রায়শই সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অব্যবহৃত খাদ্য পুকুরের তলায় জমে দূষণ সৃষ্টির সাথে পুকুরের পানিও দূষিত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে পুকুরে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়; মাছের বর্ধন-হার কমে যায়। নিবিড় চাষে উৎপাদন বাড়লেও ব্যবস্থাপনা ব্যয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেড়ে যায় বিধায় তা শেষতক উৎপাদনকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

মৎস্য অধিদপ্তরের সরবরাহ ও সেবার মান উন্নয়ন
(Development of supply and services quality of DoF)

মৎস্য বিভাগে এখন প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা আশাব্যঞ্জক। দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা, মাছচাষ, পোনা উৎপাদন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ও সময়োপযোগী দরকারি সহায়তা ও সেবার মান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।

সম্পদের ধ্বংস ও বিনাশ ঠেকাতে নিশানাধর্মী (target oriented) সম্প্রসারণ কর্মকান্ড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখী কার্যক্রম; মাঠের সমস্যার বিষয়ে জেলে বা চাষিদের কথা একদিকে শোনা; সমস্যার সমাধান বিষয়ে অধ্যয়ন/গবেষণা করা; প্রাপ্ত ফলাফল আবার মাঠে পৌঁছে দেয়া, প্রাপ্ত সুফল সম্পর্কে সার্বক্ষণিকভাবে অবহিত থাকা এবং প্রয়োজনানুযায়ী আবারও হস্তক্ষেপ করা। দেশের প্রশাসনিক ইউনিটের যেসব অঞ্চলে মৎস্যসম্পদের আধিক্য রয়েছে, প্রয়োজনে সেসব এলাকায় জনবলের সংখ্যা ও সুযোগ-সুবিধা দুই-ই বাড়াতে হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরীয় জনবলের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসুচি
(Training programs for DoF personnels)

আগামিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাকে সাবলীল রাখতে মৎস্য বিভাগের জনবল প্রশিক্ষণের সুচারু কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি চলমান রাখতে হবে। বিশেষ করে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও মানসম্পন্ন পোনা মাছ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব সমস্যার ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। সাধারণভাবে দু'ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা যেতে পারে:

ক. সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি; এবং
খ. উচ্চতর বা বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

সাধারণ প্রশিক্ষণের আওতায় মৎস্যসম্পদের সার্বিক বিষয়ে গ্রামীণ মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের মৎস্যসম্পদের সাথে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য সাব-সেক্টরের যে নিবিড় যোগসূত্র এবং যার ওপরে মৎস্যসম্পদের সুচারু সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিকাশ জড়িত সে বিষয়ে প্রতিটি মৎস্যজীবী, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, মহিলা শ্রমিক, বেকার যুবক ও যুব মহিলা, গ্রামীণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যদের বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন এবং কেবল মৎস্যসম্পদের ওপর পরিচালিত সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমেই তা গড়ে তোলা সম্ভব। মৎস্যসম্পদের বিশেষ কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির জন্য উচ্চতর বা বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এমএস/পিএইচ ডি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রকল্প গ্রহণ ভাবন
(Thoughts of undertaking projects)

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্যসম্পদের ভূমিকা পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় অনন্য। বছরভিত্তিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এই 'পানির দেশের' বিপুল পরিমাণ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদনের অবদান ক্রমাগতভাবে কমতে থাকা একটি হতাশাব্যঞ্জক বিষয় এবং তা কেবল অতীতের ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাকেই ইঙ্গিত করে। বর্তমানের চাষকেন্দ্রিক উৎপাদনের যে প্রবৃদ্ধি তাতে আত্মপ্রসাদ লাভের কোনো কারণ নেই। এদেশের মুক্ত জলাশয়ই হলো মাছের জীববৈচিত্র্যের আঁধার। মুক্ত জলাশয়ের প্রতিবেশিক বৈচিত্র্য, প্রজাতি-প্রাচুর্য ও জেনেটিক বৈচিত্র্যের বিনাশ ঘটিয়ে এদেশে মাছের উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা সম্ভব নয়, তা সে আহরণ হোক কিংবা চাষের উৎপাদন হোক। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনার বহুমাত্রিক সমস্যা সর্বজন বিদিত, কিন্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান থাকবে না তা কেন? আসলে সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কোথাও গুরুতর অসাবধানতা (oversight) ও প্রমাদ (mistake) সাধিত হয়ে চলেছে বলে মনে হয়। তাই এ সেক্টর ব্যবস্থাপনাকে জরুরি জাতীয় ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনে সরকারি টাস্কফোর্স গঠন করে বহুমাত্রিক সমস্যার মাত্রা নির্ণয়ে আন্তঃসেক্টর পর্যায়ে কঠোর সংলাপ হওয়া উচিত; এ সেক্টরের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে মাছচাষ উন্নয়নে প্রকল্প চিন্তার সাথে প্রাথমিকভাবে মুক্ত জলাশয়ের মাছের আবাসভূমির উন্নয়ন তথা পরিবেশ-প্রতিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে মূল্যবান মৎস্য জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণে সর্বাগ্রে সচেষ্ট হতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

আমাদের বাৎসরিক মাছের মোট উৎপাদনে এদেশের খাল, বিল, নদী-নালা, হাওর, বাঁওড় এলাকার ৩৯.০৬ লক্ষ হেক্টর মুক্ত জলাশয়ের অবদান বিগত ৩-৪ দশকে প্রায় ৫০ ভাগ কমে গেছে। মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীলতা আলোচনায় তাই এ হ্রাসের বিষয়টি স্বভাবতই চলে আসে। মুক্ত জলাশয়ের এ হ্রাসকে পুষিয়ে নিতে না পারলে আগামিতে উৎপাদনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। ব্যবস্থাপনার আন্তঃসেক্টর দ্বন্দ্ব/সংঘাত, জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত অতিআহরণ ইত্যাদি নানা কারণে মাছের জীববৈচিত্র্য আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করা যায়, জেনেটিক ভ্যারিয়েশন হারিয়ে অনেক প্রজাতি পপুলেশন বটলনেক অবস্থায় পতিত হয়ে প্রকৃতি থেকে দ্রুত বিলুপ্তির দিকে চলে যাচ্ছে। মাছচাষের নিবিড়তা বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আমাদের হয়তো আছে কিন্তু ব্রুড মাছ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি ৯৬৪টি মৎস্য হ্যাচারিতে মাছ প্রজনন কাজে নিয়োজিত কর্মীদের ব্রুড ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে জেনেটিক নীতি-আদর্শ মেনে উন্নতমানের পোনা উৎপাদন করে বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণ করা এবং উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা একটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে হ্যাচারি কর্মী/টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। নিবিড় মাছচাষের সাথে সাথে পুকুর/খামারের পরিবেশ ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্থিতিশীলতা অর্জনে অধিদপ্তরীয় জনবলের ব্যবহারিক জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও মাঠমুখী সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের কোনো বিকল্প নেই।

প্রফেসর, ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারে আহরিত বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির বর্তমান অবস্থা

Present Status of Commercially Important Finfish in Trawl Catch of Bay of Bengal

নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন[১] ও সুমন বড়ুয়া[২]

Abstract

Trawl fishing in Bangladesh commenced in 1972 deployed in exploitation of demersal fish and shrimp, but in recent years focus being calibrated to mid-water trawlers and long liners to encourage pelagic fishing in deep and distant waters. This article looks into ways of species composition of commercially important finfish species in landed trawl catch depicting the trend of stock and efforts to provide available information so that fishery biologists, planners and administrators may take an inclusive resource based management plan for keeping sustainability in marine fishery resources. The secondary data of landed trawl catch of fin fish since 1985-86 to 2014-15 was used. There are more than 90 species of fish of about 30 families which have commercial importance. Intense exploitation with high fishing efforts and increased capacity of fishing vessels dominated in present trend of marine fishing. Since industrialization in country's marine fishing sector, three phases are visually demarcated. Phase I indicates from 1985-86 to 1999-2000, phase II from 2000-01 to 2009-10 and phase III started from 2010-11. The abundance index (catch per unit effort- CPUE) was in increasing trend (4.05) at phase I where fishing was almost in a virgin stock and went down to 2.18 at phase II. At phase III, the CPUE being risen to above 4.0 due to added modern and hi-tech vessels added into the fishing fleet together with imposed restriction on unreported catch. The number of trawlers engaged in fishing was 14 at the initial stage to 31 in the beginning of phase II and sharply increased to 175 in 2014-15. Though, there are various category of vessels engaged in trawl fishing in the Bay of Bengal, grossly categorized into steel hull (freezing vessels) and wooden body (chilling vessels). The CPUE of steel hull trawlers were 4 to 6 times more that of wooden hull trawlers. Catch ceiling or quota should be enacted as a prescription in order to reduce this inequality side by side to maintain sustainable exploration of fishery resources. Recent promulgation and implementation of moratorium on catch fish for a certain period shows better impact on stock in terms of quality and quantity of fish. New surveys and new information on stock by survey vessel in calibration with historical catch-effort data would be effective for formulating proper management strategy with regard to maintain sustainability of marine fisheries resources especially before increasing any effort to the existing fleet.

ফানেল আকৃতির বঙ্গোপসাগরের কৌণিক প্রান্তে অবস্থিত এ বঙ্গীয় বদ্বীপ-এর রয়েছে বিশাল উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়। দক্ষিণ-পূর্বের টেকনাফ থেকে শুরু করে পশ্চিমে সাতক্ষীরা পর্যন্ত প্রায় ৭১০ কিমি বিস্তৃত উপকূলীয় তটরেখা। পুরো উপকূলীয় তটরেখা পলল গঠিত ইকোসিস্টেম যা জৈবিকভাবে উর্বর এবং বিভিন্ন পারিবেশিক উপাদান যথা- ম্যানগ্রোভ, অ্যালগালবেড, লবণাক্ত প্রকৃতির বালুকা ও কর্দমাক্ত বীচের সমন্বয়। দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) উপকূলীয় তটরেখা থেকে গভীর সমুদ্রের দিকে ৩২০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিবেশী দেশের সাথে সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্জন করেছে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত একচ্ছত্র সামুদ্রিক জলরাশি যার মধ্যে ২৪,০০০ বর্গ কিমি হলো ১০ মিটারের চেয়ে কম গভীর। এ অগভীর উপকূলীয় জলরাশি পলি বিধৌত বিশাল মোহনা অঞ্চল এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের সমন্বয়ে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলরাশিকে দিয়েছে মৎস্যসম্পদের বিপুল বৈচিত্র্য এবং অপার সম্ভাবনা। বাংলাদেশ সমুদ্রসীমায় প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির ছোট-বড় নানা আকারের মৎস্য, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫ প্রজাতিরও অধিক কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ১৩ প্রজাতির প্রবালসহ নানাবিধ জলজ সম্পদ রয়েছে। বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্য প্রজাতি রয়েছে ৯০টিরও অধিক। তন্মধ্যে ইলিশ, ছুরি, পোয়া, দাতিনা, চউখ্যা, রাঙ্গাচউখ্যা, স্কেডস, স্যাপার, রূপচাঁদা, কামিলা, লাক্কা, লাল মাছ, টুনা, ম্যাকারেল, আইল্যা, লইট্টা ইত্যাদি এবং শার্ক, স্কেটস ও রে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্বীকৃত যে জাতীয়ভাবে প্রাণিজ আমিষ চাহিদার ৬০% যোগান দেয় মৎস্যখাত। বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মৎস্য সাব-সেক্টরে সর্বমোট উৎপাদিত ও আহরিত ৩৬.৮৪ লক্ষ মে.টন। এর মধ্যে প্রায় ৬.০০ লক্ষ মে.টন সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অবদান; যেখানে ট্রল ফিসিং-এর মাধ্যমে আহরিত হয়েছে ৮৪,৮৪৬ মে.টন। স্বাধীনতার পরপর ১৯৭২ সালে রাশিয়ার গবেষণা জাহাজ দ্বারা মৎস্য মজুদের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ট্রলার বহর দ্বারা মৎস্য আহরণ শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে মৎস্যবিজ্ঞানী ওয়েস্ট তাঁর এক গবেষণা প্রকাশনায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তলদেশীয় মাছের মজুদ ২,৬৪,০০০-৩,৭৩,০০০ মে.টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য মাছের পরিমাণ ১,৭৫,০০০ মে.টন উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে নরওয়ের গবেষণা জাহাজ ড. ফ্রিডজফ নানসেন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সীথ্রে (১৯৮১) তলদেশীয় মাছের মজুদ ১,৬০,০০০ মে.টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য মাছের পরিমাণ ১,০০,০০০ মে.টন নিরূপণ করেন। ১৯৮৪-১৯৮৬

সালে গবেষণা জাহাজ আরভি অনুসন্ধানী কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে মৎস্যবিজ্ঞানী ল্যাম্বুফ ১৯৮৭ সালে তাঁর এক গবেষণা প্রকাশনায় তলদেশীয় মাছের মজুদ ১০-১০০ মি গভীরতা পর্যন্ত ১,৫৭,০০০ মে.টন ও ১০-২০০ মি গভীরতা পর্যন্ত ১,৮৮,০০০ মে.টন এবং সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য মাছের পরিমাণ ৪৭,৫০০-৮৮,৫০০ মে.টন উল্লেখ করেন।

আহরণের ভিত্তিতে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টর বাণিজ্যিক ট্রলার বহর এবং যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান দ্বারা আর্টিসেনাল সেক্টর নামে দু'ভাগে বিভক্ত। আহরণের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ট্রলারগুলো তলদেশীয় মৎস্য আহরণ করলেও বিগত ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর থেকে মিড ওয়াটার ট্রলিং শুরু হয়েছে যা দ্বারা আন্তঃদেশীয় সামুদ্রিক জলাশয়ে বিচরণশীল (straddling stock) ছোট প্রজাতির পেলাজিক মাছ যেমন- সার্ডিন, ইলিশ, ম্যাকারেল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আহরণ করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে সরকার মিডওয়াটার ট্রলার এবং লাইনার দ্বারা গভীর এবং ডিসটেন্ট সমুদ্রে উচ্চমাত্রায় অভিপ্রয়াণশীল (highly migratory) বৃহদাকার মাছ যেমন- টুনা, সোর্ড ফিস, সেইলফিস, হাঙ্গর, ব্লু-মার্লিন ইত্যাদি প্রজাতির পেলাজিক মৎস্য আহরণকে উৎসাহিত করছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অবারিত জলরাশি থাকার পরও সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের কৌশলগত উন্নয়ন সাধন এখনো পরিপূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ট্রলার বহর দ্বারা আহরিত বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির বর্তমান অবস্থা, ট্রলার বহর দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের বর্তমান ধারা এবং ট্রলার প্রতি মৎস্য আহরণের সক্ষমতা (অ্যাফোর্ট) এবং সম্প্রতি সরকার কর্তৃক ঘোষিত দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় মৎস্যের প্রজনন নিরাপদ করার লক্ষ্যে সকল প্রকার বাণিজ্যিক ট্রলার সহযোগে সকল ধরনের মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়ান আহরণে যে ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে তার প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য ট্রলার বহরের বর্তমান অবস্থা
(The present status of fishing fleet)

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারগুলো মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে কাঠ দ্বারা নির্মিত চিলিং ট্রলার ও অধিকাংশ স্টীল হালের ফ্রিজিং ট্রলার হিসেবে ফিসিং কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। কাঠ বডি ট্রলারসমূহের গ্রস টনেজ ৫৬ থেকে ১৪০ মে.টন এবং স্টীল হাল ট্রলারের গ্রস টনেজ ২৫১ থেকে ৬৬৮ মে.টন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যা যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে কাঠ বডি ট্রলারগুলোর ক্ষেত্রে ১৮.৫০ থেকে ২৬.৫০ মি এবং স্টীল হাল ট্রলারগুলোর ক্ষেত্রে ৩৪.০০ থেকে ৫৪.০০ মি-এ বিস্তৃত। ইঞ্জিনের অশ্বক্ষমতার দিক থেকে কাঠ বডি ৪২০-৬০০ বিএইচপি এবং স্টীল হাল ৫০০-১৮৫০ বিএইচপি-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার বহর পেছন দিক থেকে (stern) টানা ট্রল জাল ব্যবহার করে যার মেলানের ফাঁস (cod-end) সর্বনিম্ন আকার ৬০ মিমি এবং হেড রোপ লম্বায় ১৮ মি থেকে ১১০ মি-এর মধ্যে বিস্তৃত।

অধিকাংশ ট্রলারসমূহ আধুনিক নেভিগেশন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মৎস্য আহরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। বর্তমানে সমুদ্রে ৪০ মিটারের অধিক গভীরতায় কাঠ বডি চিলিং ট্রলারগুলো ১৪ দিনের এবং স্টীল হাল ফ্রিজিং ট্রলারগুলো ৩০ দিনের সমুদ্র যাত্রার অনুমতি নিয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকে। সাধারণত প্রকৃতিভেদে ট্রলারগুলো প্রতিবার ২.৫-৪.৫ ঘণ্টা ব্যাপী প্রতিদিন ৫-৬ বার ফিসিং করে যা আবহাওয়া, সমুদ্রে গমন যোগ্যতা এবং ট্রলারের নিজস্ব সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। ১৯৮৫-১৯৮৬ সালে ৮টি ট্রলার দ্বারা মৎস্য আহরণ শুরু হলেও ২০১৪-২০১৫-তে এসে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫টি। মৎস্য আহরণে সক্রিয় দিনের সংখ্যাও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে বিভিন্ন আর্থিক সালে ট্রলারের সংখ্যা নির্বিশেষে সর্বোচ্চ মৎস্য আহরণ দিবস ছিল ২২,৮৫৩ দিন (২০১৪-২০১৫) এবং সর্বনিম্ন ৬১৭ দিন (১৯৮৮-১৯৮৯)। বর্তমান ফিসিং বহরে ফিশিং ট্রলারের ক্রমবিকাশ এবং বছরভিত্তিক সর্বমোট মৎস্য আহরণ দিবসের ক্রমধারা নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত হলো।

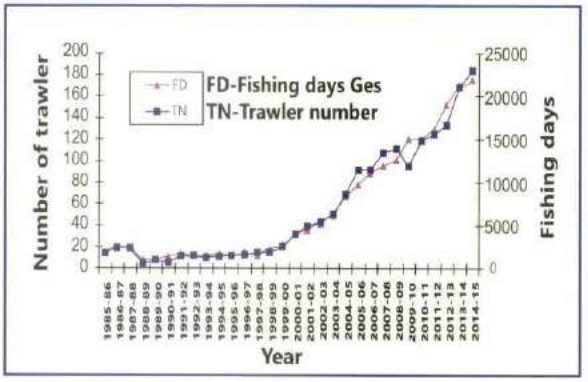

চিত্র: ১৯৮৫-১৯৮৬ থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারের সংখ্যা ও সর্বমোট মৎস্য আহরণ দিবস

বাণিজ্যিক ট্রলারে আহরিত মৎস্য প্রজাতি বিন্যাস
(Finfish species composition of industrial trawling)

বাণিজ্যিক ট্রলারে আহরিত মৎস্যসম্পদের মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি রয়েছে প্রায় ৩০টি গোত্রের ৯০টির অধিক প্রজাতি। তবে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি গোত্র ও ১টি উপশ্রেণির মৎস্য প্রজাতির প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত হয়; যথা- Ariidae, Sciaenidae, Nemipteridae, Trichiuridae, Carangidae, Scombridae, Clupeidae, Pomadasyidae, Stromateidae, Harpadontidae, Lutjanidae, Congridae, Cynoglossidae, Polinemidae, Cephalopoda ও Elasmobranchii। এর মধ্যে তরুণাস্থি মাছের ১০টি গোত্র রয়েছে। বিভিন্ন সময়ের পরিসরে বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির গোত্রভিত্তিক প্রাচুর্যের ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয় যা অপর পৃষ্ঠার সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি: বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির গোত্রভিত্তিক প্রাচুর্য

Family	Common name	Abundance (%) (Lamboeuf 1987)	Catch (%) as per log of trawlers in 2012-13	Catch (%) as per log of trawlers in 2014-15
1	2	3	4	5
Ariidae	Cat fishes	11.99	3.02	3.48
Sciaenidae	Croaker, Jew fishes	10.37	3.81	4.65
Nemipteridae	Threadfin breams, red fish	9.00	10.42	7.57
Trichiuridae	Hairtail fishes	6.19	6.23	6.53
Carangidae	Jacks, Scads, Black pomfret	5.77	4.09	3.89
Scombridae	Mackerels, tuna	5.36	7.41+2.34 (tuna)	10.28+3.22 (tuna)
Clupeidae	Sardines, Hilsa	3.57	30.75+3.34 (Hilsa)	37.00+2.21 (Hilsa)
Pomadasyidae	Grunters	2.47	0.41	0.27
Stromateidae	Pomfrets	1.82	1.83	0.59
Harpadontidae	Bombay duck	1.29	2.54	2.18
Lutjanidae	Snapper	1.07	0.37	0.43
Cephalopoda	Squids Cuttlefishes	1.41	1.06	1.44
Elasmobranchii	Shark, Skates, Rays	3.38	0.80	1.12

বাণিজ্যিক ট্রলারে মৎস্য আহরণ ও সিপিইউই (Industrial trawl fishing and CPUE)

বাণিজ্যিক ট্রলার বহর দ্বারা ১৯৮৫-১৯৮৬ হতে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত মৎস্য আহরণ ও মৎস্য আহরণ সক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে সর্বনিম্ন পরিমাণ ৯৩১ মে.টন আহরিত মাছের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০,৩৩৩ মে.টনে উন্নীত হয়েছে যা নিম্নের গ্রাফে উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত সময়ে ট্রলার বহরে অধিক সংখ্যায় বৃহদাকার প্রকৃতির বটম ও মিডওয়াটার প্রকৃতির ট্রলার সংযোজিত হওয়ায় মোট আহরিত মাছের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির ক্ষেত্রে পরিমাণ বা প্রাচুর্য আহরিত মাছের অনুপাতে ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। মাছের আহরণ উপাত্ত বিশ্লেষণে ১৯৮৫-১৯৮৬ সালে CPUE ছিল ৩.০৮ যা ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে ১.৫১ তে নেমে আসে।

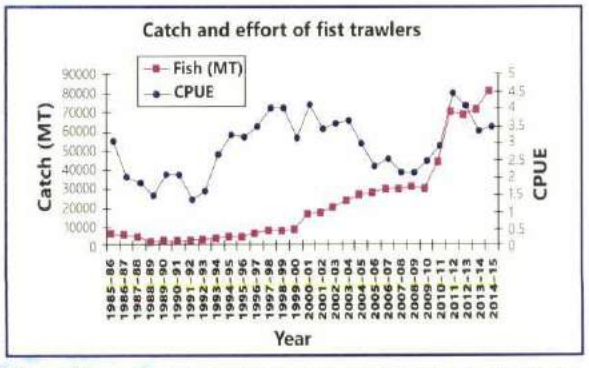

চিত্র: বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার বহর দ্বারা ১৯৮৫-১৯৮৬ থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত মৎস্য আহরণ ও মৎস্য আহরণ সক্ষমতা (CPUE)

পরবর্তীতে ট্রলার বহরে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি যেমন- SoNAR, Trawl Eye, Fish Finder, High Engine power (HP) ইত্যাদির সংযোজন এবং সর্বোপরি মৎস্য আহরণে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের সম্মিলন ঘটায় অত্যন্ত কার্যকরভাবে মৎস্য আহরিত হওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত CPUE ২.১৮ থেকে ৪.০ এর মধ্যে বৃদ্ধি পায়। এ প্রবণতা ২০০৯-২০১০ সালে ২.৫২ তে সীমাবদ্ধ থাকলেও ২০১১-২০১২ সালে তা দ্রুত বেড়ে ৪.৪৮ হয় যা ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত ৩.৫ এর মধ্যে ওঠানামা করছে।

বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণ এবং এর ক্ষমতা (CPUE) পর্যালোচনা করলে বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ এর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। পর্যায় তিনটি হলো ১৯৮৫-১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ থেকে চলমান। পর্যায়-১ এ আহরণে নিয়োজিত মৎস্য ট্রলার ও সক্রিয় মৎস্য আহরণ দিবসের সংখ্যা কম ছিল এবং বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনও কম ছিল। বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার দ্বারা মৎস্য আহরণের এই নার্সারি পর্যায়ে CPUE বেশি ছিল। কারণ শুরুতে মৎস্য মজুদ অনাহরিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারের সংখ্যা ও সক্রিয় মৎস্য আহরণ দিবসের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ফলে মৎস্য আহরণের পরিমাণ বাড়লেও CPUE এর ধারা ক্রমশ নিম্নমুখী ছিল। মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারের সংখ্যা ও সক্রিয় মৎস্য আহরণ দিবসের সংখ্যা তৃতীয় পর্যায়ে এসে দ্রুত উর্ধ্বগামী হলেও, তা ২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত কিছুটা নিম্নমুখী হয়ে নির্দিষ্ট পর্যায়ে ক্রমশ ওঠানামা করছে। ২০০০-২০০১ সালে যেখানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার এর সংখ্যা ছিল ৩১টি ২০১৪-২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ালো ১৭৫-এ।

আধুনিক, উন্নত প্রযুক্তির সুসজ্জিত মৎস্য ট্রলার বিদ্যমান ট্রলার বহরে সংযুক্তির ফলে মৎস্য উৎপাদন তথা আহরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ ইনপুট বা আউট-পুটের ওপর বর্তমান সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মূলত মৎস্য আহরণে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টির ফলে ভবিষ্যতে মৎস্য প্রজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বশেষ এপ্রিল ২০১৬ সালে এসে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত অনুমতি প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ট্রলারের সর্বমোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৬টিতে উন্নীত হয় যার মধ্যে সর্বোচ্চ ২০০টি ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকে। উপরের গ্রাফে ১৯৮৫-১৯৮৬ থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে মৎস্য আহরণ ও মৎস্য আহরণ সক্ষমতা (CPUE)-এর ক্রমধারা প্রদর্শিত হলো।

বিগত ত্রিশ বছরে মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্যের প্রজাতিগত বিন্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে। ১৯৮৫-১৯৮৬ সালে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি ছিল সাদা দাতিনা, পোয়া, কাটা মাছ, স্ন্যাপার, ছুরি মাছ প্রভৃতি। ২০০৫-২০০৬ সাল

থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যমানের ছোট মাছ যেমন লইট্যা, লাল মাছ, মাইট্যা, আইলা, সার্ডিন, মেকারেল, কাউয়া, কলম্বোসহ বাণিজ্যিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রজাতির মাছ প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থানে চলে আসে। ১৯৮৪-১৯৮৬ সালে পরিচালিত জরিপ পরবর্তী প্রতিবেদনে মোট আহরিত মাছের মধ্যে ২০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির কথা বলা হলেও ২০০৫-২০০৬ সালে তা ১২ টিতে নেমে আসে। ২০১৪-২০১৫ সালে এসে আহরিত মাছের প্রজাতি বিন্যাসে উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করেছে সার্ডিন, ম্যাকারেল ও লাল মাছ। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, বাণিজ্যিকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দীর্ঘজীবী মাছ অতিআহরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বর্তমানে ছোট ও কম মূল্যমানের পেলাজিক মাছ প্রধান মৎস্য প্রজাতির তালিকায় চলে এসেছে, যা মৎস্য মজুদ এর সুষম বিন্যাসকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিভিন্ন বছরে বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের মৎস্য আহরণের সক্ষমতা (অ্যাফোর্ট) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ফ্রিজিং ট্রলার (স্টীল হাল) এর CPUE চিলিং ট্রলার (কাঠ বডি) এর চেয়ে প্রায় ৪ থেকে ৬ গুণ বেশি যা নিম্নের গ্রাফে উপস্থাপন করা হলো।

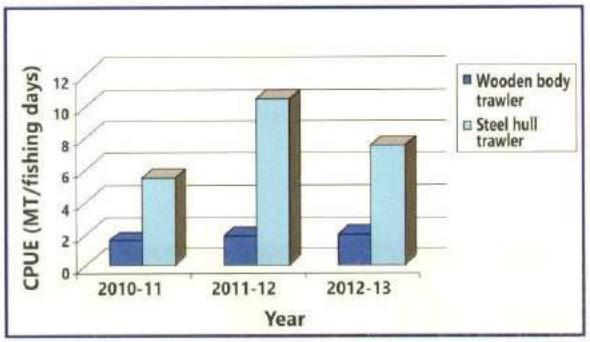

চিত্র: ফ্রিজিং ট্রলার এবং চিলিং ট্রলারের মৎস্য আহরণ সক্ষমতা (CPUE)

মৎস্য মজুদে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণের প্রভাব (Impact of season ban on fish stock)

সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিবছর ১৯ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মৎস্য ও চিংড়ির প্রজনন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সব ধরনের বাণিজ্যিক ফিসিং ভেসেল কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় (Exclusive Economic Zone-EEZ) সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়ান আহরণ নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন জারি হলে তা ২০ মে, ২০১৫ খ্রি. থেকে কার্যকর হয়। এছাড়া দেশের ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও এর প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১১-২০১২ সাল হতে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে প্রতিবছর বাংলা আশ্বিন মাসে (অক্টোবর) নির্ধারিত ১৫ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ কার্যক্রম নিষিদ্ধ বলবৎ আছে। সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ তথা উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিষিদ্ধ মৌসুমের কার্যকর বা টেকসই (sustainable) প্রভাব নিরূপণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অন্তত ৫-৭ বছরের ট্রলক্যাচ ল্যান্ডিং উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং এতদ্বিষয়ে গবেষণা ব্যতীত কোনোরূপ উপসংহার বা কোনোরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করা যাবে না।

তবে প্রথমবারের মত ২০১৫-২০১৬ সালে নিষিদ্ধ মৌসুম কার্যকর হওয়ার ফলে বিগত আগস্ট-মার্চ (২০১৪-২০১৫) এর তুলনায় একই সময়ে ২০১৫-২০১৬ সালে ট্রলারবহর কর্তৃক আহরিত মৎস্যের ক্যাচ লগ পর্যালোচনায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নের গ্রাফে প্রদর্শন করা হলো। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জনপূর্বক আহরণ অব্যাহত রাখার জন্য ২০০০ সাল হতে প্রতিবছর মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় ১৫ এপ্রিল হতে পরবর্তী ৪৫-৬০ দিনের জন্য মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ মৌসুম বলবৎ আছে। যার ফলে সেখানে নিষিদ্ধ মৌসুমের অব্যবহিত পরবর্তী ২-৩ মাস তলদেশীয় মাছের রিক্রুটমেন্ট বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘ মেয়াদে মজুদ পুনরুদ্ধারে এর ফলাফল বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবে নিষিদ্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত ফিসিং ইফোর্ট নিয়ন্ত্রিত থাকায় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং মৎস্য স্টক অপূরণীয় ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

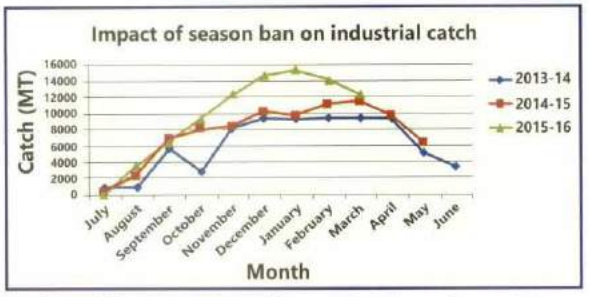

চিত্র:: বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুমের প্রভাব

উপসংহার (Conclusion)

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্য আহরণে বিভিন্ন গিয়ার দ্বারা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আহরণ করা হয়। এরূপ বহুমুখী বাস্তবতায় কোনো একক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যকর নয়। মৎস্য আহরণ ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে আধুনিক প্রযুক্তির ট্রলার শিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের কাছে মৎস্য আহরণ পৌনঃপুনিক লাভালাভের হিসেবে বিবেচনা করায় সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ ও ইকোসিস্টেমের ওপর মারাত্মকহারে চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আশু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় এনে মৎস্য আহরণে টেকসই প্রবৃদ্ধি সাধন করতে হবে। বর্তমানে মৎস্য আহরণে যে সংখ্যক ইফোর্ট ও ক্যাপাসিটি বিদ্যমান আছে মৎস্য মজুদ ও প্রাচুর্যের ওপর ভিত্তি করে তা এখনই সমন্বয় না করলে স্বল্প সময়েই বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্যকূল সংকটাপন্ন হয়ে ইকোসিস্টেম অকার্যকর হয়ে পৃথিবীর বহু দেশের সাগরের ন্যায় বঙ্গোপসাগরও মৎস্য শূন্য হয়ে যাবে। কোনোভাবে মৎস্য মজুদ সম্পর্কে হালনাগাদ জরিপ ও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বর্তমান ট্রলার বহরে নতুন ট্রলার সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না। ট্রলার বহরে নব সংযোজিত গবেষণা জাহাজ 'আরভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক ভবিষ্যতে পরিচালিত জরিপ ও গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া বিদ্যমান বাণিজ্যিক ট্রলার বহরের হিস্টোরিক্যাল ক্যাচ-ইফোর্ট ডাটা বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

*পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
**সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : মৎস্য সেক্টর পরিপ্রেক্ষিত

Sustainable Development Goals : Fisheries Sector Perspective

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

Abstract

After successful achievement of the goals and targets of Millennium Development Goals (MDG), world leaders through the United Nations agreed to accept the Sustainable Development Goals (SDG) as an intergovernmental set of aspiration Goals with 169 Targets which is known as "Transforming our World: The Agenda for Sustainable Development". It was adopted as the SDG in a UN General assembly on 25-27 September which has 92 paragraphs, with the main paragraph (51) outlining the 17 Development Goals and its 169 Targets. The duration of attaining the SDG is from 2015-2030. Bangladesh, being a proud country of one of the best achieving developing countries of the Goals and Targets of MDG, contributed a considerable number of Goals and Targets for SDG. Bangladesh led the developing countries in the intergovernmental negotiations to finalize the document. In stated 17 and 169 respectively, a good number Goals and Targets of SDG are directly or indirectly related to the Ministry of Fisheries and Livestock (MoFL) and the Department of Fisheries (DoF), Bangladesh. The Goal number 14, titled as the "Life Below Water" states the development and sustainable use of the oceans which is directly related to fisheries sector. Being a member of the countries of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME), we could exploit hardly a little of our marine and coastal living resources due to insufficient manpower, knowledge, equipments and initiatives. Under the SDG, It is now an obligation of sustainable use of this resource. We are happy that after a long wait, the survey and research vessel "R V Meen Sandhani" is now in Bangladesh, waiting for her commissioning and first voyage. This vessel can open a new dimension of sustainable use of the marine and coastal resources of Bangladesh.

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও মৃত্যুহার রোধ করে সৌহার্দ্যপূর্ণ বিশ্ব গঠনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি) ঘোষণা করে। ঘোষণাপত্রে বলা হয় ২০০০ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হলে উন্নত দেশসমূহ সব ধরনের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে। নির্ধারিত ৮টি লক্ষ্যমাত্রা ছিল- চরম দারিদ্র্য হ্রাস ও ক্ষুধা দূরীকরণ; সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন; জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন; শিশু মৃত্যু হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন; এইডসসহ ঘাতক রোগ নির্মূল; টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের উন্নয়ন বিকশিতকরণ। বাংলাদেশ এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নেতৃত্ব প্রদানযোগ্য প্রশংসনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। উন্নয়নশীল যে কোনো দেশের চেয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল এগিয়ে। এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য সম্পর্কে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন প্রশংসা করেছেন। শিশু মৃত্যুহার কমানোর অনন্য সাফল্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 'জাতিসংঘ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড ২০১০' সম্মাননা গ্রহণ করেন।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর দৃশ্যমান সাফল্যের পর জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal- SDG) ঘোষণা

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে অনন্য সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন

করে। জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ ২০১৫ সাল পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত আলোচনার পর চূড়ান্ত দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এবং ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনের 'Sustainable Development Summit'-এ ১৯৩টি সদস্য দেশের সরকার প্রধান/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (goal) এবং ১৬৯টি অন্তর্গত লক্ষ্যমাত্রা (target) সম্বলিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal) হিসেবে উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়।

এটি প্রণয়নে বাংলাদেশের প্রস্তাবনাসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। চূড়ান্ত বিবেচনায় বাংলাদেশের ১১টি অভীষ্ট লক্ষ্য, ৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৪১টি সূচকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) যে প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে তন্মধ্যে ১০টি লক্ষ্যই জাতিসংঘে গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় গৃহীত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনেতা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal- SDG) হলো ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যা 'টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা (Transforming our world : the Agenda for Sustainable Development)' হিসেবে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে প্রচার ও বাস্তবায়ন করছে।

অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Goals)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
1 NO POVERTY	দারিদ্র্য: সকল দেশ থেকে সব ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ (Poverty: End poverty in its all forms everywhere);
2 ZERO HUNGER	ক্ষুধামুক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তা: খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়া (Hunger and Food Security: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture);
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	উত্তম স্বাস্থ্য ও কল্যাণ: সবার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনের নিশ্চয়তা ও সকল বয়সী মানুষের জন্য সমৃদ্ধ জীবনের প্রণোদনা প্রদান (Good health and well being: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages);
4 QUALITY EDUCATION	শিক্ষা: সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সবার জন্য যথাযথ ও উন্নত মানের শিক্ষা এবং আজীবন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা (Education: Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning);
5 GENDER EQUALITY	লিঙ্গ সমতা ও নারী উন্নয়ন: লিঙ্গ সমতা অর্জন ও সকল কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন (Gender equality and Women's Empowerment: Achieve gender equality and empower all women and girls);
6 CLEAN WATER AND SANITATION	পানি ও স্যানিটেশন: সবার জন্য পানি ও স্যানিটেশন সহজলভ্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা-করণ (Water and Sanitation: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all);
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	জ্বালানি/শক্তি: সকলের জন্য সহজলভ্য, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক শক্তি (জ্বালানি/বিদ্যুৎ) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা (Energy: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and clean energy for all);
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	কর্মসংস্থান সৃষ্টি: সকলের জন্য যোগ্য কাজ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহ প্রদান (Economic Growth: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all);
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্পায়ন: দ্রুত পুনঃনির্মাণযোগ্য অবকাঠামোর মাধ্যমে বৃহৎ, টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনের প্রযুক্তিকে উৎসাহিতকরণ (Infrastructure, industrialization: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation);
10 REDUCED INEQUALITIES	অসমতা: অন্তঃ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য কমিয়ে আনা (Inequality: Reduce inequality within and among countries);
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	শহর: শহর ও মানুষের বসতিসমূহকে একীভূত, নিরাপদ, প্রাণবন্ত ও টেকসই করা (Cities: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable);
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	সেবন ও উৎপাদন: সেবন ও উৎপাদন টেকসইকরণ (Sustainable Consumption and production: Ensure sustainable consumption and production patterns);
13 CLIMATE ACTION	জলবায়ু পরিবর্তন: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব রোধকল্পে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ (Climate Change: Take urgent action to combat climate change and its impacts);
14 LIFE BELOW WATER	সাগর উন্নয়ন ও ব্যবহার: সাগর, মহাসাগর ও সমুদ্রসম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (Oceans: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development);

15 LIFE ON LAND	**জীববৈচিত্র্য, বনসম্পদ, মরুময়তা:** পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, পুনঃস্থাপন ও টেকসই ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, বনসম্পদের সুরক্ষা, টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মরুময়তা রোধ (Biodiversity, Forests, and Deforestation: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reserve land degradation and halt biodiversity loss):
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	**শান্তি ও সুবিচার:** টেকসই উন্নয়নে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি (Peace and Justice: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels):
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	**অংশীদারিত্ব:** লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা (Partnership: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development)।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় মৎস্য খাত (Fisheries sector in SDG)

টেকসই উন্নয়নের ১৪ নং 'Life Below Water' শীর্ষক অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাটি সাগর উন্নয়ন ও এর টেকসই ব্যবহার সম্পর্কিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের মাধ্যমে সাগর বিজয়ের ফলে আমরা যে বিশাল সমুদ্রসীমার অধিকার লাভ করেছি, তার উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবহার এ অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে। প্রকৃতপক্ষে সক্ষমতার অভাবের ফলে সমুদ্রসম্পদের জরিপ, গবেষণা ও টেকসই ব্যবহার আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়েছিল।

চিত্র: জরিপ ও গবেষণা জাহাজ আর ভি মীন সন্ধানী

বর্তমান সরকারের সদয় অনুমোদনক্রমে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় নির্মিত জরিপ ও গবেষণা জাহাজ 'আরভি মীন সন্ধানী' ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এসেছে এবং তা কমিশনের অপেক্ষায় আছে। আশা করা যায়, অচিরেই এ জাহাজের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে যা থেকে সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনাও সম্ভবপর হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর প্রস্তাবিত সূচকসমূহ বিশ্লেষণের প্রাথমিক কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রণয়ন/প্রদানকারী সংস্থা এবং এসডিজি ম্যাপিং-এ লিড মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনের নিরিখে একটি কর্মশালার মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও তথ্য-উপাত্ত প্রণয়ন/প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনাপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ বিভাগ কর্তৃক SDG Data Gap Analysis বিষয়ে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়ায় নিম্নবর্ণিত অন্তর্গত লক্ষ্যমাত্রাসমূহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

14.6 : by 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing and least developed countries should be an integral part of the World Trade Organization fisheries subsidies negotiation,

14.7 : by 2030, increase the economic benefits to Small Island Developing States and least developed countries from sustainable use of marine resources, including through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism,

14.b : Provide access to small scaled artisanal fishers to marine resources and markets

এছাড়াও আরো ২৬টি অন্তর্গত লক্ষ্যমাত্রায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। খসড়াটির ওপর মতামত চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতার নিরিখে আরো বেশ কয়েকটি অন্তর্গত লক্ষ্যমাত্রায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে লিড মিনিস্ট্রি কিংবা সহযোগী মিনিস্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যা বিবেচনাধীন রয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত অংশায়নের ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সাফল্য অর্জনে আমাদের কোনো বিকল্প নেই। এটি সফল করতে হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহকে প্রথম থেকেই পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও সেটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এটি বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে নারীর সম্পৃক্ততা ঃ ইকোফিস প্রকল্পের উদ্যোগ

Women's Participation in Hilsa Fishery Conservation : An Initiative of ECOFISH[BD] Project

সাফিনা নাজনীন[১] ও ড. এম এ ওহাব[২]

Abstract

Hilsa (*Tenualosa ilisha*), is an anadromous fish, called 'Ilish' in Bengali and commonly known as 'Indian shad', that is honored as the national fish of Bangladesh. Approximately 0.45 million fishers directly depend on Hilsa fishing for their livelihood, and 2.5 million people are indirectly dependent on Hilsa fishery value chain. Women's participation in Hilsa fishery value chain in Bangladesh is largely invisible. They are assumed as neither to fish in coastal waters nor to directly participate in fishing because fishing is considered to be the mainly man's work. However, women can play an important role in Hilsa fishery value chain and therefore, can contribute to the decision making in sustainable fisheries management. In an effort to improve resilience of the Meghna river system and the communities reliant on Hilsa fishery, a USAID funded "Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISH[BD])" initiative has been jointly implemented by WorldFish and the Department of Fisheries (DoF), Bangladesh. Gender equity and women empowerment have been considered as important inbuilt component in this project. To increase resilience and social cohesion, ECOFISH[BD] addresses gender mainstreaming in all its activities. The project targets 100,000 fishers family members (around 50% women), who will be benefitted directly from the project. Also, 200 Fishers' Women Community Savings Groups (CSG) will be formed during the project period in different villages scattered throughout five Hilsa fish sanctuaries. Fishers' women have been provided with different on-farm and non-farm alternative income generating activities (AIGAs) to support the households during the fishing ban period and thus to influence the compliance of the management plan of the Government of Bangladesh.

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ যা এককভাবে মোট মৎস্য উৎপাদনে প্রায় ১১% অবদান রাখে। পদ্মা-মেঘনা অববাহিকা এবং তৎসংলগ্ন মোহনা ও সমুদ্র এলাকাই ইলিশের প্রধান চারণভূমি ও আহরণ স্থান। সারা পৃথিবীতে স্বাদের জন্য বাংলাদেশের ইলিশের সুখ্যাতি রয়েছে। ইলিশ অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান, যথেষ্ট ভিটামিন ও খনিজ উপাদানযুক্ত এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডে সমৃদ্ধ অত্যন্ত সুস্বাদু একটি মাছ। এছাড়া এ মাছটি জড়িয়ে আছে বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও আচার অনুষ্ঠানে। অতীতে বাংলাদেশের শ'খানেক নদীতে ইলিশ পাওয়া যেত। তবে বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত আহরণ, অতিরিক্ত পলি, আশঙ্কাজনক হারে বিভিন্ন রকম শিল্প কারখানার বর্জ্যপদার্থ ও দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দিন দিন এর সংখ্যা কমছে। এ কারণে ইলিশের ওপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা আজ হুমকির মুখোমুখি। ইলিশের উন্নত ব্যবস্থাপনা শুধু ইলিশেরই সংখ্যা বাড়াতে নয়, অন্যান্য প্রজাতির মাছ ও প্রাণী সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজন।

বাংলাদেশে জাতীয় মাছ ইলিশ আহরণ ও বাজারজাতকরণে নারীদের অংশগ্রহণ বলতে গেলে অনুপস্থিত। সংস্কৃতিগতভাবে ধরে নেয়া হয় যে, মাছ ধরা নারীদের কাজ নয়, এটা প্রধানত পুরুষদের কাজ। তবে বর্তমানে উপলব্ধি করা হচ্ছে যে, ইলিশ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। টেকসই ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের মতামত ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডি (USAID)-এর অর্থায়নে ইকোফিস (ECOFISH[BD]) প্রকল্প পদ্মা-মেঘনা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং নদী অববাহিকায় বসবাসরত জেলে সম্প্রদায় ও ইলিশ সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগণের জীবিকার মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মৎস্য গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ডফিস ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আবাসস্থল ও প্রতিবেশের (ecosystem) সক্ষমতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং এর ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক ও সামাজিক-প্রতিবেশে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন। মেঘনা অববাহিকায় পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন সম্পর্কিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে নারীদের অংশগ্রহণ জরুরি বিধায় তাদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে নানাভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম একটি হলো ইলিশ সম্পদ নির্ভর মৎস্যজীবী পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মৎস্যজীবী পরিবারের নারী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্যোগে নারীর সম্পৃক্তকরণ
(Women's participation in different initiatives of ECOFISH[BD])

জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন ইকোফিস প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী যেসব জেন্ডার বৈষম্যমূলক রীতি-নীতি সমাজে চালু রয়েছে, তা কমিয়ে এনে নারীদের ইতিবাচক ভূমিকা পালনে ইকোফিস প্রকল্প সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এ প্রকল্প থেকে মৎস্যজীবী পরিবারের যে এক লক্ষ সদস্য সরাসরি উপকৃত হবে, তার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই নারী। এ প্রকল্প আগামী তিন বছরে ৫০০ গ্রামীণ ইলিশ সংরক্ষণ দল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে; এতে নারীদের অংশগ্রহণ শতকরা ৩০ ভাগ হবে বলে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নারীদের জীবিকা উন্নয়নে সমর্থন দেয়া হচ্ছে এবং মৎস্যজীবী নারী সঞ্চয় গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের বিশেষ করে মৎস্যজীবী পরিবারের নারীদের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্প কর্মকাণ্ডে নারী সম্পৃক্তকরণের বিভিন্ন উদ্যোগ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. ইলিশ সংরক্ষণ দল (Hilsa Convservation Group)

সরকার কর্তৃক ঘোষিত পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়িত্বশীল সহ-ব্যবস্থাপনা (co-management) কাঠামো উন্নয়নে ইকোফিস প্রকল্প বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠী, পিরোজপুর, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ৮১টি গ্রামে দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারের জীবনমানের উন্নয়নে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নদীর ওপর নির্ভরশীল স্টেকহোল্ডারদের সাথে গ্রাম পর্যায়ে আলোচনা করে মৎস্যজীবী পরিবার শনাক্ত করা হয়েছে। ইলিশের অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য ইলিশ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী পরিবারের জীবন জীবিকা উন্নয়নে বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে ইলিশ সংরক্ষণ দল গঠিত হয়েছে। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তাদের মতামত যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য এ দলে শতকরা ৩০ ভাগ নারী সদস্যের কার্যকর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চিত্র: ইলিশ সংরক্ষণ দলে আলোচনা

ইলিশ সংরক্ষণ দল তৈরির প্রয়োজনীয়তা

- ইলিশের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী পরিবারের মাঝে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা;
- স্থানীয় সম্পদ তথা ইলিশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে সমাজের লোকদের সচেতন করা;
- ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবনমানের উন্নয়নে সহায়তা করা;
- মৎস্যজীবীদের শুধুমাত্র ইলিশ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা;
- মাছ ধরা বন্ধকালীন বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে এলাকার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- মৎস্যজীবীরা তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- মৎস্যজীবীদের সাথে সরকারি/বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা;
- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রাপ্তির জন্য নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো;
- নতুন প্রযুক্তিসমূহে প্রবেশাধিকার সহজগম্য করা;
- প্রাকৃতিক,সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা; এবং
- সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

২. মৎস্যজীবী নারী সঞ্চয় দল (Community Saving Group)

পরিবারের ভরণ-পোষণ ও জীবিকার জন্য জেলেপাড়ার সমর্থ সব পুরুষই উদয়-অস্ত মাছ শিকারে ব্যস্ত সময় পার করেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র কিংবা উত্তাল নদীতে। মাসের অনেকদিনই তাদের রাত কাটে খোলা নদী-সমুদ্রের বুকে মাছ ধরার নৌকা বা ট্রলারে। এমনও সময় যায়, দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত তাদের ব্যস্ত সময় কাটে মাছ শিকারে। সে সময়টাতে টানাপোড়েনে জর্জরিত জেলেপাড়ার প্রতিটি ঘরে আরো বেশি করে দেখা দেয় অর্থের টানাটানি। দাদন ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দেনা শোধের পর যেটুকু অর্থ হাতে আসে সেই অর্থ দিয়ে সংসারের চাহিদা মেটে না কোনো পরিবারেই।

এদিকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জেলেরা মাছ শিকার করে না। যখন নিষেধাজ্ঞা থাকে, তখন সাময়িক বেকারত্ব দেখা দেয় তাদের। সরকারের পক্ষ থেকে যে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়, তা দিয়ে কিছুটা উপশম হলেও তাদের অন্যত্র কাজের সন্ধান করতে হয়। আবার অনেক জেলে পরিবারকেই দাদন ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে জাল ও নৌকা মেরামতের কাজ করতে হয়। এ কারণে তাদের ঋণের বোঝা বেড়ে যায়, আর এতে সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় জেলে পরিবারের নারী সদস্যরা। তাই আমাদের বর্তমান আর্থসামাজিক কাঠামোতে দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জন্য সঞ্চয় করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কেননা নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন বিপর্যয় এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় সহজ শিকার এ দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী সঞ্চয়ের অভাবে বিপদ আপদের সময় সম্পূর্ণভাবে অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। সঞ্চয়ের সুযোগ থাকলে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ সঞ্চয় নিয়মিতভাবে জমা করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিপদে-আপদে সহায় হিসেবে এবং সম্পদ বিক্রি ও মহাজনী বা এনজিও'র ঋণের অভিশাপ মুক্ত থাকতে পারবে। সর্বোপরি নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

মৎস্যজীবী নারী সঞ্চয় দল গঠনের উদ্দেশ্য

- জেলে পরিবারের নারীরা একত্রিত হয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে;
- গ্রামের দরিদ্র নারীরা বিকল্প কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করবে এবং ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাবে;
- সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে তহবিল গঠন করা, নিজেদের মধ্যে তহবিল ব্যবহার করা এবং স্থানীয় সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ঋণ ও অন্যান্য সেবা/সুযোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে; এবং
- নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা এবং সকল কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ইকোফিস প্রকল্পের সহায়তায় মৎস্যজীবী পরিবারের প্রায় ১৩৯৭ জন নারী নিয়ে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৯টি মৎস্যজীবী নারী সঞ্চয় দল গঠন করা হয়েছে। এসব দল প্রায় ৬,২৯,৩৬০.০০ টাকা সঞ্চয় করেছেন। নিজেদের জমানো টাকা, আর ইকোফিস প্রকল্পের অনুদানে গড়া তহবিল থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে তারা বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত মৎস্যজীবী নারী সঞ্চয় দলের সঞ্চয় পাশের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি : মৎস্যজীবী নারী সঞ্চয় প্রকল্প

এনজিও	সঞ্চয় দলের সংখ্যা (টি)	নারীর সংখ্যা (জন)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
কোডেক	১৩	৩৭০	১,১২,১৫০.০০
সিএনআরএস	২৮	৭৬৪	৩,৭৪,৭৬০.০০
কোস্ট ট্রাস্ট	৮	২৬৩	১,৪২,৪৫০.০০
সর্বমোট	৪৯	১৩৯৭	৬,২৯,৩৬০.০০

৩. বিকল্প কর্মসংস্থান (Alternative employement)

জেলে সম্প্রদায় এক সময় বেশি মাছ ধরার মাধ্যমে বেশি আয় করত। কিন্তু বর্তমানে ইলিশ মাছ ধরা কমে যাওয়ার কারণে ইলিশ ও জাটকা মাছ আহরণকারীরা জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে গরিব। তাদের বিকল্প কোনো জীবিকায়ন কার্যক্রম নেই। এর সাথে সম্পদের অপ্রতুলতাও রয়েছে। যদিও প্রতিটি মৎস্য অভয়াশ্রমে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকালীন প্রতি বছরে সরকারিভাবে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রতি মাসে (ফেব্রুয়ারি থেকে মে) ৪০ কেজি করে চাল দেয়া হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে ইকোফিস প্রকল্পে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয় যা মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে দরিদ্র জেলেদের জীবিকা উপার্জনে ভূমিকা রাখবে। এ প্রকল্পের ফলে জেলে পরিবারের সদস্যরা বিশেষত নারীরা বসতভিটার চারপাশে সবজি ও ফলের বাগান, গবাদিপশু পালন কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে ইলিশ সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সক্ষম হবেন। এছাড়াও তারা বিশেষ পদ্ধতিতে খাঁচায় মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন- দোকান কিংবা মাছ ব্যবসা; কুটির শিল্প যেমন- পুতুল বুনানো, হাতে বোনা পাটি তৈরির কাজ করছেন। এজন্য তারা প্রশিক্ষণও পেয়েছেন। এসব কাজের বাইরেও সময় পেলে পরিবারের নারীরা ছাগল পালন ও মুড়ি ভাজার কাজ করছেন। আর সব কাজেই তাদের সাধ্যমতো সহায়তা করছেন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা।

পুতুলে স্বপ্ন বুনন

জেলে পরিবারের বেশিরভাগ পুরুষই নদী কিংবা সাগরে মাছ শিকার করে। জীবিকা নির্বাহের জন্য জেলেরা যখন নদীতে মাছ ধরে কিংবা বছরের নির্ধারিত যে সময়গুলোতে মাছ ধরা বন্ধ থাকছে, সে সময়ে তাদের পরিবারের নারী সদস্যরাই বড় ভূমিকা রাখছেন। অবসর সময়ে জেলেপল্লীর ঘরে-ঘরে গৃহবধূ-তরুণী-কিশোরীরা তৈরি করছেন হরেক নকশার বাহারি রঙের পুতুল। এ পুতুল বুনেই জেলেপাড়ার নারীরা সংসারে স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছেন শ্রী। সে সাথে বুকের গহীনে বুনছেন অনাগত দিনের সাবলম্বী পরিবারের স্বপ্ন।

চিত্র: পুতুলে জীবিকা নির্বাহ

গ্রামের এসব নারীরা পুতুল তৈরির পাশাপাশি নকশা, পাটি বোনাসহ অন্যান্য হস্তশিল্পের কাজও করছে। জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার পথকে আরো সুগম করছেন তাঁরা। ইকোফিস প্রকল্পভুক্ত তিনটি জেলার (বরিশাল, পটুয়াখালী ও ভোলা) জেলেপাড়ায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নারী সদস্যরা পুতুল তৈরির কাজ করছেন। এছাড়া কেউ সেলাই, কেউ পাটি বুনন, কেউবা নকশার কাজ করছেন। জেলেপাড়ার গৃহবধূরা তাদের গ্রামে সুতা দিয়ে পুতুল তৈরির কাজ করতে পারেন এমন অর্ধশতাধিক পরিবারে শতাধিক নারী রয়েছেন। সম্প্রতি পরিবারের নারীরা ছোটখাটো কাজ করে অর্থের যোগান দিচ্ছেন। এটা পরিমাণে অল্প হলেও অনেক সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। ফলে গ্রামের পুরুষরা পরিবারের নারী সদস্যদের হস্তশিল্প ও অন্যান্য কাজে উৎসাহ দিতে শুরু করেছেন। পাশাপাশি গ্রামের সব মেয়েরা এখন স্কুলেও যাচ্ছে। গ্রামের জেলেরা মনে করেন, এভাবে একসময় জেলে পরিবারের কাঁধ থেকে ঋণের বোঝা নামবে, পরিবারে ফিরবে সচ্ছলতা। একই স্বপ্ন দেখছেন জেলেপাড়ার নারীরাও।

৪. মৎস্যজীবী নারী সম্মেলন (Women's fishers conference)

ইলিশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নারীদের ভূমিকা জোরদার করতে ইকোফিস প্রকল্প সদা সচেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও ইলিশ সংরক্ষণে অন্যদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চেইঞ্জ-এজেন্ট বা পরিবর্তক কর্মী হিসেবে কাজ করতে 'মৎস্যজীবী নারী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬-এর সাথে সঙ্গতি রেখে মৎস্যজীবী নারী সম্মেলনের প্রতিপাদ্য 'মৎস্যজীবী পরিবার - সমতার অঙ্গীকার' নির্ধারণ করা হয়। নয়টি উপকূলীয় জেলার ১০০ জন মৎস্যজীবী নারী এবং সেই সাথে প্রতিটি গ্রাম থেকে একজন করে পুরুষ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আগত সেরা নারী বা চ্যাম্পিয়নগণ অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। একই সাথে জেলে পরিবারের সকল অতিথিবৃন্দ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক

চিত্র: মৎস্যজীবী নারী সম্মেলন

অনুষ্ঠান, উৎসাহব্যঞ্জক বিভিন্ন ভিডিও, সাফল্য গাঁথা, নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করেন। সুযোগ দেয়া হলে নারীরাও নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সমতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। নারীপুরুষ, মিলিতভাবেই ইলিশ সম্পদ রক্ষাসহ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে বলে সম্মেলনে অঙ্গীকার করা হয়

চিত্র: সমতার অঙ্গীকার

উপসংহার (Conclusion)

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে মৎস্যজীবীদের সহায়তা প্রদান, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে মৎস্য অভয়াশ্রম বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা জোরদার করা যায় ও উপযুক্ত সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা যায়। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে নারীদের আর্থসামাজিক ও প্রতিবেশ সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি-দাতাদের যৌথ প্রচেষ্টার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন এবং মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

[২] জেন্ডার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিস্ট, ইকোফিস[বিডি], ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ
[১] টীম লিডার, ইকোফিস[বিডি], ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ

পোনা সংগ্রহ করতে হয়। চাহিদা মাফিক তেলাপিয়ার পোনা প্রাপ্তির জন্য স্থানীয়ভাবে পুকুরে নার্সারি স্থাপনের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত ঘন ফাঁসের জাল দ্বারা তৈরি খাঁচায় নিজস্ব উদ্যোগে পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

পোনা মজুদ: খাঁচায় যতটা সম্ভব বড় (৫০-১০০ গ্রাম ওজনের) এবং সমান আকারের পোনা মজুদ করা উচিত। মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করবে কী আকারের মাছ বাজারজাত করা হবে। সাধারণত গড় ওজন ৫০০ গ্রামের ওপরে মাছ বাজারজাত করতে প্রতি ঘনমিটারে ১৫-২০টি এবং ৫০০ গ্রামের নিচে বাজারজাত করতে প্রতি ঘনমিটারে ২৫-৩৫টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা: খাঁচায় মাছচাষে সাধারণত ভাসমান খাদ্য প্রযোজ্য। তবে এ অঞ্চলে ভাসমান মৎস্য খাদ্য সরবরাহ অপ্রতুল। হাতে গোনা ২/১টি কোম্পানির ভাসমান মৎস্য খাদ্য পাওয়া যায়। এ কারণে মাছের খাদ্যের বাজারে একটা একচেটিয়া ভাব বিরাজ করে। বাজারে খাঁচায় তেলাপিয়া চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শতকরা ৩০ ভাগ আমিষযুক্ত খাদ্যের অভাব রয়েছে যা নিশ্চিত করা দরকার। প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য ৫২-৫৪ টাকা যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। খাদ্যের উচ্চমূল্য ছাড়াও অনেকসময় খাদ্যের গুণগত মান, খাদ্য রূপান্তর হার, খাদ্য সংরক্ষণ ও খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় খামারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ বিষয়ে খামারিদেরকে সম্প্রসারণ সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

বাজারজাতকরণ: উৎপাদিত মাছ বাজারজাতকরণ এখানকার অন্যতম সমস্যা। মাছ বিক্রি করতে হলে ৪০ কেজিতে ৪-৫ কেজি অতিরিক্ত মাছ আড়তদারকে দিতে হয় যা স্থানীয় ভাষায় 'ঢলন' নামে পরিচিত। স্থানীয়ভাবে ৪০০-৫০০ গ্রাম গড় ওজনের তেলাপিয়া মাছের প্রতি কেজির মূল্য ১২০-১৬০ টাকার উর্ধ্বে নয়। মাছের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় অনেক খামারি মাছচাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। বাজার যাচাই করে উদ্যোক্তাকে খাঁচায় মাছ উৎপাদন পরিকল্পনা করতে হবে। উৎপাদিত মাছ কত ওজনের হবে, কখন, কোথায় এবং কীভাবে বাজারজাত করা হবে এসব বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত ও যথাযথভাবে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করার পর মাছচাষ শুরু করা প্রয়োজন নইলে বিনিয়োগ লাভজনক নাও হতে পারে। দূষণমুক্ত পরিবেশে ও গুড অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস (জিএপি)-এ উৎপাদিত মাছ গুণগত দিক থেকে মানসম্পন্ন বিধায় আন্তর্জাতিক বাজারে এ মাছ বাজারজাত করতে প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

রোগবালাই: খাঁচার মাছে কখনও কখনও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দেখা দেয়। বর্ষার প্রারম্ভে ময়লা পানিতে এটা দেখা যায়। সম্ভবত এটি স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব, দূষিত পানি, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার প্রয়োগে এ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসায় এ রোগ শতকরা ৮০-৯০ ভাগ নিরাময় করা সম্ভব।

কারিগরি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ: খাঁচায় মাছচাষের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের জন্য ব্যাপক খামারি প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ সেক্টরে বাস্তব কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রসারণ কর্মীরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তরকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার: এটি একটি উদ্বেগজনক বিষয়। কতিপয় মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা এবং ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা তাদের পণ্য বাজারজাত করছেন। জেনে কিংবা না জেনে খামারিগণ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এসব ঔষধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ করছেন। মৎস্যচাষ বিষয়ক সব রাসায়নিক পণ্য এবং ঔষধের সরকারি অনুমোদন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গবেষণা ও একাডেমিক বিষয়: স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বিএফআরআই ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মাঠের খামারিদের স্বার্থে তেলাপিয়া ব্যতীত অন্য প্রজাতি যেমন- পাঙ্গাস, কমনকার্প, পাবদা ইত্যাদি মাছের খাঁচায় বাণিজ্যিক-ভাবে চাষের সম্ভাবনা ও উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে এলাকাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণায় উদ্ভাবিত চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিশেষ পর্যবেক্ষণ: উত্তরাঞ্চলে নভেম্বর থেকে শীতের প্রকোপ বাড়তে থাকে এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পুকুরে এ ২/৩ মাস মাছের তেমন কোনো বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু পুকুরের পানির চেয়ে নদীর পানির তাপমাত্রা সর্বদা ২-৪° বেশি থাকে। তাই পুকুরে শীতে মাছের বৃদ্ধি কম বা বন্ধ থাকলেও নদীতে স্থাপিত খাঁচার মাছ দিব্যি বড় হয়। তাই পানির তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণে রেখে অতিরিক্ত সময়ে নদীতে খাঁচায় মাছচাষ করা সম্ভব। তবে শীতের সময় মাছের অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে যেন মাছ রোগাক্রান্ত না হয়।

চিত্র: মহানন্দা নদীতে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর) ভাসমান খাঁচায় মাছচাষ

কর্তব্য: খাঁচা তৈরির জন্য কেবল নির্ধারিত মানের ও ফাঁসের জাল ব্যবহার করতে হবে। গুণগত মানসম্মত পোনা ও খাদ্য ব্যবহার করতে হবে। মজুদকৃত তেলাপিয়াকে তারিখ অনুসারে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য নিয়মিত প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগকৃত খাবারের হিসাব রাখতে হবে। সর্বোপরি 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস' অর্থাৎ 'উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন' অনুসরণ করতে হবে।

- স্থানীয় বিপণন পদ্ধতি সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারনা এবং সে মোতাবেক পরামর্শ প্রদান;
- সমিতি গঠন সম্পর্কিত ধারণা এবং সে মোতাবেক পরামর্শ প্রদান;
- রেকর্ড সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণা এবং সে মোতাবেক পরামর্শ প্রদান; এবং
- সম্ভাব্য সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে উৎপাদনমুখী প্রকল্প বা প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা।

চিত্র: মহানন্দা নদীতে (সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ভাসমান খাঁচায় মাছচাষ প্রকল্পের উৎপাদিত মাছ

সফল সম্প্রসারণ কর্মীর বিবেচ্য
(Considerations for a successful extension worker)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ভাসমান খাঁচায় মাছচাষ প্রযুক্তি সফল সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতার আলোকে উল্লেখ করা যায় যে, নতুন কোনো প্রযুক্তি সাফল্যের সাথে সম্প্রসারণের জন্য একজন সম্প্রসারণ কর্মীকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে:

- প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং সে সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনা;
- আগ্রহী খামারি/ সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা;
- খাদ্য ও পোনার প্রাপ্যতা এবং এর গুণগত মান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং সে মোতাবেক পরামর্শ প্রদান;

উপসংহার (Conclusion)

বর্তমানে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে ৪র্থ এবং মাছচাষে ৫ম স্থান অধিকার করেছে এ ক্রমধারা অক্ষুণ্ন রাখতে এমনকি তা ছাড়িয়ে যেতে সম্ভাব্য সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে মানসম্পন্ন মাছ রপ্তানি করতে নদীতে ভাসমান খাঁচায় মাছচাষ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা বলাই বাহুল্য। খামারি, সম্প্রসারণ কর্মী ও বিজ্ঞানী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই 'রূপকল্প ২০২১'-এর সফল বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

[১]সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]পরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রমের গুরুত্ব ঃ প্রেক্ষিত বাইক্কা বিল

Importance of Sanctuary for Enhancement of Fish Production and Biodiversity : Baikka Beel Perspective

ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন[১] ও ড. মোঃ আবদুল কাইয়োম[২]

Abstract

Wetlands comprising of areas seasonally or permanently under water have been declining and degrading rapidly in Bangladesh over the past three decades. Factors behind this include flood control and drainage, expansion of agriculture, aquaculture and urban development, over exploitation of resources, infrastructure, blocking waterways and pollution. This degradation bring threats to fish production from inland open water and other services and products including aquatic plants used for food, animal fodder. A wetland sanctuary can be the option to increase the fish production through biodiversity conservation. Wetland sanctuary is defined as an area of public lands and water that is permanently set aside by the Government to have no human extractive use round the year. Baikka Beel Sanctuary a Government declared permanent wetland sanctuary at Hail Haor managed by local resource management organization (RMO) is performing an excellent job to enhance fish production in the area and regenerating biodiversity as well. The estimated production in Hail Haor was significantly higher during 2015 compared to baseline of the year 2000 and increased of production from 171 to 402 kg/ha. Changing in number of species in Hail Haor during MACH, IPAC and CREL period also showed that the number of fish species also increased from 71 to 79 species during the same period. The study revealed that the impact of biological significance of improved management practices through establishment and maintenance of permanent wetland sanctuary has a significant role on production enhancement and species diversity. A particular safe areas that contain water during the dry season play a vital for survival of fish population and act as a "brood-fish bank" that helps to repopulate the wider wetland-floodplain system.

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়সমূহ মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং এ খাত ২০১৪-১৫ সালে মোট মৎস্য উৎপাদনে ২৮.০৭% অবদান রেখেছে। এ উন্মুক্ত জলাসমূহের মধ্যে রয়েছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর শ্রেণি যা প্লাবনভূমিসহ মুক্ত জলাশয়সমূহের মাছের জন্য এক বিশাল প্রজননক্ষেত্র। হাওর হলো উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের সমাহারে সৃষ্ট বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রতিবেশ। জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এক সময়ের মৎস্যভাণ্ডার বলে খ্যাত হাওরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জীববৈচিত্র্যে অনন্য হাইল হাওর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্ত জলাশয়গুলোর অন্যতম। মৌলভীবাজার জেলার প্রখ্যাত চা-সমৃদ্ধ শহর শ্রীমঙ্গল ও সদর উপজেলায় অবস্থিত হাইল হাওর যার পূর্বে রয়েছে বালিশারা পাহাড় আর পশ্চিমে সাতগাঁও পাহাড়। এ হাওরে ৬০০ বর্গ কিমি এলাকা হতে বৃষ্টির পানি সরবরাহ হয়; যেখানে রয়েছে অনেক গ্রাম, কৃষি জমি, আনারস-বাগান, চা-বাগান ও লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানসহ বনাঞ্চল। হাওরটি বর্ষায় ১৪,০০০ হেক্টর এলাকায় বিস্তৃত হয়; আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি কমলে ১৩০টি বিল ও বেশ কয়েকটি খালে বিখণ্ডিত হয়ে মোট ৪,০০০ হেক্টর জলাভূমিতে সঙ্কুচিত হয়। এ হাওর এলাকার ৬০টি গ্রামের ৩০ হাজার বসতবাড়ীতে প্রায় পৌনে ২ লক্ষ মানুষ বাস করে। এর ৮০% মানুষের কাজ হাওরে মাছ ধরা। এদের অনেকেরই জীবনধারণের একমাত্র পথ মাছ আহরণ করা। হাওরের মানুষ পশুচারণ, পশুখাদ্য আহরণ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ, খাদ্য ও ঔষধি হিসেবে শাকপাতার প্রয়োজনে হাওরের উপরেই নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বাদাভূমি হিসেবে হাইল হাওরের গুরুত্ব সর্বদাই স্বীকৃত। আর এ হাওরের পূর্বদিকের একটি বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জলাভূমির নাম বাইক্কা বিল। স্থায়ী অভয়াশ্রম হিসেবে খ্যাত বাইক্কা বিল হাইল হাওরের যদুরিয়া বিল ও চাপড়া মাগুরিয়া বিল সমন্বয়ে গঠিত এবং এর আয়তন প্রায় ১৪২ একর। শীতকালে পানি ১০ ফুট নেমে গিয়ে অবশিষ্ট জলাশয়ে সকল প্রাণী একত্রিত হয়ে বাইক্কা বিলের চেহারাই বদলে দেয়।

জাতিপুঁটি, সরপুঁটি, শিং, মাগুর, গুলশা, চিতল, বোয়াল, টাকি, শোল, গজার, মলা, বাইম, টেংরা, গুতুম, চিংড়ি, আইড়, কই, মেনি, ফলি, পাবদাসহ আরো অনেক প্রজাতির মাছের বাস এ বাইক্কা বিলে যারা এখানে বংশবৃদ্ধি করে পুরো হাওরে ছড়িয়ে পড়ে। এখন এ বিল মাছের জন্যেই শুধু নয়, বরং পাখি এবং অন্যান্য অনেক বন্য প্রাণীর জন্যও একটি চমৎকার নিরাপদ আবাসস্থল। এটি একটি নয়নাভিরাম জলাভূমি যেখানে হাজারো শাপলা আর পদ্ম ফুল ফোটে। এখানে সর্বত্র পানকৌড়ি, কানিবক, সাদা বক, গোবক, ধুপনি বক, রাঙা বক, পান মুরগি, বেগুনি কালেম দলে দলে দেখা যায় এবং শীতের অতিথি হয়ে এ বিলে আসে গেওয়ালা বাটান, মেটেমাথা টিটি আর কালাপাখ ঠেঙ্গীসহ অনেক প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। সম্প্রতি বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক এ হাওরকে 'গুরুত্বপূর্ণ পাখি এলাকা' হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। সংলগ্ন বনভূমি নিয়ে এ হাওর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চলগুলোর অন্যতম।

মাচ প্রকল্প কর্তৃক ১৯৯৯ সালে সংগৃহীত তথ্যমতে হাওরটি ৯৮ প্রজাতির মাছের আবাসভূমি এবং ১৬০ প্রজাতির পাখির বিচরণক্ষেত্র।

স্থায়ী জলাভূমি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য
(Objectives of establishment of sanctuaries in swamp areas)

জলাভূমি অভয়াশ্রম বলতে জলাশয় সমৃদ্ধ এরূপ সরকারী ভূমি এলাকাকে বোঝায় যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সারাবছর স্থায়ীভাবে জনসাধারণকে আহরণমুখী ব্যবহার থেকে বিরত রাখা হয়। তবে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় অভয়াশ্রমের বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্যগত গুরুত্ব রক্ষা বা উন্নয়নের লক্ষ্যে অভয়াশ্রম থেকে আহরণবহির্ভূত ব্যবহার (যেমন-প্রকৃতি পর্যটন) অনুমোদনযোগ্য হতে পারে। বিগত কয়েক দশক যাবত বাংলাদেশে মৌসুমি বা স্থায়ীভাবে পানিতে নিমজ্জিত জলাভূমির সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। এর পিছনে কারণগুলো হলো- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অবকাঠামো তৈরি, কৃষি জমিতে রূপান্তর, মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা এবং নগরায়ন, সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ, পানির গতিপথরোধক স্থাপনা স্থাপন এবং দূষণ। স্থায়ী জলাভূমি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে অভয়াশ্রম এলাকায় মানুষ কর্তৃক জলজ সম্পদের আহরণমুখী ব্যবহার বন্ধ করে জলজ জীবের (মাছ, পাখি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর, উদ্ভিদ ইত্যাদি) জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এবং প্রাচুর্য রক্ষা করা। এক্ষেত্রে অভয়াশ্রমে সারা বছর বা বছরের কোনো বিশেষ সময় রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে উক্ত জলাভূমিতে বসবাসরত জীবসমূহের জন্য নিরাপদ স্থান করে দেয়া হয়। এজন্য স্থায়ী জলাভূমি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে মাছ ও অন্যান্য জীবের টিকে থাকার জন্য শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে এমন স্থান নির্বাচন করা আবশ্যক। এসকল স্থান 'ব্রুড মাছের আশ্রয়স্থল (Brood-Fish-Bank)' হিসেবে কাজ করে এবং পরবর্তীতে প্রজননের
মাধ্যমে বৃহত্তর প্লাবনভূমি জলাভূমিকে মাছে পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করে।

স্থায়ী অভয়াশ্রম হিসেবে বাইক্কা বিল ও এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা
(Baikka beel as a permanent sanctuary and its present statuse)

বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার পর ১ জুলাই ২০০৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় বাইক্কা বিলকে একটি স্থায়ী অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন থেকে বিলটিকে মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির বলে বাইক্কা বিল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে স্থানীয় বড়গাঙ্গিনা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন (আরএমও)। সংগঠনটির দায়িত্ব হলো অভয়াশ্রমটি রক্ষা করা এবং এর সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। তাদের কাজে সহায়তা করছে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিটি এবং মৎস্য অধিদপ্তর। বর্ষায় আংশিক ডুবে যাওয়া গাছ বিভিন্ন ছোট মাছের জন্য ভাল বিচরণ ক্ষেত্র বিধায় প্রাকৃতিক বাদাবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন এখানে হিজল আর করচ গাছের চারা লাগিয়েছে। উল্লেখ্য, হাইল হাওরের বাইক্কা বিলকে স্থায়ী অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণার পর থেকে মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

হাইল হাওরে বাইক্কা বিল অভয়াশ্রমের প্রভাব
(Effect of Baikka beel sanctuary on Hail haor)

ক্রেল প্রকল্প থেকে নিয়মিতভাবে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ যথা- মাচ (MACH), আইপ্যাক (IPAC) প্রকল্পের আদলে হাইল হাওরের ৬ টি স্থানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন পর্যবেক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য পরীবিক্ষণ করা হচ্ছে। ফিশক্যাচ মনিটরিংএর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মৎস্য সম্পদের প্রাপ্যতা ও জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের সময় মৎস্য আহরণ সরঞ্জামের প্রকৃতি ও সংখ্যা, প্রজাতিভিত্তিক মাছের পরিমাণ, প্রতি এলাকায় মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হাওর এলাকায় প্রায় অর্ধশতাধিক প্রকারের মৎস্য আহরণ সরঞ্জামের ব্যবহার দেখা যায়, তবে যে সকল সরঞ্জাম বেশি দেখা যায় তা হলো- পাটা জাল, কই জাল, ফাঁস জাল, বেড়জাল, মইজাল, বাঁধাজাল, ভেসালজাল, ধর্মজাল, খেপলা বা ঝাঁকি জাল, ঠেলা জাল, খুলসন, আনটা, পলো, বাইর, ঘুনি, চারো, সোলা বরশি, টেটা, যুত, কোঁচ, বানা ইত্যাদি অন্যতম। সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত সরঞ্জামভিত্তিক মৎস্য আহরণ হার নিম্নবর্ণিত চিত্রে দেখানো হলো।

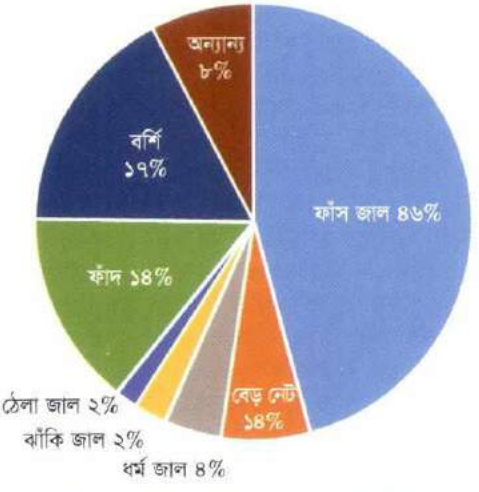

চিত্র: হাইল হাওরে সরঞ্জামভিত্তিক মৎস্য আহরণ হার

হাইল হাওরে ঋতুভিত্তিক মৎস্য আহরণের হার (Seasonwise fishing rate at Hail haor)

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলে মাছের উৎপাদন ঋতুভিত্তিক এবং তা বিভিন্ন সময়ে ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে এবং এগুলি নির্ভর করে প্লাবনের মাত্রা, মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার ও এর ব্যাপকতা এবং মাছ প্রাপ্তির ওপর। হাইল হাওরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। ক্রেল প্রকল্প থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে সবচেয়ে বেশি মাছ এবং বর্ষা-পূর্ব মৌসুমে সবচেয়ে কম মাছ আহরিত হয়ে থাকে এবং এ হার যথাক্রমে শতকরা ৪২ ও ১১ ভাগ। চিত্রে হাইল হাওরে ঋতুভিত্তিক মৎস্য আহরণের হার দেখানো হলো।

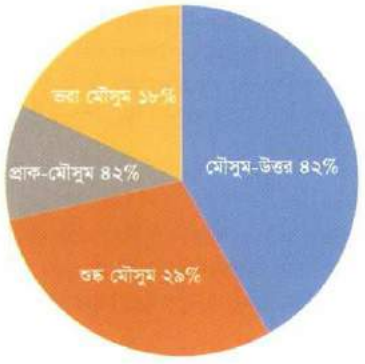

চিত্র: হাইল হাওরের ঋতুভিত্তিক মৎস্য আহরণ হার

হাওরের সার্বিক উৎপাদন (Overall production of haor)

মাচ প্রকল্প শুরুর পর প্রথম ১৯৯৯-২০০০ সালে হাওরের উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বেইজলাইন সার্ভে করা হয়। বিগত ১৬ বছরের প্রাপ্ত তথ্য মতে দেখা যায় যে বেইজলাইন সার্ভের সময় হাইল হাওরের উৎপাদন ছিল ১৭১ কেজি/হেক্টর এবং তা ২০১৪-১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০২ কেজি/হেক্টর-এ উন্নীত হয়েছে। বেইজলাইন সার্ভেসহ মাচ, আইপ্যাক ও বর্তমান ক্রেল প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো।

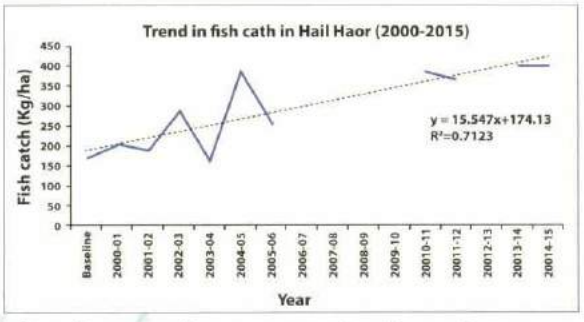

চিত্র: হাইল হাওরের বিগত ১৬ বছরের হেক্টর প্রতি মৎস্য উৎপাদন হার

মৎস্য আহরণ তথ্যের ভিত্তিতে হাইল হাওরের মৎস্য জীববৈচিত্র্য (Fish biodiversity of Hail haor according to catch composetion)

হাওরের মাছের প্রজাতিসমূহের জীববৈচিত্র্যের অবস্থা পরিবীক্ষণের জন্য ১৯৯৯-২০০০ সালের বেইজলাইন সার্ভেসহ বিগত এবং বর্তমান প্রকল্পের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় হাইল হাওর এলাকায় ২০০০ সালে ৭১ প্রজাতির এবং ২০১৫ সালে ৭৯ প্রজাতির মাছ পাওয়া গেছে। তবে উল্লেখ্য ২০১২ সালে সর্বোচ্চ ৮৫ প্রজাতির মাছ হাইল হাওরে দেখা গেছে। বেইজলাইন সার্ভেসহ মাচ, আইপ্যাক ও বর্তমান ক্রেল প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রাপ্ত হাইল হাওরের মৎস্য জীববৈচিত্র্যের ফলাফল নিম্নোক্ত চিত্রে উপস্থাপন করা হলো।

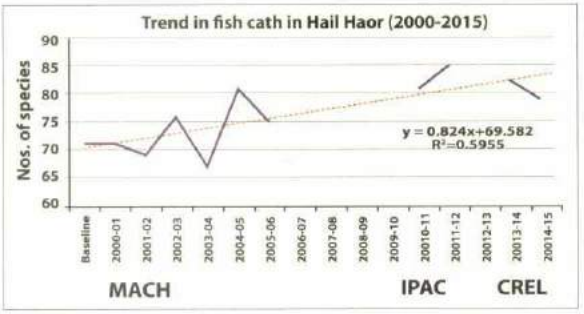

চিত্র: হাইল হাওরের বিগত ১৬ বছরের মৎস্য জীববৈচিত্র্য

উপসংহার (Conclusion)

জীবন-জীবিকার জন্য জলাভূমি অভয়াশ্রমের প্রধান উপকারী প্রভাব হচ্ছে শুষ্ক মৌসুম ও প্রজননকালে মাছকে সুরক্ষা প্রদান করা। প্রাণীর জীবনধারণের জন্য পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এবং মাছের জন্য পানি অপরিহার্য। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি সম্পদের উৎস ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং মিঠা ও বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা সঙ্কুচিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মৎস্য উৎপাদনের প্রতিবেশ ব্যাপকভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং দেশের প্লাবনভূমি এ সঙ্কটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও অধিক তাপমাত্রা ও খরা/অনাবৃষ্টির কারণে প্লাবনভূমি, নদী, খাল, মিষ্টি পানির জলাশয়, পুকুর শুকিয়ে মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং কার্যকর সংরক্ষণের মাধ্যমে ২-৪ বছরের মধ্যে জলাভূমির প্রজাতিমূহের জীববৈচিত্র্য যে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে বাইক্কা বিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এজন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ছোট আবাসস্থল যেমন - মৌসুমি কাদাযুক্ত এলাকা, অগভীর ও গভীর জলাশয়, নির্গমনশীল উদ্ভিদ ও জলার পাড়ের ঘনঝোপ সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক জলাভূমি সংরক্ষণের লক্ষ্যে সতর্কতার সাথে স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংলগ্ন বৃহত্তর জলাভূমি ও প্লাবনভূমি পুনরায় মাছে পরিপূর্ণ হতে পারে যা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

[১]সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিস-বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়া অফিস
[২]প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ইলিশ উৎপাদনে ভরা প্রজনন মৌসুমে ১৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ের প্রভাব

Impacts of 15-Days Banning Period on Breeding Season of Hilsa Production

ড. মোঃ আনিছুর রহমান[১], ফ্লোরা[১], মোঃ মেহেদী হাসান প্রামানিক[৩]

Abstract

The study was conducted to assess the impact of fifteen days fishing ban on breeding success of hilsa shad in the major spawning grounds of hilsa in the month of September and October, 2015. The study showed that fishing ban during spawning season has significant role in the successful reproduction of hilsa. Due to successful spawning of hilsa about 30,897 crore jatka were added to the hilsa population. In and around the spawning grounds among all the captured hilsa, male:female ratio was found 2:8. In the year 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 spent hilsa were observed about 33.69%, 36.27%, 35.79%, 41.02%, 38.89% and 36.60% respectively in the spawning ground during spawning season. The egg production was calculated as in the year 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 about 336199 kg, 385500Kg, 380400Kg, 447100Kg, 417765 Kg and 494365 Kg respectively hilsa eggs could have been produced indicating a positive impact of 15 days fishing ban in spawning season. On the other hand, fewer juveniles and spent hilsa were observed in the adjacent areas of the spawning grounds indicating that in comparison to the recent reports there is positive impact of fishing ban (brood production) on breeding success of hilsa. Finally, the fishing ban (hilsa brood protection) was found effective for successful breeding of hilsa.

ইলিশ বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। ইলিশ বলতে প্রাক্তন Hilsa গণের মাছকে বুঝায়। এ মাছ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারের Alosinae উপ-পরিবারের Tenualosa গণের অন্তর্ভুক্ত। ফিসার এবং বিয়ানচি (Fisher and Bianchi, 1984) হিলশা (Hilsa) গণটিকে Tenualosa গণভূক্ত করেন। বিশ্বে Tenualosa গণের মোট ৫ প্রজাতির (Species) মাছ পাওয়া যায়। T.ilisha প্রজাতির মাছ ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে (পারস্য উপসাগর হতে পূর্বদিকে মায়ানমার পর্যন্ত) বিস্তৃত এবং প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের দেশসমূহে, কখনও কখনও শ্রীলংকার উপকূল, টনকিন উপসাগর এবং ভিয়েতনাম উপকূলেও পাওয়া যায়। অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১০% এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩.৮৭ লক্ষ মে.টন (২০১৪-১৫) যার বাজারমূল্য ১৫,৪৮০ কোটি টাকা। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১%। ইলিশ মাছের অবাধ প্রবেশন নিশ্চিতকরণের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় অভয়াশ্রম ঘোষণা করে তা রক্ষা করা হচ্ছে, তেমনই অবাধ প্রজনন ও প্রাকৃতিকভাবে অধিক ডিম ও পোনা উৎপাদনের জন্য 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০' এর অধীনে সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার পূর্বে ৫ দিন ও পরে ৫ দিনসহ প্রধান প্রজনন এলাকায় মোট ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বর্তমানে সর্বশেষ সংশোধনের পর পূর্ণিমার পূর্বে ৩ দিন ও পরে ১১ দিনসহ প্রধান প্রজনন এলাকায় মোট ১৫ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রজনন এলাকায় ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- ইলিশ মাছের অবাধ প্রজনন সুবিধা বৃদ্ধি করা
- প্রজনন এলাকায় প্রজননক্ষম মাছ আহরণ বন্ধ রাখা
- উচ্চ মাত্রায় ডিম দেয় এরূপ মাছ আহরণ হতে রক্ষা করা এবং
- ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বংশ পরম্পরায় ইলিশ মাছকে প্রজননে অভ্যস্তকরণ।

উক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফল প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ইলিশের প্রধান প্রধান প্রজননক্ষেত্র ও অভয়াশ্রম এলাকা (Hilsa spawning ground and sanctuary areas)

ইলিশ মাছের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বজায় রাখতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন- অভয়াশ্রম ঘোষণা, ভরা প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ও জাটকা সংরক্ষণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলিশ মাছ সারা বছরই কম-বেশি প্রজনন করে থাকে তবে সবচেয়ে বেশি প্রজনন করে অক্টোবর মাসের (আশ্বিন/কার্তিক) বড় পূর্ণিমার সময়। এ সময় শতকরা প্রায় ৬০-৭০ ভাগ ইলিশ মাছই পরিপক্ক ও ডিম ছাড়ার উপযোগী অবস্থায় থাকে। আর এ সময়েই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (মোট ধৃত মাছের ৫০-৬০%) মাছ ধরা পড়ে। নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ ধরা ও জাটকা নিধনের ফলে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নতুন প্রজন্মের প্রবেশন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকায় কম বেশি প্রায় সারা বৎসরই জাটকা পাওয়া যায়। তবে জাটকা ধরার প্রধান মৌসুম জানুয়ারি হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত।

কোন কোন বৎসর জাটকা ধরার মৌসুম মে মাস পর্যন্তও বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশে মোট ধৃত জাটকার প্রায় ৩০-৪০% এপ্রিল মাসে এবং ১৫-২৫% মার্চ মাসে অর্থাৎ মোট ধৃত জাটকার ৪৫-৬৫% এ দুই মাসে ধরা পড়ে। অপর দিকে উপকূলীয় এলাকায় জাটকা মাছের প্রাধান্য নভেম্বর হতে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকে এবং জানুয়ারি মাসেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জাটকা ধরা পড়ে। ব্যাপক পরিমাণ জাটকা ধরার ফলে ইলিশ মাছের পূনঃসংযোগ বা প্রবেশন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এছাড়া, জাটকা ধরার জন্য ইলিশ মাছের Growth over-fishing হয়। ফলে ইলিশের বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট পূর্ব ইলিশ গবেষণার ফলাফল ও মৎস্য অধিদপ্তরের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে হিলশা ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা (Hilsa Fisheries Management Action Plan) প্রণয়ন করে উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করেছে। ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে ১৫ দিন প্রজননক্ষম ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরি করে, ইলিশ জোন গঠন করে গণসচেতনতা সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রেখেছে। গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, নৌ-র‍্যালী অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকার বুকলেট, লিফলেট, পোষ্টার, হ্যান্ডবিল প্রকাশ এবং গণ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও বিল বোর্ড স্থাপন কার্যক্রমও অব্যাহত রেখেছে। ফলশ্রুতিতে ইলিশ মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ইলিশ মাছের গড় আকার এবং ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে, ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশ মাছ সারা বছরই ধরা হয় ও অবতরণ করা হয়। সবচেয়ে বেশি ৬০-৭০% অবতরণ হয় সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)। এই মৌসুমে প্রায় ৬০-৭০% ইলিশ মাছ পরিপক্ক অবস্থায় পাওয়া যায়। বেশির ভাগ এলাকাতেই কমপক্ষে ৩০% ইলিশ মাছ সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় পাওয়া যায়। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর আওতায় প্রধান প্রধান নার্সারি ক্ষেত্রে জাটকা সংরক্ষণ ও মাছের জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য পাঁচটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে যথা : ১. চাঁদপুরের ষাটনল থেকে লক্ষীপুরের চর আলেকজান্ডার (১০০ কি.মি. নিম্ন মেঘনা অভয়াশ্রম) ২. ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা থেকে চর পিয়াল (মেঘনা নদীর অন্তর্ভূক্ত ৯০ কি.মি. শাহবাজপুর নদীর এলাকা) ৩. ভোলার ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালীর চর রুস্তম (তেতুলিয়া নদীর পার্শ্ববর্তী ১০০ কি.মি.) ৪. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কি.মি. ৫. শরীয়তপুর জেলার নিম্ন পদ্মার ২০ কি.মি.। গবেষণায় দেখা যায় যে, অধিক সংখ্যক প্রজনন পরিপক্ক ইলিশ নির্বিচারে ধরা হচ্ছে। তবে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বোচ্চ পরিমাণ পরিপক্ক ও ডিম নির্গত ইলিশ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ভরা পূর্ণিমায় (৩ দিন আগে ও ১১ দিন পরে) নির্বিচারে ধরা পড়ে যা পরবর্তীতে নতুন ইলিশ জনতা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে। এ সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর আওতায় নতুন আইনে ইলিশের প্রজনন সময়ে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে যা ২০০৭ সাল থেকে বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এর সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স বাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে ।

এমভি রূপালী ইলিশ গবেষণা জাহাজ ও স্পীডবোট সহযোগে চাঁদপুর নদীকেন্দ্রের ইলিশ গবেষণা দল কর্তৃক ইলিশের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র যেমন মনপুরা, হাতিয়া, ইলিশা, মৌলভীর চর, ঢলচর, কালির চর, ভোলা, বরিশালের হিজলা, কালিগঞ্জ পটুয়াখালির কলাপাড়া, বরগুনার পাথরঘাটা অঞ্চলে এক গবেষণা অনুসন্ধান চালানো হয়। প্রধান প্রধান প্রজনন অঞ্চলে ধৃত ইলিশ মাছের আকারের শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই গবেষণাটি প্রজনন মৌসুমে দুইবার করা হয়েছে। প্রথমবার সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমায় (পূর্ণিমাসহ ৩ দিন আগে ও ১১ দিন পরে) ও ২য় বার পরবর্তী ভরা পূর্ণিমায় (পূর্ণিমাসহ ৩ দিন আগে ও ১১ দিন পরে) করা হয়েছে। খালি চোখে পর্যবেক্ষণ ছাড়াও স্ট্রিপিং পদ্ধতিতে মিল্ট ও ডিমের প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্ত্রী-পুরুষ ইলিশ চিহ্নিতকরণ,

সারণী-১ : প্রধান প্রধান প্রজনন অঞ্চলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইলিশ মাছের প্রাচুর্য্যতার হার (%)

প্রজনন অঞ্চল	দৈর্ঘ্যের গ্রুপ (সে.মি.)								
	৩৫ সে.মি. এর নিচে				মোট (%)	৩৫ সে.মি. এর উপরে			মোট (%)
	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০	৩০-৩৫		৩৫-৪০	৪০-৪৫	৪৫-৫০	
১) চরভৈরবী (%)	০.০	২৭.২৭	২৭.২৭	৯.১	৬৩.৬৪	১৮.১৮	১৮.১৮	০.০	৩৬.৩৬
২) বরিশাল (%)	০.০	০.০	৫৬.৫২	৮.৬৯	৬৫.২১	১৭.৩৯	১৭.৩৯	০.০	৩৪.৭৮
৩) চর লুধুয়া (%)	০.০	১৬.৬৭	২৮.৮৯	২২.২২	৬৭.৭৮	২৮.৮৯	৩.৩৩	০.০	৩১.৭২
৪) রামগতি (%)	০.০	০.৭২	১০.১৪	১৮.৮৯	২৯.৭	৬০.৮৬	৯.৪	০.০	৭০.২৬
৫) হাতিয়া (%)	০.০	০.০	১.৭৫	১২.৫৪	১৪.২৯	৫৫.৮৮	২৪.৫৬	৫.২৬	**৮৫.৭০**
৬) মনপুরা (%)	০.০	০.০	০.০	৪.১৭	৪.১৭	৮৭.৫০	৮.৩৩	০.০	**৯৫.৮৩**
৭) পটুয়াখালী (%)	০.০	০.০	১৯.৪৭	৩৫.৩৯	৫৪.৮৭	৪০.৭১	৪.৪২	০.০	৪৫.১৩
৮) চাঁদপুর (%)	১.২৭	৮.০২	৪.২২	৮.৪৪	২১.৯৫	৪৫.৯৯	৩১.৬৫	০.৪২	৭৮.০৫

সারণী-২: বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইলিশ মাছের পরিপক্কতার হার

দৈর্ঘ্যের শ্রেণী	ইলিশ মাছের পরিপক্কতার ধাপ					
	ধাপ ১	ধাপ ২	ধাপ ৩	ধাপ ৪	ধাপ ৫	ধাপ ৬
১৮-২৪	০.০০	০.০০	৬০.০০	২০.০০	২০.০০	০.০০
২৫-৩১	০.০০	৭.৭৮	১৯.৮৫	৩৭.২১	২৯.২০	৫.৯৬
৩২-৩৮	০.০০	০.০০	৭.৩৮	৩১.৮৪	৩২.৬৮	২৮.১০
৩৯-৪৫	০.০০	৬.৯০	০.০০	২০.৭৫	৬৫.২৫	৭.১০
৪৬-৫২	০.০০	০.০০	০.০০	১৭.৬৫	৮২.৩৫	০.০০

পরিপক্কতা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্পেন্ট ইলিশ, ওজিং ইলিশ, গ্রাভিড ইলিশ চিহ্নিত করা হয়েছে (Rahman *et al.*, ২০১৩)। দুর্বল স্বাস্থ্য ,পাতলা পেট, পাতলা দেহ আকৃতি দেখে স্পেন্ট (প্রজননোত্তর) ইলিশ মাছ চিহ্নিত করা হয়। ডিম ছাড়ার পর যে স্পেন্ট (প্রজননোত্তর) ইলিশ ধরা পড়ে স্থানীয় ভাষায় তাকে 'পাইট' বলা হয়। ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ের পূর্বে, নিষিদ্ধ সময়ে এবং নিষিদ্ধ সময়ের পরে স্পেন্ট (প্রজননোত্তর) ইলিশের উপর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ দিয়েই প্রজনন সাফল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে প্রচুর পরিমাণে অপরিপক্ক ইলিশ ও ডিম ছাড়ারত ইলিশ মাছের অবস্থা দেখে প্রজননক্ষেত্র গুলো ঠিক করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, মেঘনার উপরের অংশের ইলিশের তুলনায় মেঘনার নিম্নাঞ্চলের ইলিশের আকার বেশ বড় (সারণী-১)। অপরদিকে মেঘনার উপরের অংশের অধিকাংশ ইলিশের আকার ৩৫ সে.মি. এর নীচে এবং নিম্নাঞ্চলের প্রায় ৯৫% ইলিশের আকার ৩৫ সে.মি. এর নীচে।

পরিপক্ক/ওজিং ইলিশের শতকরা হার
(The percent composition of oozing/berried hilsa)

মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে প্রজনন ক্ষেত্রে (প্রজনন ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায়) সর্বোচ্চ পরিপক্ক পর্যায়ের (পরিপক্ক পর্যায় IV, V এবং VI) ইলিশ মাছ দেখা গেছে যা দৈর্ঘ্যেও সর্বোচ্চ (সারণী-২)। একইভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে অন্যান্য মৎস্য প্রজাতির পোনা ও লার্ভি প্রজনন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যা প্রকারান্তরে অন্য প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধিতে ইতিবাচক সাফল্য বয়ে আনে।

চিত্র : প্রজননোত্তর ইলিশ

স্পেন্ট/ প্রজনণোত্তর ইলিশের শতকরা হার এবং প্রজনন সাফল্য
(Percent composition of spent hilsa and spawning success)

প্রজনন ক্ষেত্রে ধৃত মাছের বিন্যাসে দেখা যায় যে, প্রায় ৯০% ধৃত ইলিশের ওজন ৯০০ গ্রামের কাছাকাছি এবং অধিকাংশই ডিম ছাড়ার উপযোগী। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রেসমূহে, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রায় ৩৩.৬৯%, ৩৬.২৭%, ৩৫.৭৯%, ৪১.০২%, ৩৮.৮৯% ও ৩৬.৬০% স্পেন্ট ইলিশ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে (চিত্র-৩) এবং জিইএফ, বিএফআরআই এর তথ্যের সঙ্গে তুলনায় দেখা গেছে বর্তমানে স্পেন্ট ইলিশের হার অতীতের চেয়ে বেশি।

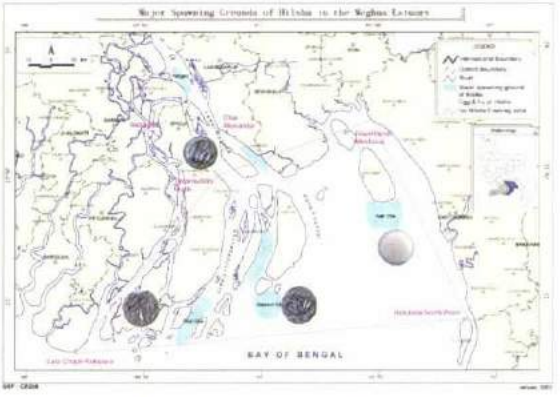

চিত্র : ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র

মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে ডিম/ পোনা উপাদন
(Egg/fry production during fishing ban)

বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, পূর্বে ১১ দিন ও পরবর্তীতে ১৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ রাখার কারণে ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রায় ৩,৩৬,১৯৯ কেজি, ৩,৮৫,৫০০ কেজি, ৩,৮০,৪০০ কেজি, ৪,৪৭,১০০

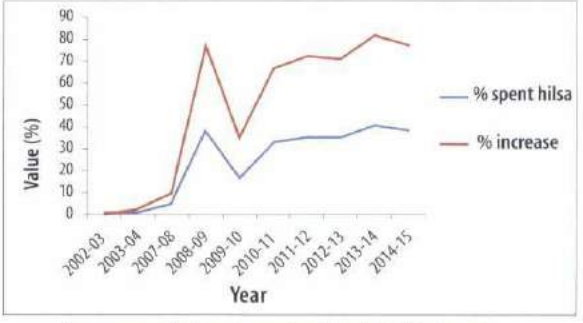

চিত্র : বৎসর ভিত্তিক প্রজননোত্তর/ স্পেন্ট ইলিশের হার

কেজি, ৪,১৭,৭৬৫ কেজি এবং ৪,৯৪,৩৬৫ কেজি ডিম উপাদন হয়েছে (সারণী-৩)। আহরণরহিত ইলিশ হতে ৪,৯৪,৩৬৫ কেজি ডিম প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৫০% হিসাবে প্রায় ৩,০৮,৯৭৮ কোটি রেণু উৎপাদিত হয়েছে এবং উক্ত রেণুর বাঁচার হার ১০% হিসাবে প্রায় ৩০,৮৯৭ কোটি রেণু পোনা/জাটকা চলতি বৎসর ইলিশ জনতায় নতুনভাবে সংযুক্ত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে (সারণী ৩)। যেখানে Rahman *et al.* ২০১৩ লক্ষ্য করেছেন যে, ২০০৭ সালের প্রজনন সময়ে ১০ দিন মাছ ধরা বন্ধ রাখার কারণে ৪৬,৮০০ কেজি ডিম উপাদন হয়েছে।

সারণী-৩ ঃ বর্ধিত ডিম ও জাটকা উৎপাদনের পরিমাণ

বছর	ডিম উৎপাদন (কেজি)	৫০% হ্যাচিং রেটে রেণু উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১০% বাঁচার হারে জাটকা উৎপাদনের সংখ্যা (কোটি)
২০০৭	৪৬,৮০০	২৯,৩০০	২,৯৩০
২০০৮	৩,৯২,৬২০	২,৪৫,৩৮৫	২৪,৫৩৮
২০০৯	১,৭০,৪২০	৮৫,২১০	৮,৫২১
২০১০	৩,৩৬,১৯৯	২,১০,১২৪	২১,০১২
২০১১	৩,৮৫,৫০০	২,৪০,৯৩৭	২৪,০৯৪
২০১২	৩,৮০,৪০০	২,৩৭,৭৫০	২৩,৭৭৫
২০১৩	৪,৪৭,১০০	২,৭৯,৪৩৭	২৭,৯৪৩
২০১৪	৪,১৭,৭৬৫	২,৬১,১০৩	২৬,১১০
২০১৫	৪,৯৪,৩৬৫	৩,০৮,৯৭৮	৩০,৮৯৭

সুতরাং বর্তমান সমীক্ষায় ধারাবাহিক বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। প্রজনন ক্ষেত্রে ১৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ পরিপক্ক ইলিশ পাওয়া গিয়েছে যা বিগত বছরগুলোর মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ের চেয়ে বেশি (সারণী-৪)

সারণী-৪ ঃ প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে ধৃত ইলিশের পোনা ও জাটকার আকার, ওজন ও বয়স

প্রজনন এলাকা	সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	গড় দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	সর্বনিম্ন ওজন (গ্রাম)	সর্বোচ্চ ওজন (গ্রাম)	গড় ওজন (গ্রাম)	জাটকার সংখ্যা/প্রতি ১০০ মি. জাল/ঘন্টা	আনুমানিক বয়স (দিন)
রামনেওয়াজ	১.৫৭	২.৫৫	১.৮৫	০.০১	০.১৪	০.০৭	২২	১০-১৫
সাকুচিয়া	০.৯৫	৩.৪০	২.১২	০.০৪	০.৪৬	০.১৩	৩২	৫-১০
জনতা বাজার (জোয়ার)	১.৮৫	৩.৬০	২.৭০	০.০৭	০.৫৫	০.২২	৪৭	১৫-২৫
জনতা বাজার (ভাটা)	১.৮০	৩.৫০	২.৬৫	০.০৫	০.৫৪	০.১৯	৩১	১৫-২০
হাজিরহাট (জোয়ার)	১.৬৭	৩.৮০	২.৬২	০.০৪	০.৫৭	০.১৫	৫৮	১৫-২০
হাজিরহাট (ভাটা)	১.৬৫	৩.৬০	২.৬০	০.০৪	০.৪৫	০.১৬	৫৫	১৫-২০
ঢলচর	২.২০	২.৯	২.৬০	০.১৩	০.৩০	০.১৫	৪৬	২০-২৫
নয়ারহাট	১.৭	৪.২	৩	০.২০	০.৬৬	০.২৮	৬০	১৫-২০
হরিণা	১.৫	২.৮	২.১	০.০৫	০.৫০	০.২০	২৪	১৫-২০
ধুলখোলা	১.৬৬	৩.৬	২.৮	০.০৬	০.৫৫	০.১৮	৩৮	১৫-২০

সারণী-৫ ঃ ইলিশের প্রজনন সাফল্যের তুলনামূলক হার

বৎসর	প্রজনণোত্তর মাছের হার (%)	বৃদ্ধির পরিমাণ (%)	ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২০০২	০.৫০	-	পূর্বে প্রচলিত
২০০৩	১.৪০	২.৮	জাটকা রক্ষা অভিযান
২০০৭	৫.৪০	১০.৮	জাটকা রক্ষা +১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০০৮	৩৮.৭২	৭৭.৪৪	জাটকা রক্ষা +১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০০৯	১৭.৬২	৩৫.২৪	জাটকা রক্ষা +১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১০	৩৩.৬৯	৬৭.৩৮	জাটকা রক্ষা +১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১১	৩৬.২৭	৭২.৫৪	জাটকা রক্ষা +১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১২	৩৫.৭৯	৭১.৫৮	জাটকা রক্ষা +১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১৩	৪১.০২	৮২.০৪	জাটকা রক্ষা +১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১৪	৩৮.৮৯	৭৭.৭৮	জাটকা রক্ষা +১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১৫	৩৬.৬০	৭৩.২০	জাটকা রক্ষা +১৫ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম

Haldar (২০০৪) দেখেছেন যে, মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন পূর্ণ সময় জাটকার প্রাচুর্যতার উপর ইতিবাচক শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। অনুরূপভাবে, Rahman *et al.* ২০১৩ দেখেছেন যে, ১০ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ের কারণে জাটকার প্রাচুর্যতা ৫৭০% বেড়েছে।

বর্তমান গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, জাটকা এর সংখ্যা (৫০% হ্যাচিং) ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে যথাক্রমে ২১০১২, ২৪০৯৩, ২৩৭৭৫, ২৭৯৪৩, ২৬১১০, এবং ৩০৮৯৭ কোটি ছিল (সারণী-৩)। মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে অধিকাংশ জেলে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকে। প্রজনন ক্ষেত্রে জাটকা পোনা ও অন্যান্য মাছের পোনার প্রাচুর্যতা এ সময় লক্ষনীয়। ইলিশ সংরক্ষণের জন্য পূর্বে অভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (জাটকার অভয়াশ্রম) বলবৎ ছিল কিন্তু বর্তমানে অভয়াশ্রম ও প্রধান প্রজনন এলাকায় ১৫ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় জাটকার প্রাচুর্য্যতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকার প্রাচুর্য্যতার সাথে ইলিশের প্রাচুর্য্যতা সরাসরি নির্ভরশীল। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ১৫ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশ মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার (Conclusions)

ইলিশের টেকসই উৎপাদন তথা সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত সময়ের উদ্যোগ ও সুপারিশমালার ভিত্তিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে, জাটকা সংরক্ষণে প্রধান প্রধান বিচরণক্ষেত্র, প্রজনন ক্ষেত্রে ৫টি মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও মাছের প্রজনন ও লালন-পালনের জন্য ১৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ যা খুবই কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত। মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণে ইলিশ মাছের প্রজননে ব্যাপক সফলতা পাওয়া যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ১৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণের ফলে অন্যান্য মাছের প্রজনন সফলতা নিরূপণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণের এই পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় জাটকা বৃদ্ধি তথা সামগ্রিকভাবে ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

(লেখক ঃ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
নদী কেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর)

চরম সংকটাপন্ন মহাশোল ঃ বর্তমান অবস্থা ও সংরক্ষণে করণীয়

Critically Endangered Mohashol : Present Status and Conservation Strategy

মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির[১], ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার[২] ও ড. মোঃ ফজলুল আউয়াল মোল্লাহ্[৩]

Abstract

Mohashol, one of the most beautiful endemic fish of Bangladesh is globally acclaimed sport and table fish. In the past two mohashol species *Tor tor* and *Tor putitora* were reported to be available in some rivers of different parts of Bangladesh, but at present it is very rarely found only in the Someshwari river. Illegal fishing, soil erosion and siltation, construction of flood control and drainage structures, excessive human intervention on this river for livelihood as well as climate change are the main causes to degrade the habitat of mohashol. Moreover, unscientific coal mining in Meghalaya has further aggravated the problem. Consequently, mohashol has been ranked as critically endangered in red list of IUCN in Bangladesh. Although few attempts have been made for conserving mohashol, it did not get due attention. So, it is prime time to put our heads together to conserve the aristocratic, iconic mohashol.

মহাশোল আমাদের দেশীয় প্রজাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম সুন্দর মাছ হিসেবে খ্যাত যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মাহশির নামে পরিচিত। বড় আঁইশযুক্ত মহাশোল খরস্রোতা নদীর উজানের পরিষ্কার, স্রোতশীল পানিতে থাকে এবং পাথরযুক্ত তলদেশ পছন্দ করে।

চিত্র: সোমেশ্বরী নদী থেকে সংগৃহীত মহাশোল

বিশ্বব্যাপী মৎস্য শিকারীদের কাছে game fish হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিনোদনসঙ্গী এই মহাশোল। কোন নেতিবাচক প্রতিযোগিতা ছাড়াই একে মৃগেল ও কার্পিও মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়। অদ্বিতীয় স্বাদের কারণে খাবার মাছ হিসেবে মহাশোলের চাহিদা ঈর্ষণীয়। আকর্ষণীয় বর্ণময়তার কারণে বিশ্ববাজারে অ্যাকোরিয়াম ফিস হিসেবেও এর কদরের কমতি নেই। বাংলাদেশে আকারভেদে প্রতি কেজি মহাশোল ২০০০.০০ হতে ৩০০০.০০ টাকায় বিক্রি হয় যা অন্যান্য কার্পজাতীয় মাছের বাজার মূল্যের তুলনায় ৬-৮ গুণ বেশি। যাই হোক স্বাদুপানি বা নদীর রাজা বা বাঘ হিসেবে খ্যাত এ মহাশোল বাংলাদেশে চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় IUCN এর রেড লিস্ট-এ অন্তর্ভুক্ত যা সংরক্ষণে যথাযথ নজর না দিলে সহসাই বিলুপ্ত প্রজাতির কাতারে ঠাঁই করে নেবে।

ভৌগোলিক বিস্তৃতি

(Geographical distribution)

ভৌগোলিক ব্যাপ্তি বিবেচনায় মহাশোলের প্রাপ্তিস্থানের তালিকা বেশ দীর্ঘ। এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ যেমন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাভা, লাওস, আফগানিস্তান ও চীনে পাওয়া যায়। অতীতে বাংলাদেশে সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, দিনাজপুর জেলার পাহাড়ি নদীগুলোতে এবং কাপ্তাই লেকে মহাশোল পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে নেত্রকোণা জেলার সোমেশ্বরী নদীতেই কেবল কালেভদ্রে এর দেখা মেলে।

চিত্র: মানচিত্রে মহাশোলের আবাসস্থল সোমেশ্বরী নদী

সোমেশ্বরী নদী

(The Someshwari river)

মহাশোলের আবাসস্থল সোমেশ্বরী নদী পানি প্রবাহ ও মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্যের দিক থেকে এর সোনালি অতীত হারাতে বসেছে। উৎপত্তিস্থলে সিমসাং নামে পরিচিত সোমেশ্বরী ভারতের মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের দীর্ঘতম নদী ও গারোদের সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি। সোমেশ্বরী নদী মেঘালয়ের নকরেক শৃঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়ে তুরা ও আরবেলা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রথমে পূর্বদিকে ৭৫ কিমি প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশে প্রবেশের পর নেত্রকোণা জেলার সুসং দুর্গাপুর ও অন্যান্য এলাকায় প্রবাহিত হয়ে এটি জারিয়া-ঝানজাইল এলাকায় কংশ নদীর সাথে মিশেছে। নদীটির একটি শাখা কলমাকান্দায় বালিয়া নদীর সাথে মিশেছে। অন্য একটি শাখা সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সুরমা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে দুর্গাপুর উপজেলার উত্তরদিকে ছোট একটি প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে যা স্থানীয়ভাবে আত্রাখালী নামে পরিচিত। বর্ষাকাল ব্যতীত আত্রাখালী ও সোমেশ্বরীর মূল প্রবাহে পানি থাকে না বললেই চলে।

চিত্র: শুষ্কমৌসুমী সোমেশ্বরী নদী (কংশ নদীগামী প্রবাহ)

মহাশোল মাছের বর্তমান অবস্থা
(Present status of Mohashol)

অতীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জলাশয়ে মহাশোলের প্রাচুর্য থাকলেও বর্তমানে সোমেশ্বরী নদীই এর একমাত্র প্রাপ্তিস্থান। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মহাশোলের প্রজাতি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। দুর্গাপুর উপজেলার মৎস্যজীবীদের মতে সোমেশ্বরীতে কম বেশি ৬-৭ প্রজাতির মহাশোল পাওয়া যায়, যদিও বাংলাদেশে *T. tor* ও *T. putitora* প্রজাতির প্রাপ্যতা সর্বমহলে স্বীকৃত। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট মহামূল্যবান মাছটি মাশোল নামেই সমধিক পরিচিত এবং আভিজাত্যের প্রতীক। তাদের ভাষায় একটি মহাশোল মাছ দিয়ে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করা যায়। তদুপরি দেশে উপঢৌকন হিসেবে মহাশোল এখনও সমাদৃত। বর্ষাকালে সোমেশ্বরীতে পাহাড়ি ঢল নামলে স্থানীয় মৎস্যজীবীগণ নদী ও এর পার্শ্ববর্তী প্লাবনভূমিতে বিভিন্ন জালের মাধ্যমে মহাশোল মাছ ধরেন এবং পরবর্তীতে উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের আশায় নিজস্ব পুকুরে সনাতন পদ্ধতিতে লালন করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো ধৃত মাছের বেশিরভাগই ১০০-২৫০ গ্রাম ওজনের, যদিও কখনও কখনও কয়েক কেজি ওজনের মহাশোলও ধরা পড়ে। তবে সারা বছর যে কারো পক্ষে মহাশোল সংগ্রহ করা একেবারে সহজ নয়, কেননা এক্ষেত্রে বেচাকেনার নিয়ন্ত্রণ গুটি কয়েক মৎস্যজীবী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে মহাশোলের প্রাপ্যতা সময়ের সাথে ক্রমহ্রাসমান। উপরন্তু চরম সংকটাপন্ন এই মাছ ও এর আবাসস্থল সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতা এবং সংরক্ষণে মৎস্য সংশ্লিষ্ট গবেষক, পরিবেশবিদ, গবেষণা সংস্থা সর্বোপরি সরকারের যথাযথ মনোযোগ আকৃষ্ট না হওয়ায় মাছটি চরম সংকটাপন্ন ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে। সোমেশ্বরীর তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের প্রদত্ত তথ্য মতে ২০১৪ সালে মূল প্রবাহে কোন মহাশোল ধরা পড়েনি। যাই হোক মহাশোল মাছের বর্তমান এই দুরবস্থার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো কমবেশি দায়ী:

- সোমেশ্বরী নদীর ভাটির অংশে পলি জমে ভরাট হওয়ায় এবং দীর্ঘ দিন ড্রেজিং না হওয়ায় পানি প্রবাহ কমে গেছে। ফলশ্রুতিতে মাছের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। নদী থেকে বিপুল পরিমাণ কয়লা ও বালি উত্তোলন আবাসস্থল ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করছে। বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে সর্বনাশা রূপ ধারণ করলেও শুষ্ক মৌসুমে সোমেশ্বরী নদীর গাঁওকান্দিয়া থেকে কংশ পর্যন্ত এবং রানীখং থেকে উজানের অংশ ব্যতীত অন্য অংশে পানি থাকেনা বললেই চলে। তদুপরি উল্লেখিত দ্বিতীয় অংশে অবাধ যাতায়াতে বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞার কারণে সোমেশ্বরীর বাংলাদেশ অংশে সারাবছর মহাশোল পাওয়া যায় কিনা তা এখনও অজানাই রয়ে গেছে। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটুকু বলা যায় বর্ষা মৌসুম ব্যতীত সোমেশ্বরীর বাংলাদেশ অংশে মহাশোল পাওয়া যায় না।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্যান্য জলাশয়ের মত সোমেশ্বরীতেও বিদ্যমান মৎস্যসম্পদসহ অন্যান্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় জনগণ সারাবছর সোমেশ্বরী থেকে অবাধে বালি, কয়লা ও মাছ আহরণ করে থাকে। উপরন্তু বর্ষা মৌসুমে জেলেরা নদীতে স্থানীয়ভাবে খরা জাল নামে পরিচিত এক ধরনের জাল (স্থায়ী স্থাপনা) দ্বারা মাছ ধরে, যা আইনত নিষিদ্ধ।
- সব কিছুর সাথে আবার মরার উপর খারার ঘা হিসেবে কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সর্বজনবিদিত।
- সোমেশ্বরী বাংলাদেশের অন্যতম ট্রান্সবাউন্ডারি নদী যা বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তের মেঘালয়-নেত্রকোণা পয়েন্টে অবস্থিত। তাই সোমেশ্বরী নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশের পরিবর্তন এবং মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে উভয় অংশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ সমহারে দায়ী। গবেষণায় প্রমাণিত, বিগত কয়েক দশক ধরে অতিমাত্রায় বন ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের অতিআহরণ এবং অন্যান্য মানবসৃষ্ট কারণে উদ্ভূত পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে সোমেশ্বরীর ভারতীয় অংশের ইকোলজি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। তদুপরি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মেঘালয় রাজ্যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন বিপর্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং এ কারণে

সোমেশ্বরীর ভারতীয় অংশের ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা (বাঘমারা- উইলিয়ামনগর) এসিড মাইন ড্রেনেজ (AMD) দ্বারা আক্রান্ত যার কারণে খনি এলাকার পানি দূষণের পাশাপাশি মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্যও ধ্বংস হচ্ছে। সিমসাং নদীর তীরবর্তী জেলেদের মতে এক সময় ১০-২৫ কেজি ওজনের মহাশোল ও নান্দিল (electric eel) মাছ নিয়মিতই ধরা পড়ত, কিন্তু বর্তমানে আকার হ্রাসের সাথে সাথে প্রতি ফিসিংএ মাছের সংখ্যাও কমে গেছে। তাছাড়া সিমসাং নদীতে ভেষজ বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মাছ শিকারও বাংলাদেশে মহাশোলের প্রাপ্যতা হ্রাসের অন্যতম একটি কারণ। যেহেতু সোমেশ্বরী বাংলাদেশ ও ভারতের একটি ট্রান্সবাউন্ডারি নদী যা এসিড মাইন ড্রেনেজ আক্রান্ত বাঘমারা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, সেহেতু উজানে আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংসের কারণে বাংলাদেশেও মহাশোলের প্রাপ্যতা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে; এটা বলা অত্যুক্তি হবে না।

সংরক্ষণে গৃহীত উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ করণীয়
(Conservation attempts and future strategy)

স্বাদুপানির মাছে সমৃদ্ধ পৃথিবীর অনেক দেশই তাদের এই মহামূল্যবান প্রাকৃতিক রত্নভান্ডার সংরক্ষণে খুব কম সময় ও শ্রম ব্যয় করেছে। বাংলাদেশ এ কাতারে না পড়লেও সংরক্ষণের উদ্যোগ আরও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তর দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আর গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বিশেষ করে অভয়াশ্রম স্থাপন বা ঘোষণার কারণে বেশ কিছু দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কয়েকটি প্রজাতির প্রাপ্যতাও বেড়েছে। কিন্তু এদেশের অভিজাত ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ মহাশোল মাছ, *T. tor* সংরক্ষণের উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ নেই বললেই চলে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) কর্তৃক *T. putitora* প্রজাতির প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতির উদ্ভাবন এটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা করবে। কিন্তু পোনার সহজ প্রাপ্যতা না থাকায় এবং বৃদ্ধির হার খুব কম হওয়ায় এর চাষ সম্প্রসারণ ভবিষ্যৎ গবেষণা নির্ভর। মহাশোলের প্রজাতিসমূহের মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, দৃষ্টিনন্দন, সোনালী-লাল (golden-reddish) বর্ণের আমাদের একান্ত দেশীয় *T. tor* বিজ্ঞানী, গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সর্বোপরি সরকারের মনোযোগের বাইরেই রয়েছে আজ অবধি। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত BARC-SPGR প্রকল্পই সর্বপ্রথম যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গবেষকবৃন্দ সংরক্ষণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চওড়া দেহের সুস্বাদু এই মাছটিকে বদ্ধ জলাশয়ে অভ্যস্ত করানো এবং প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রচেষ্টা চালান। প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা না পেলেও প্রকল্পটির মাধ্যমে *T. tor*-কে সফলতার সাথে বাণিজ্যিক খাবার প্রয়োগের মাধমে পুকুরে অভ্যস্ত করানো সম্ভব হয়েছে যা মাছটির ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে এক ধাপ এগিয়ে নেবে নিঃসন্দেহে। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC), বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ মহাশোলসহ আরো দুটি চরম সংকটাপন্ন প্রজাতি রিটা ও ভাঙ্গন মাছ সংরক্ষণের নিমিত্ত HEQEP শিরোনামে আরো একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে মাছগুলোর প্রণোদিত প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের পাশাপাশি স্পার্ম ক্রায়োপ্রিজারভেশনের চেষ্টা চলছে।

চিত্র: শুষ্ক মৌসুমী সোমেশ্বরী নদী (কংশ নদীগামী প্রবাহ)

চিত্র: প্রজননক্ষম মহাশোল মাছ

উল্লেখিত গৃহীত পদক্ষেপগুলো কেবল এ ধরনের আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রজাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য বয়ে আনবে এমনটি নিশ্চিত করে বলার অবকাশ নেই। কাজেই সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপন্থাই বাংলাদেশে মহাশোলকে তার আভিজাত্য নিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারে।

- যেহেতু মহাশোলের আবাসস্থল উন্নয়ন বেশ সময় সাপেক্ষ, তাই বিদ্যমান স্টককে প্রজননের আওতায় আনা। তবে এক্ষেত্রে মাছটির প্রণোদিত প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন আবশ্যিক পূর্বশর্ত।
- মহাশোলের আবাসস্থল সোমেশ্বরী নদী থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ (বালি, কয়লা) আহরণ সীমিত রাখার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- মহাশোল সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি একে সামাজিক আন্দোলনে রূপদান।

চিত্র: পুকুরে চাষকৃত মহাশোল মাছ

- সোমেশ্বরী নদীর উপযোগী অংশ নির্ধারণপূর্বক মহাশোল অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা।
- মহাশোল মাছের জীবনবৃত্তান্ত ও মজুদ সম্পর্কে বিদ্যমান জ্ঞানের ঘাটতি মেটাতে সোমেশ্বরী নদী ও এর মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্যের বিষয়ে গবেষণা জোরদার করা।
  মহাশোল সংরক্ষণ পরিকল্পনাকে নেত্রকোণা জেলায় গৃহীতব্য যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এ মহাশোল সহ অন্যান্য চরম সংকটাপন্ন মাছ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ধারা সংযোজন-পূর্বক বিস্তারিত বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে অথবা বিদ্যমান আইনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে আইনটি প্রণীত হলে তা অধিক কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহকে তাদের সামাজিক দায়বোধের জায়গা থেকে মহাশোল সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ জরুরি। এক্ষেত্রে ভারতে মহাশোল সংরক্ষণে টাটা পাওয়ার কোম্পানির ভূমিকা বেশ উৎসাহ জাগানিয়া।
- যেহেতু মহাশোল কৃত্রিম খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত সেহেতু এই সুযোগকে মাথায় রেখে বিভিন্ন পর্যটন এলাকা,

চিত্র: পুকুরে চাষকৃত মহাশোল মাছ

ধর্মীয় স্থাপনা (মসজিদ, মন্দির), বিভিন্ন মাজার (হযরত শাহজালাল (র.), প্রাতিষ্ঠানিক পুকুরে মহাশোল মজুদ করা যেতে পারে যা নিঃসন্দেহে মহাশোল ভিত্তিক ইকোট্যুরিজমের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

- মহাশোল সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনার ধারণা চালু করা।
- বিদ্যমান তথ্যভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে মহাশোলের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- মহাশোলের বর্তমান জিনপুল উদ্‌ঘাটন ও বর্তমান মজুদ নির্ধারণ ব্যতীত সোমেশ্বরী অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক জলাশয়ে মহাশোল অবমুক্ত করা বন্ধ রাখতে হবে। তদুপরি মহাশোলের প্রজাতিসমূহের মধ্যে কৌলিতাত্ত্বিক পার্থক্য নিরূপণে মলিকুলার জেনেটিক পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র: পুকুরে চাষকৃত মহাশোল মাছ

- সোমেশ্বরী ব্যতীত অতীতে যেসকল নদীতে মহাশোলের প্রাচুর্য ছিল সে সকল নদীর বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে মাছটির প্রাপ্যতা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সময়ের দাবী বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ার মহাশোল অধ্যুষিত দেশ বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও মায়ানমার সরকারের মধ্যে বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সমন্বিত সংরক্ষণ প্রকল্প প্রণয়ন।

উপসংহার (Conclusion)

মহাশোল সংরক্ষণের এখনই উপযুক্ত সময় এবং এই দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আবাসস্থল উন্নয়ন, মহাশোলের বর্তমান মজুদ নির্ধারনপূর্বক স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা, সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনা, সোমেশ্বরী নদীর জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন; সর্বোপরি এই নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ এবং মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমেই স্বাদুপানির এই মহামূল্যবান মাছটির সংরক্ষণ সম্ভব।

[১]উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর ও পিএইচডি ফেলো, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
[২]প্রফেসর, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
[৩]প্রফেসর, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

নারীর ক্ষমতায়নে মৎস্যচাষ

Women Empowerment through Aquaculture

আয়েশা সিদ্দিকা[১] ও ড. মোহাঃ সাইনার আলম[২]

Abstract

Traditionally, the role of women is mostly confined to the homestead due to cultural, religious and social restrictions. The empowerment of women should be the key approach to upgrade their status. Women's empowerment depends on three factors including economic, social and political dimensions. The empowerment status of women in Bangladesh can be meaningfully improved through their active participation in income generating activities. The women friendly key activities are agriculture, homestead gardening, aquaculture, livestock, social and homestead forestation, handicrafts making etc. Income generation can play an important role in improving the status and position of women. Their involvement in aquaculture as an income generating activity provides three basic developments: economic, nutritional and social benefits, which are considered as the basic and strategic elements of women empowerment.

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানবসম্পদের উন্নয়নের আবশ্যকতা রয়েছে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত না করে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন ও অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। দেশের জাতীয় অর্থনীতির অর্থবহ উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ আবশ্যক। আর তাই প্রয়োজন নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন-নারীর ক্ষমতায়ন। আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে পরিবারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। পরিবারে পুরুষরা অর্থ উপার্জন করে, যে কারণে পরিবারের কর্তৃত্ব থাকে পুরুষের হাতে। পারিবারিক ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা ভূমিকা রাখতে পারে না। সম্পদ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে নেই তাদের অধিকার। মহিলাদের গৃহস্থালী শ্রমকে গুরুত্বহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারীর চলাচলের ওপর আরোপ করা হয় নানাবিধ বিধি-নিষেধ। শুধুমাত্র পুরুষের আধিপত্য নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের প্রচলিত পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক কুসংস্কার ও সর্বোপরি তাদের সচেতনতার অভাব নারীর জীবনমান উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদেরকে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। আয়মূলক ও নারীবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- কৃষিকাজ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, মাছচাষ, পশুপালন, বনায়ন ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন, নারীর সুপ্তশক্তির বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় উন্নয়নে নারীর সর্বাত্মক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধান দিক।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
(Women empowerment and Bangladesh perspective)

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি কৌশলকে প্রাধান্য দেয়া হয়; সমন্বিত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সমন্বিত উন্নয়ন হলো নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করা এবং পুরুষের তুলনায় সম্পত্তি, অধিকার, পছন্দ, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারহীনতাসহ যে বিষয়গুলো নারীর অধঃস্তনতা সৃষ্টি করে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা। নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন, সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, পারিবারিক ও উৎপাদনমূলক সিদ্ধান্তসমূহে অংশগ্রহণের সক্ষমতা ইত্যাদি। শিক্ষা, উৎপাদনশীল ও আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব।

স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের নীতি ছিল জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দক্ষতার ভিত্তিতে নারী ক্ষমতায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) সরকারের উল্লেখযোগ্য নীতি ও কৌশল হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান বাধা দূর করা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী দেশের ৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ বা প্রায় ৩০ শতাংশ নারী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৯৭ জন। বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে মাত্র এক শতাংশ (৮২ হাজার ৫৫৮ জন) নারী। তবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র গার্মেন্টস খাতের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী। দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারকারীও নারী।

নারীর ক্ষমতায়নের মাপকাঠি
(Measures of women empowerment)

নারী উন্নয়নের মডেল অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রথমত, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নারীর মালিকানা স্থাপন; দ্বিতীয়ত, মানসম্মত কাজের পরিবেশ এবং মজুরি; তৃতীয়ত, ন্যায় বিচার বা ন্যায্যতা; এবং চতুর্থত, সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান মাপকাঠিসমূহ হলো:

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ;
- সম্পদ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে নারীর অধিকার;
- নারীর আয়;
- নারীর নেতৃত্বদানের সক্ষমতা;
- সময়ের ব্যবহার; এবং
- নারীর চলাচলের স্বাধীনতা।

নারীর ক্ষমতায়নের উপায়
(Way to women empowerment)

বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে সীমাহীন বৈষম্য ও বঞ্চনার মধ্যে রেখে দারিদ্র্যমুক্ত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণ অসম্ভব। নিম্নবর্ণিত উপায়ে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব:

- দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠিকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
- পরিবারে ও সমাজে নারীর প্রয়োজন মাফিক সমতা নিশ্চিতকরণ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়ন;
- পারিবারিক পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন;
- সামাজিক কৌশলগত অবস্থার উন্নয়ন; এবং
- নারীর প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা কমানো।

সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান ও সাফল্যমণ্ডিত। আয়বর্ধনমূলক ও নারীবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: কৃষিকাজ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, মাছচাষ, পশুপালন, বনায়ন ইত্যাদি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে প্রায় ১৪ লক্ষ নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত। এসবের মাধ্যমে মাছচাষ অন্যতম।

মাছচাষে নারীর অবস্থান
(Position of women in aquaculture)

বর্তমানে মাছচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীরা তাদের কর্মসংস্থান, অর্থ উপার্জন ও পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য মাছচাষে আগ্রহী হচ্ছে। বসতবাড়ি সংলগ্ন পুকুর-দিঘি বা কাছাকাছি জলাশয়ে মাছচাষে মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায়। সকাল থেকে

রাত পর্যন্ত মহিলারা নানাবিধ গৃহস্থালী কাজ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রতিদিনের গৃহস্থালী কাজের অংশ হিসেবে তারা বসতবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে মাছচাষ করছে, কিন্তু তাদের কাজকে আয়মূলক কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় না। যদিও ইদানিং মাছচাষের প্রতিটি পর্যায়ে মহিলারা অংশগ্রহণ করছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুকুরে সার দেয়া ও মাছের খাবার দেয়ার মাঝেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে।

মাছচাষে নারী উন্নয়নের সম্ভাবনা
(Potentials of women development in aquaculture)

মাছচাষ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নারী উন্নয়নের একটি অন্যতম ক্ষেত্র হতে পারে। সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় মাছচাষে নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুকুর-দিঘির মাছচাষ ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

মাছচাষে নারীর সীমাবদ্ধতা
(Limitation of women in aquaculture)

বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাধা-নিষেধের কারণে এখনো মহিলারা মাছচাষে অংশগ্রহণ ও দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে পারছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের সাথে বা পাশাপাশি এককভাবে মাছচাষ করলেও তা মূল্যায়িত হয় না। মহিলারা মাছচাষে অংশগ্রহণে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, তা হলো:

- নারীর প্রতি পুরুষের অসম দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব;
- জমি বা সম্পদের মালিকানার অভাব;
- গৃহস্থালী কাজের অতিরিক্ত চাপ;
- নারীবান্ধব প্রশিক্ষণের অভাব;
- পর্যাপ্ত মাছচাষ সম্পর্কিত তথ্যের অভাব;
- নারীবান্ধব লাগসই প্রযুক্তির অভাব;
- পর্যাপ্ত ঋণের অভাব; এবং
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মাঝে সমন্বয়ের অভাব।

মাছচাষে নারীর ক্ষমতায়ন
(Women empowerment in aquaculture)

পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন ও নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে নারীকে মাছচাষে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব।

মাছচাষের মাধ্যমে নারীরা পরিবারের আর্থিক ও পুষ্টি যোগান ব্যবস্থা স্থায়ী করতে পারে। মাছচাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে, নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে পুকুর পরিষ্কার, পুকুর প্রস্তুত, চুন-সার দেয়া, পোনা নির্বাচন করতে পারে। পরিবারের চাহিদা বিবেচনা করে পুকুর হতে মাছের আংশিক আহরণের সিদ্ধান্ত দিতে পারে। মাছচাষের জন্য ক্ষুদ্রঋণ নিতে পারে, মাছ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে নারীরা আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হয়, তারা পারিবারিক ও উৎপাদনমূলক কাজ যেমন- মাছচাষ, কৃষি, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এতে পারিবারিক সঞ্চয় বাড়ে। স্বভাবজাত কারণেই নারী তার উপার্জিত ও সঞ্চিত অর্থ সন্তানদের লেখাপড়া, ঘরবাড়ির উন্নয়ন, চিকিৎসা, সম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যয় করে। তার সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন সাধন হয়। পুরুষের তুলনায় নারী

মাছচাষে সম্পৃক্ত থাকলে পরিবারের মাছ খাওয়ার পরিমাণ বাড়ে বলে গবেষণায় ওঠে এসেছে। একজন নারী যখন মাছ চাষের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে, মাছচাষ সংক্রান্ত কাজে পুরুষকে সহায়তা করে, পারিবারিক পুষ্টির যোগান দিয়ে তার পরিবারকে সাহায্য করে, তখন পরিবারের সকল সদস্যের তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের পরিবর্তন আসে। সে সহজেই সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে; সম্পদ ব্যবহারের অধিকার অর্জন করে, চলাচলের স্বাধীনতা পায়। মাছচাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে বাড়ির বাইরে বের হতে পারে। মাছচাষের উপকরণ ক্রয় করতে বাজারে যেতে পারে।

যখন নারী আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হয় পরিবারের সাথে সাথে সমাজও তাকে মূল্যায়ন করে। সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিবেশীরা তার কাছে মাছচাষসহ নানা বিষয়ে পরামর্শ নেয়। এভাবে তার নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা অর্জিত হয়।

উপসংহার (Conclusion)

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সে নিজ জীবন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তা ঠিক করা, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখা বোঝায়। ক্ষমতায়ন নারীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, যার দ্বারা সে সমস্যা সমাধান করতে শেখে। নারীর ক্ষমতায়ন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, অভিগম্যতা, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মাছচাষ, নারী ক্ষমতায়নের তিনটি পর্যায়কেই অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি করে। মাছ চাষের মাধ্যমে নারীর আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের ধারণা জন্মে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য ও একসাথে কাজ করার দক্ষতা তৈরি হয়; পরিবারে ও সমাজে সে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাবলম্বিতার ফলে রাজনীতি চর্চায়ও নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব, যা নারীর ক্ষমতায়নের মূলমন্ত্র।

[১] সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২] সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়ার সাথে মাগুর ও গুলশা মাছের মিশ্র চাষ
Polyculture of Monosex GIFT Tilapia with Magur and Gulsha

ড. এএইচএম কোহিনুর ও মোঃ মশিউর রহমান

Abstract

Monosex GIFT Tilapia is the leading species in aquaculture of Bangladesh as it is well adapted to Bangladeshi condition, easy to propagate, grows fast, converts the artificial food very efficiently and tolerates the changes in water quality as well as disease resistant compared to other cultured species. In last decades over 400 tilapia hatcheries have been established and producing about 4.0-5.0 billion fry evey year. Presently, the tilapia production in Bangladesh is 2.98 lac MT. Many farmers of Bangladesh are farming tilapia in their ponds in monoculture management. But farmers are not getting enough profit through tilapia monoculture. Recently, BFRI developed a tilapia based polyculture technology, which is risk free, enviornment friendly and highly profitable. In this technology, tilapia can be reared with magur (*Clarias batrachus*) and gulsha (*Mystus cavasius*) at the stocking density of 62500, 12500 and 50000/ha, respectively with supplemental feed containing 28-30% protein. After six months rearing, a production of 15,000 kg/ha can be achieved where the relative contribution of tilapia is 83%. Through this culture technology, a net benefit of Tk.10.0 lac/ha-crop can be achieved. Undoubtedly, this technoloigy will be very much acceptable to farmers for commercial tilapia farming in Bangladesh and additionally people will get opportunity to intake their delicious fish magur and gulsha.

মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া একটি উচ্চ ফলনশীল জাতের মাছ। চাষযোগ্য মাছের মধ্যে মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া অন্যতম। আমাদের দেশে এ মাছের চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০০ এর অধিক তেলাপিয়া হ্যাচারি স্থাপিত হয়েছে এবং এসব হ্যাচারি হতে বছরে প্রায় ৫০০-৬০০ কোটি পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে এ মাছের উৎপাদন বছরে প্রায় ৩.০ লক্ষ মে.টন। এ মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো স্বাদুপানি, লবণাক্ত পানি, পুকুর-ডোবা, ধানক্ষেত, খাঁচায় ও চিংড়ি ঘেরে চাষ করা যায়। এ মাছচাষ করে অধিকাংশ চাষিরাই বেশ লাভবান হয়েছেন। তবে বর্তমানে মাছের খাদ্যমূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার কারণে অনেক চাষি মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের চাষ থেকে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারছেন না। যার কারণে অনেক চাষি এ মাছ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সম্প্রতি এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ একক চাষের চেয়ে মিশ্র চাষে বেশি লাভজনক ও অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক চাষিরা এখন মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের মিশ্র চাষ করে লাভবান হয়েছেন। মুনাফার বিষয় বিবেচনা করে মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের সাথে উচ্চমূল্যের দেশীয় প্রজাতির মাগুর ও গুলশা মাছের মিশ্র চাষ করা অধিক লাভজনক। সহাবস্থানের মাধ্যমে একই পুকুর থেকে তেলাপিয়া মাছের পাশাপাশি বিপন্ন প্রজাতির দেশি মাগুর ও গুলশা মাছের আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। চাষ পদ্ধতির ধাপসমুহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি
(Pond selection and preparation)

- মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের মিশ্র চাষের জন্য যেখানে বছরে কমপক্ষে ৫-৬ মাস ১.০ থেকে ১.৫ মিটার পানি থাকে এমন ২০-১০০ শতাংশ আয়তনের পুকুর নির্বাচন করা যেতে পারে;
- মাছ চাষের জন্য পুকুর অবশ্যই শুকাতে হবে। শুকানোর পর পাড় ভালোভাবে মেরামত করে তলদেশের পচা কাদা অপসারণ করতে হবে এবং পাড় ভাল ভাবে মেরামত করতে হবে;
- পুকুর পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছেটে দিতে হবে;
- পুকুরের তলা থেকে ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করার জন্য প্রতি শতাংশে ১৫-২০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে;
- ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ৩-৫ দিন পরে পুকুর পরিষ্কার পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে যাতে পানির গভীরতা ১.০ মিটার হয়;
- এরপর শতাংশ প্রতি ১.০ কেজি হারে কলিচুন পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে পুকরে প্রয়োগ করতে হবে; এবং
- চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে পোনা মজুদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পোনা আহরণ
(Fry collection)

গুণগতমানসম্পন্ন সুস্থ ও সবল পোনা সংগ্রহ এবং পরিবহন মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছ চাষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সময় অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের পোনা হ্যাচারি হতে সংগ্রহ করা হয়। এ মাছের পোনা পরিবহনকালে এবং মজুদোত্তর মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এছাড়া অসতর্কতার কারণে এ মাছের শরীরে সামান্যতম ক্ষত হলে তা থেকে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে পোনা মজুদের পর পুকুরে ব্যাপক হারে রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। সেজন্য নার্সারি পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় এক সাথে বেশি সংখ্যক পোনা না ধরে কম

সংখ্যক পোনা আহরণ করা উচিত। বেড়জাল থেকে পোনা সংগ্রহের সময় অল্প অল্প পোনা বালতি বা পাতিলে সংগ্রহ করে ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে। ট্যাংক হতে ৫-৬ ঘণ্টা পর গ্লাস নাইলনের হাপা দিয়ে সতর্কতার সাথে অল্প অল্প করে পোনা পরিবহনের জন্য ধরতে হবে।

পোনা পরিবহন
(Fry transportation)

মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের পোনা পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে সহজে ও নিরাপদে পরিবহন করা যায়। দূরত্ব অনুযায়ী প্রতি পলিথিন ব্যাগে ১০০০টি পোনা ৮-১০ ঘণ্টা সময় দূরত্বে নির্বিঘ্নে পরিবহন করা যায়। এভাবে মাগুর ও গুলশা মাছও পলিব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পরিবহন করা যেতে পারে। তবে অক্সিজেনের চাহিদা বা পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ভর করে পোনার প্রজাতি, ওজন, তাপমাত্রা এবং শারীরতত্ত্বীয় অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর।

পোনা মজুদ
(Fry stocking)

মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রতি শতাংশে নিম্নবর্ণিত সারণি অনুযায়ী মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়াসহ অন্যান্য প্রজাতির সুস্থ, সবল ও গুণগতমানসম্পন্ন পোনা পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে। মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের পোনা মজুদের ১৫ দিন পর মাগুর ও গুলশা মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। তবে পোনা মজুদের সময় পোনা শোধনের জন্য ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাস অথবা ২০০ গ্রাম খাবার লবণ দিয়ে পোনাকে ৩০ সেকেন্ড গোসল করাতে হবে।

সারণি: বিভিন্ন প্রজাতির মাছের আকার ও শতাংশ প্রতি মজুদ ঘনত্ব

ক্রমিক নং	প্রজাতি	পোনার আকার (সেমি)	মজুদ ঘনত্ব (প্রতি শতাংশে)
০১	মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া	৩-৪	২৫০
০২	মাগুর	৭-৮	৫০
০৩	গুলশা	৩-৪	২০০
মোট			৫০০

পুকরে পোনা মজুদ খুব সতর্কতার সাথে করতে হবে। পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় অবশ্যই পোনা ভর্তি পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমতায় এনে ভালোভাবে অভ্যস্তকরণ বা কন্ডিশনিং করতে হবে। সাধারণত কম তাপমাত্রায় সকালে বা সন্ধ্যায় পোনা মজুদ করাই উত্তম।

সম্পূরক খাদ্য
(Suplimental feed)

মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের পুকুরে ২৮-৩০% প্রোটিন-সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। সম্পূরক খাদ্যের গুণগতমান ভালো না হলে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- পোনা ছাড়ার ২-৩ ঘণ্টা পর থেকে প্রাণিজ প্রোটিন (২৮-৩০%) সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য মাছের দেহের ওজনের ১০% হারে শুরু করে ১ মাসের মধ্যে ৪%-এ নামিয়ে এনে পরবর্তীতে এ হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- মুখ্য প্রজাতি হিসেবে শুধুমাত্র মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের জন্যই সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের জন্য বিবেচনা করতে হবে; এবং
- সম্পূরক খাদ্য তিন ভাগ করে সকাল, দুপুর ও বিকালে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

পানির গুণাগুণ
(Water quality)

মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছ চাষের জন্য পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য নিয়মিতভাবে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা আবশ্যক। ভালো উৎপাদন পেতে হলে পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

- প্রয়োজন মাফিক পুকুরে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে;
- পানির গভীরতা ৩-৪ ফুটের মধ্যে রাখতে হবে;
- পানির তাপমাত্রা ২৪°-৩০° সেলসিয়াস-এর মধ্যে থাকতে হবে;
- পানির পিএইচ সবসময় ৭.০-৮.০ এর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;
- পানির স্বচ্ছতা ৩০ সেমি-এর মধ্যে রাখা ভালো; এবং
- পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ ৫-৮ মিগ্রা/লি রাখতে হবে।

মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা
(Post-stockinng management)

অপেক্ষাকৃত ভালো উৎপাদন পাওয়ার লক্ষ্যে পোনা মজুদের পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

- প্রতি ১৫ দিন পরপর মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের নমুনায়ন করে সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে;
- পোনা মজুদের এক মাস পর হতে প্রতি ১৫ দিন অন্তর শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম চুন ও পরবর্তী ১৫ দিন পর ৩০০-৪০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করতে হবে;
- প্রতি সপ্তাহে ১ দিন সূর্য উঠার পর হররা টানার ব্যবস্থা নিতে হবে;
- প্রয়োজনে সপ্তাহে কমপক্ষে ১ দিন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে এবং মাসে একবার পানি বদলের ব্যবস্থা করতে হবে;
- সপ্তাহে ১ দিন সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে; এবং
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে পুকুরে চুন লবণ প্রয়োগসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ
(Harvesting and marketing of fish)

উপরিল্লোখিত পদ্ধতি অনুসরণ করলে পোনা মজুদের ৪-৫ মাস পর মাছ বিক্রি যোগ্য হয়ে থাকে, তাই এ সময় আহরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে বেড় জাল দিয়ে মনোসেক্স গিফট

তেলাপিয়া ও মাগুর মাছ আহরণ করতে হবে। অতঃপর পুকুর শুকিয়ে গুলশাসহ সব মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- প্রতি শতাংশ পুকুর হতে ৪-৫ মাসে মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া ৪৮-৫০ কেজি, মাগুর ৫-৬ কেজি ও গুলশা ৩.৮০-৪.০ কেজি উৎপাদন পাওয়া যায়।
- এ পদ্ধতিতে ৪-৫ মাসে মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের মিশ্র চাষে প্রতি শতাংশ পুকুর হতে ৩.৫-৪.০ হাজার টাকা ব্যয় করে এক ফসলে ৪.০-৪.৫ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

- ইদানিং ভোক্তার নিকট টাটকা ও জীবন্ত মাছ বেশি পছন্দ ক্রেতাসাধারণ অধিক মূল্য দিয়েও জীবন্ত ও টাটকা মাছ ক্রয় করতে আগ্রহী; ফলে উৎপাদিত মাছ বাজারজাত করার সময় বিষয়টি বিবেচনায় নিলে চাষি বেশি মুনাফা করতে পারবেন।

পরামর্শ (Advice)

সফলভাবে মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া মাছের সাথে মাগুর ও গুলশা মাছের মিশ্র চাষ করার নিমিত্ত নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

- নিয়মিত খাদ্য ও সার প্রয়োগ করতে হবে;
- অতিরিক্ত গরমে খুব সকালে পুকুরে পরিষ্কার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে;
- উন্নতমানের ২৮-৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ সম্পূরক খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- নিয়মিত পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- পানির পিএইচ সবসময় ক্ষারীয় মাত্রায় রাখতে হবে; এবং
- শীতকালে মাগুর মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কাজেই চাষকালীন সময় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে শীত শুরু হওয়ার আগেই মাগুর মাছ বাজারজাত করা যায়।

উপসংহার (Conclusion)

গ্রামীণ পর্যায়ে অন্যতম জনপ্রিয় কার্যক্রম হলো মাছচাষ। স্বল্প বিনিয়োগ ও অল্প শ্রমে অধিক মুনাফার সুযোগে মাছচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ পর্যন্ত যে কয়টি প্রজাতির মাছের চাষের সম্প্রসারণ হয়েছে মনোসেক্স তেলাপিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। এ চাষকে অধিক লাভজনক ও ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য সচেতন চাষিরা তেলাপিয়ার সাথে সাথি ফসল হিসেবে মাগুর ও গুলশা মাছকে অন্তর্ভুক্ত করে মিশ্রচাষের দিকে ক্রমশ আগ্রহী হচ্ছে। এ চাষ পদ্ধতি বেশ সফল হওয়ায় বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাগুর ও গুলশা মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারমূল্য অধিক হওয়ায় মাগুর ও গুলশা মাছ চাষ করে চাষি যেমন লাভবান হবে; তেমনি দেশের জনগণও পুষ্টিসমৃদ্ধ এ মাছের স্বাদগ্রহণ করার অধিক সুযোগ পাবে।

[১] প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
[২] বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণে ইকোফিস প্রকল্পের উদ্যোগ

ECOFISH Project Attempts for Scientific Hilsa Fisheries Management

ড. এম জলিলুর রহমান[১], এম আই গোলদার[২] ও ড. এম এ ওহাব[৩]

Abstract

The Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISH[BD]) project is a five-year, USAID-funded initiative designed to improve the resilience of the Padma-Meghna River-estuarine ecosystem and livelihood of communities reliant on coastal fisheries, implemented jointly by WorldFish and Department of Fisheries (DoF) started in June 2014. One of the important objectives of the project is to generate and add scientific knowledge for the better implementation of Hilsa fisheries management activities. Important activities which are being implemented to achieve that objective are described briefly. Data collected through round the year and monthly catch and size monitoring of Hilsa from all the major habitats such as Padma River, upper, middle and lower Meghna River as well as from marine are being analyzed soon for stock assessment. The investigation related to the identification of peak spawning season of Hilsa revealed that about 10% , 15% and 8% of female Hilsa spawned in September, October and December 2015, respectively indicating October as the peak spawning month for Hilsa. To determine the appropriate mesh size to catch a particular size of Hilsa, gillnet selectivity study is going on. Assessment of genetic linkage between Jatka and adult Hilsa from the same sanctuary will reveal whether Jatka after growing to adult returns to the same sanctuary or not and the information will help in decision making for better management. Seven water quality parameters (DO, pH, salinity, conductivity, temperature, transparency and depth) from seven sampling areas is being monitored twice a month round the year and assessment of the parameters will explore the probable relationships of the parameters with migration, spawning, aggregation and abundance of fish. Domestication of Hilsa fingerlings/juveniles (Jatka) in ponds at Riverine Sub-station, BFRI, Kalapara, Patuakhali is going on with an average growth rate of 1.1 cm per month to assess the possibilities of Hilsa aquaculture for stock enhancement and alternative employment generation of coastal fishers. All the science based information will be useful in updating Hilsa Fisheries Management Action Plan (HFMAP) in near future.

জনপ্রিয়তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিচারে আমাদের দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ একক প্রজাতি হিসেবে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ। পদ্মা-মেঘনা অববাহিকা ও তৎসংলগ্ন মোহনা এবং সমুদ্র এলাকাই ইলিশের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। বর্তমানে এককভাবে বাৎসরিক ৩.৮৫ লক্ষ মে.টন উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও এ মাছের চাহিদা ও বাজারমূল্য অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। ফলে বিস্তৃত এ জলরাশির উপকূলে বসবাসরত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকায়নে ইলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। খাদ্যমান বিচারেও ইলিশ উন্নতমানের আমিষ, ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিডযুক্ত, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ অত্যন্ত সুস্বাদু মাছ। আবহমানকাল থেকে বাঙালির সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানে জড়িয়ে আছে এ মাছ।

অভিপ্রয়াণশীল এ মাছের জীবনের অনেকটা সময় সাগরের লবণাক্ত পানিতে অতিবাহিত হলেও এদের জন্ম পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার মিঠা বা স্বাদুপানিতে। জন্মের পর পোনা বা জাটকা অবস্থায় কয়েক মাস এসব নদীর অপেক্ষাকৃত অগভীর ও কম স্রোতময় এলাকায় বিচরণ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এসব এলাকাকে ইলিশ মাছের নার্সারি বা বিচরণক্ষেত্র বলা হয়। বর্ষার শুরুতেই অধিকাংশ জাটকা এ সকল নার্সারিক্ষেত্র পরিত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে মোহনা হয়ে সাগরের লবণাক্ত পানিতে পরিভ্রমণ করে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে বসবাস করে পরিপক্ব হয়ে প্রজননের জন্য ইলিশ পুনরায় স্বাদুপানিতে ফিরে আসে ও ডিম ছাড়ে। এভাবে স্বাদু ও লবণাক্ত পানিতে ইলিশের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়। তবে নদী, মোহনা ও সাগরে এদের আপেক্ষিক অবস্থান সর্বদা সমান অনুপাতে হয় না। ফলে এদের জীবনচক্রও সরলভাবে পরিচালিত হয় না। কোনো কোনো সময় ইলিশ সাগরে পরিপক্ব হওয়ার অনেক আগেই নদীতে আসে ও নদীতেই পরিপক্ব হয়। আবার, অনেক সময় সম্ভবত স্থানীয় পরিবেশে খাপখাইয়ে ইলিশ নদীর উপরের দিকে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কখনো সাগরে ফিরে যায় না। এজন্য বিভিন্ন নদীতে, মোহনায় বা সাগরে প্রাপ্ত বিভিন্ন ইলিশের বাহ্যিক আকার, আকৃতি, স্বাদ, প্রজননকাল, বিচরণক্ষেত্র ও বিচরণকাল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইলিশের বিভিন্ন প্রজাতি আছে বলে মনে হয়। কিন্তু কৌলিতাত্ত্বিক (জেনেটিক) বিশ্লেষণে কখনও এর পক্ষে আবার বিপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে ইলিশের জীবনচক্রের অনেক দিক আরও ভালোভাবে জানার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য অন্বেষণ অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব এবং সে প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় বিষয়াদি বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি ইলিশের রিক্রুটমেন্ট প্যাটার্ন, আহরণমাত্রা (এক্সপ্লয়টেশন লেভেল) ও মজুদের পরিমাণ জানা বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আবাসস্থল ও প্রতিবেশের (ইকোসিসটেম) রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইউএসএআইডি (USAID)-এর আর্থিক সহায়তায় ইকোফিস (Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh, ECOFISH[BD]) শীর্ষক প্রকল্প নামে ৫ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং ওয়ার্ল্ডফিস যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। চলমান এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অন্বেষণ ও সংযোজন করা। এ উদ্দেশ্যে চলমান কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণমূলক কার্যক্রম আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণমূলক কার্যক্রম (Science based knowledge generating activities)

ইলিশ মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অন্বেষণের লক্ষ্যে ইকোফিস প্রকল্পের আওতায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলমান কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ইলিশ আহরণ মনিটরিং (Hilsa catch monitoring)

ইলিশের মজুদ নিরূপণের জন্য এর আহরণ মনিটরিং করা অত্যন্ত জরুরি। ইলিশ মাছ আহরণের পরিমাণ, ব্যবহৃত নৌকা, জাল, জাল পাতার সময়, মৌসুম, চাঁদের অবস্থান (জোঁ/ডালা) ইত্যাদির ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এসব দিক বিবেচনা করে পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার জোঁর সময় ২ দিন করে মোট ৪ দিন এবং মধ্যবর্তী ডালাতে ৪ দিন করে মাসে সর্বমোট ৮ দিন নমুনায়ন করা হচ্ছে। এ নমুনায়ন কার্যক্রমের আওতায় সারা বছর পদ্মা, উপরের মেঘনা, মধ্য মেঘনা, নিম্ন মেঘনা এবং সাগরে আহরিত ইলিশের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে ইলিশের মজুদ নিরূপণ করা হবে।

ইলিশের আকার বা দৈর্ঘ্য মনিটরিং (Size or length monitoring of Hilsa)

ইলিশের মজুদ নিরূপণের জন্য বিভিন্ন মৌসুমে কোনো ইলিশ পপুলেশনে বিভিন্ন বয়সের বা আকারের ইলিশ কী হারে বা অনুপাতে বিদ্যমান থাকে তা জানা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে ইলিশের আকার বা দৈর্ঘ্য মনিটরিং করার জন্য সারা বছর স্যাম্পলিং করা হয়। এ স্যাম্পলিং কার্যক্রমের আওতায়, পদ্মা, উর্ধ্ব মেঘনা, মধ্য মেঘনা, নিম্ন মেঘনা এবং সাগরে আহরিত ইলিশের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হচ্ছে। দৈর্ঘ্য পরিমাপ যাতে নির্ভুল প্রমাণিত হয়; তার জন্য প্রতিটি মাছের গায়ে কোডযুক্ত ট্যাগ ব্যবহার করে ছবি তোলা হয় এবং পরে ছবি থেকে ডি-কোড করে নিখুঁতভাবে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় (নিচের চিত্র)। খুব শীঘ্রই এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে ইলিশের মজুদ নির্ণয় করা হবে।

চিত্র: মাছের গায়ে ৪ সেমি লম্বা একটি রঙিন শক্ত কাগজ রেখে সম্পূর্ণ মাছের ছবি নেয়ার দৃশ্য। ছবি থেকে ডি-কোড করে মাছের প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়।

ইলিশের প্রধান প্রজনন কাল নিরূপণ ও লিঙ্গ পরিবর্তনের সম্ভাবনা যাচাই (Identification of peak spawning season of Hilsa & testing the probability of sex change)

খুব নিখুঁতভাবে ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজননকাল নিরূপণ করা গেলে মা-ইলিশ আহরণ বন্ধের সময়টি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এজন্য মাসিক ভিত্তিতে স্যাম্পলিং করে, ইলিশের ডিমের পরিপক্বতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সময়ে, পরিপক্ব (ডিম ছাড়ার পূর্ববর্তী অবস্থা) ও স্পেন্ট (ডিম ছাড়ার ঠিক পরবর্তী অবস্থা) ইলিশের উপস্থিতির হার, জিএসআই (GSI, gonadosomatic index = (gonad weight/body weight) x 100) - এর ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসকে সর্বোচ্চ প্রজননকাল হিসাবে নিরূপণ করা হয়েছে (নিচের চিত্র)। এ দুই মাসের মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে ১০%, অক্টোবর মাসে ১৫% ও ডিসেম্বর মাসে (৮%) ইলিশ প্রজনন করে। তাই অক্টোবর, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসকে যথাক্রমে ইলিশের ১ম সর্বোচ্চ, ২য় সর্বোচ্চ ও ৩য় সর্বোচ্চ প্রজনন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। আরও নিখুঁতভাবে ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজননকাল নিরূপণের জন্য আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে স্যাম্পলিং করে ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন সপ্তাহ নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, ইলিশের পুরুষ থেকে স্ত্রী হিসেবে লিঙ্গ পরিবর্তনের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

চিত্র: বিভিন্ন মাসে ইলিশের প্রজনন হার

পরিপক্ব মাছের উপস্থিতি সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ হলেও সর্বোচ্চ প্রজনন (১৫% স্পেন্ট) অক্টোবর মাসে হয়। ফলে নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যায় ডিম্বাশয় পুনর্গঠন পর্যায়ের ইলিশ পাওয়া যায়।

নির্দিষ্ট আকারের ইলিশ আহরণে জালের সঠিক ফাঁস নির্ধারণ (Determination of appropriate mesh size of net to catch a particular size of Hilsa)

নিষিদ্ধ আকারের ইলিশ আহরণ বন্ধে যে ফাঁসের জালে সব থেকে বেশি নিষিদ্ধ আকারের ইলিশ ধরা পড়ে তা নিরূপণের মাধ্যমে উক্ত ফাঁস বা এর ছোট ফাঁসের ঐ জাতীয় জাল নিষিদ্ধ করা ইলিশ ব্যবস্থাপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া কোনো নির্দিষ্ট আকারের ইলিশ ধরার জন্য কোন ফাঁসের জাল ব্যবহার করা প্রয়োজন তা জানার জন্য অর্থাৎ ইলিশের ফাঁস জালের (hilsa gill net) সিলেক্টিভিটি নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষামূলক ইলিশ আহরণ পরিচালনা করা হয়। তবে আগামি ভরা মৌসুমে (আগস্ট-নভেম্বর) জেলেদের অংশগ্রহণে 'জিরো-সুতার' জাল ব্যবহার করে আরও তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করা হবে।

একই অভয়াশ্রমে জাটকা ও ইলিশের জেনেটিক সম্পর্ক নিরূপণ (Determination of genetic relationship between Jatka and Hilsa of the same sanctuary)

কোনো অভয়াশ্রমের জাটকা বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ ইলিশ হবার পর প্রজননের জন্য বা খাদ্যের জন্যে আবার ঐ অভয়াশ্রমে ফিরে আসে কি না তা জানা ব্যবস্থাপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি জানার জন্য একই অভয়াশ্রমে জাটকা ও ইলিশের জেনেটিক সম্পর্ক নিরূপণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩টি অভয়াশ্রম থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জাটকা ও পূর্ণাঙ্গ ইলিশের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব নমুনার জেনেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একই অভয়াশ্রমে জাটকা ও ইলিশের জেনেটিক সম্পর্ক নিরূপণ করে ইলিশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়া সম্ভবপর হবে।

বিভিন্ন অভয়াশ্রমে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ (Observation on the physico-chemical parameters of water in different sanctuaries)

পাঁচটি অভয়াশ্রমসহ মোট ৭টি গুরুত্বপূর্ণ নদীর পরিবেশের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণের পার্থক্য পর্যবেক্ষণের জন্য সারা বছর প্রতি মাসে একবার জোঁ-এর সময় ও একবার ডালার সময় পানির মোট ৭টি ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ (physico- chemical parameters) পরিমাপ করা হয়। এগুলো হলো, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, লবণাক্ততা, পরিবাহিতা (conductivity), তাপমাত্রা, স্বচ্ছতা (transparency) ও গভীরতা। বিভিন্ন অভয়াশ্রমে পানির এসব গুণাগুণের পরিবর্তন এবং সে পরিবর্তনের সাথে ইলিশের প্রাচুর্য, অভিপ্রয়াণ, প্রজনন বা আহরণের কোনো সম্পর্ক আছে কী না তা নির্ণয় করে ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

ইলিশের মজুদ বৃদ্ধিকরণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ইলিশ চাষ (Hilsa aquaculture for stock enhancement and alternative employment)

বাংলাদেশের উপকূলীয় আধা-লবণাক্ত পানিতে লাভজনকভাবে ইলিশ চাষ করা সম্ভব কি না বা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাটকা উৎপাদন ও লালন-পালন করে ইলিশের মজুদ বাড়ানোর জন্য নদীতে ছাড়া যায় কি না সেসব বিষয় পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যেই কলাপাড়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী উপকেন্দ্রে ইকোফিস প্রকল্পের আওতায় ইলিশ চাষ শুরু করা হয়েছে (নিচের চিত্র)। চাষকৃত ইলিশ প্রতি মাসে ১.১ গ্রাম হারে বড় হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ইলিশ চাষ আশাব্যঞ্জক প্রতীয়মান হলে, স্থানীয় জেলেদের সম্পৃক্ত করে পুকুরে/খাঁচায় চাষ করা হবে। অতঃপর ইলিশ চাষপ্রযুক্তি লাভজনক হলে সংশ্লিষ্ট অন্যদের এ চাষে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

চিত্র: ইকোফিশ প্রকল্পের আওতায় কলাপাড়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের, নদী উপকেন্দ্রের পুকুরে ইলিশ চাষের দৃশ্য

উপসংহার (Conclusion)

ইলিশ মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অন্বেষণের লক্ষ্যে ইকোফিস প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে, ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, প্রতিবেশের উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের জীবনমান বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। সর্বোপরি, এ সকল তথ্য ও সঞ্চিত জ্ঞান ব্যবহার করে ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (HFMAP) নবায়ন করা সম্ভব হবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার (Acknowledgement)

লেখকবৃন্দ প্রকল্পটিতে অর্থায়নের জন্য USAID|Bangladesh-এর অবদানকে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করছে। লেখাটির মানোন্নয়নের জন্য ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন, ওয়ার্ল্ডফিস এবং ড. মোহাঃ সাইনার আলম, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ যে সকল পরামর্শ দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করা হচ্ছে।

[১]সাইন্টিস্ট (ফিশ পপুলেশন বায়োলজী), ইকোফিস প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস
[২]প্রকল্প পরিচালক, ইকোফিস প্রকল্প এবং পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]টিম লিডার, ইকোফিস প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস

নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

International Recognition Regarding Competence of Bangladesh in Producing Safe Fish and Fish Product

মোঃ হুমায়ুন কবির খান[১], নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস[২] ও আ ক ম আজিজুল হক মোল্লা[৩]

Abstract

Fish and fish products is one of the major export commodity of Bangladesh. Bangladeshi fish and fish products are exported to many countries of the world including EU countries, USA, Russia, Japan, China, India, Middle east countries etc. Among them, EU countries are main importing countries of fish and fish products of Bangladesh. Following detection of residues of veterinary medicinal products and unauthorised substances in fish products (crustaceans) exported to the European Union from Bangladesh, European Commission had adopted the Decision no. 2008/630/EC. According to this decision- the consignments of fish and fish products imported from Bangladesh must be accompanied with the report of the analytical tests carried out, in particular, with a view to detecting the presence of chloramphenicol, metabolites of nitrofurans, tetrarcycline, oxytetracycline, chlortetracycline, malachite green and crystal violet and their respective leuco-metabolites. Based on the report of the audit carried out during 20-30 April, 2015 and on the very low number of non- compliant consignments, European Commission has repealed the Decision 2008/630/EC through adopting the Decision no. 2260/2015 that means accompanying of analytical test reports with the consignments of fish and fish products imported into the Union from Bangladesh is no longer required. Such decision is to be considered as international recognition regarding competence of Bangladesh in producing safe fish and fish products for export. It is a matter of proud for the nation. We should take all out attempt to uphold this achievement.

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের কম-বেশি শতকরা দুই ভাগ এ খাতের অবদান। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭৫ হাজার ৩৩৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করে ৪ হাজার ২৮৩ কোটি টাকার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫০টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের প্রধান বাজার। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্টে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিকের অবশেষ-এর উপস্থিতি ও ক্ষতিকর জীবাণুর উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে RASFF (Rapid Alert System for Food & Feed) নোটিফিকেশন জারি এবং দেশব্যাপী কার্যকর রেসিডিউ মনিটরিং প্রোগ্রাম-এর অনুপস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভোক্তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম দেশে ইউরোপীয় কমিশনের Health & Consumer Protection Directorate-General (DG (SANTE))-এর আওতাধীন Food and Veterinary Office (FVO)-এর উদ্যোগে একটি মিশন পরিচালনা করা হয়। এ মিশনের সুপারিশ ও তার বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সার্বিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে গৃহীত ব্যবস্থা ও প্রণীত আইন ও তার প্রয়োগ এর বাস্তব কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য EU-FVO কর্তৃক ২০০৭ সালে পুনরায় মিশন পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে একই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে EU-FVO কর্তৃক অডিট পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি ও চিংড়িজাতপণ্যে ভেটেরিনারি ঔষধের অবশেষ ও অননুমোদিত রাসায়নিকের উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় কমিশন কর্তৃক ২০০৮ সালে 'EC/630/2008' নম্বর সিদ্ধান্ত জারি করা হয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও চিংড়িজাত পণ্যের কনসাইনমেন্টের সাথে আবশ্যিকভাবে ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফুরান মেটাবোলাইটস এবং ম্যালাকাইট গ্রিন ও ক্রিস্টাল ভায়োলেট)-এর রেসিডিউ পরীক্ষণের ফলাফল সংক্রান্ত টেস্ট রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশনা জারি করা হয়।

২০০৮ সালের পর ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে পরিচালিত EU-FVO অডিট প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০১০ সালের ১২ জুলাই তারিখে কমিশন সিদ্ধান্ত নম্বর 'EC/630/2008' সংশোধন সংক্রান্ত ইউরোপীয় কমিশনের সিদ্ধান্ত নম্বর '2010/387/EU' জারি করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও চিংড়িজাত (crustaceans) পণ্যের প্রতিটি কনসাইনমেন্টের সাথে ২০০৮ সালে আরোপিত রাসায়নিক পদার্থসমূহের পরীক্ষণের সাথে টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন এবং ম্যালাকাইট গ্রিন ও ক্রিস্টাল ভায়োলেট এর লিউকোমেটাবোলাইটস পরীক্ষণের প্রতিবেদনও প্রেরণের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জারি করা হয়। সে সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে প্রবেশকালে সীমান্ত বন্দরসমূহে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও চিংড়িজাত

পণ্যের শতকরা ২০ ভাগ কনসাইনমেন্টে বাধ্যতামূলকভাবে এ সকল ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের পরীক্ষণের সিদ্ধান্ত জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে পুনরায় EU-FVO কর্তৃক এ দেশে অডিট পরিচালনা করা হয়। ২০১১ সালে পরিচালিত অডিটের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ২০১১ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে প্রবেশকালে সীমান্ত বন্দরসমূহে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও চিংড়িজাত পণ্যের শতকরা ২০ ভাগ কনসাইনমেন্ট পরীক্ষণের বাধ্যবাধকতা তুলে দেয়া সংক্রান্ত '2011/742/EU' নম্বর সিদ্ধান্ত জারি করা হয়। এরপর ২০১৫ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত EU-FVO কর্তৃক অডিট প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ইউরোপীয় কমিশন কর্তৃপক্ষ বিগত ৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও চিংড়িজাতপণ্যের কনসাইনমেন্টের সাথে আবশ্যিকভাবে ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফুরান মেটাবোলাইটস, টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন এবং ম্যালাকাইট গ্রিন, ক্রিস্টাল ভায়োলেট ও এদের মেটাবোলাইটস এর রেসিডিউ পরীক্ষণের টেস্ট রিপোর্ট পাঠানো সংক্রান্ত 'EC/630/2008' নম্বর সিদ্ধান্ত বাতিল করে '2260/2015' নম্বর সিদ্ধান্ত জারি করে যা রপ্তানিতব্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত। এ সিদ্ধান্ত জারির পিছনে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে নিম্নে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হলো:

২০১৫ সালের EU-FVO অডিটের ইতিবাচক মন্তব্য
(Positive comments in EU-FVO Audit Report 2015)

বিগত ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০ ও ২০১১ সালে EU-FVO কর্তৃক মিশন/অডিট পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালে পরিচালিত অডিট প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় EU-FVO কর্তৃক ২০১২ সালে অফিসিয়ালি অডিট সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এর দীর্ঘদিন পর ২০-৩০ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে EU-FVO কর্তৃক বাংলাদেশে অডিট পরিচালনা করা হয়। 'Evaluate the control systems in place governing the production of fishery products intended for export to the European Union' ও 'Evaluate the control of residues and contaminants in live animals and animal products including controls on veterinary medicinal products' এ দু'টি বিষয়ে এ অডিট পরিচালনা করা হয়। Ms. Åsa Bergquist, Ms. Elzbieta Brulinska-Ostrowska এবং Ms. Judith Manhardt-Welbers নামক তিন জন বিশেষজ্ঞ এ অডিট পরিচালনা করেন। অডিট টীম দেশের মৎস্য সেক্টরের রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন Value chain যেমন মাছ ও চিংড়ি খামার, ভেটিরিনারি ঔষধের দোকান, চিংড়ি ডিপো/আড়ত, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত খুলনা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মানিকগঞ্জ জেলায় ভ্রমণ করেন। অডিট টীম Central Competent Authority (CCA)-এর অংশ হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, Regional Competent Authority (RCA)-এর অংশ হিসেবে উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে সভায় মিলিত হন। অডিট টীম মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন প্যারামিটারের টেস্ট করার সক্ষমতা ও বিভিন্ন টেস্ট মেথড সরেজমিনে যাচাই করেন। অডিট শেষে অডিট টীম দু'টি বিষয়ে দু'টি পৃথক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'The control systems in place governing the production of fishery products' সম্পর্কিত প্রতিবেদনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (CA বা Competent Authority) সম্পর্কে নিম্নরূপ মতামত উল্লেখ করা হয়:

- 'Improvements have been made since last audit and in principle, the current organization of the CA and its documented operational procedures provide for an acceptable official control system for Fishery products which is implemented in satisfactory way.'

অপরদিকে 'The control of residues and contaminants in live animals and animal products including controls on veterinary medicinal products' সম্পর্কিত প্রতিবেদনে নিম্নরূপ মতামত উল্লেখ করা হয়:

- 'The system in place for residues controls in aquaculture offers guarantees equivalent to EU requirements.

চিত্র: অডিট টীম কর্তৃক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পরিদর্শন

চিত্র: অডিট টীম কর্তৃক মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিদর্শন

- The residue monitoring plan satisfies the minimum requirements laid down in EU legislation and both it and PET program are effectively implemented as evidenced by a significant decrease in the no. of N/C samples relative to previous years.'

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের সম্পর্কে প্রতিবেদনে নিম্নরূপ মতামত উল্লেখ করা হয়:

- 'Significant improvements have also been noted in the performance of the laboratory network, accreditation of laboratories and validation of analytical methods and the competent authority can in general, have confidence in the reliability of analytical results.'

উপরে উল্লিখিত মন্তব্যসমূহ বাংলাদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিধি-বিধান অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কারণে বর্তমানে এ দেশে বিরাজমান ব্যবস্থা নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য।

এনআরসিপি নমুনার নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার সংখ্যা হ্রাস
(Reduction in number of NRCP non-compliant samples)

জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (NRCP) হলো বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ (residue) পর্যবেক্ষণের একটি কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো ভোক্তার জন্য বাংলাদেশী মৎস্যপণ্য নিরাপদ করা। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রতি বছরের শুরুতে risk based NRCP প্রস্তুত করে পূর্ববর্তী বছরের বাস্তবায়িত NRCP কার্যক্রমের আওতায় নমুনা পরীক্ষণের ফলাফলের প্রতিবেদনসহ DG-SANTE-কে অবহিত করা হয় এবং তা বাস্তবায়ন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে NRCP নমুনার নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার সংখ্যা হ্রাস, মাঠ পর্যায়ে মাছচাষিগণ কর্তৃক উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice- GAP) অনুসরণ, মৎস্যচাষে ভেটেরিনারি ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং NRCP নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার প্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে মৎস্য অধিদপ্তরের অব্যাহত তৎপরতার সাক্ষ্য বহন করে। ২০১২ সালে পরীক্ষিত ১,৩৪২টি নমুনার মধ্যে ৩৪টি, ২০১৩ সালে পরীক্ষিত ১,৩৩২টি নমুনার মধ্যে ৪৯টি, ২০১৩ সালে পরীক্ষিত ১,৩৮৮টি নমুনার মধ্যে ২৩টি এবং ২০১৫ সালে পরীক্ষিত ১,৩৪৩টি নমুনার মধ্যে ৭টি নমুনা নন-কম্প্লায়েন্ট হয়। নিম্নের চিত্রে ২০১২-২০১৫ সালে NRCP কার্যক্রমের নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার শতকরা হার হ্রাসের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয়।

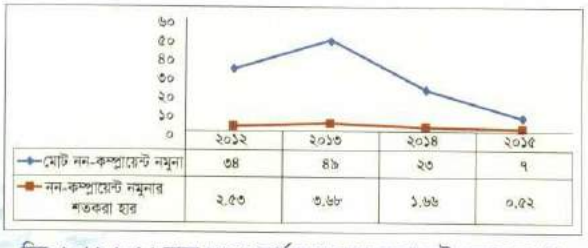

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
মোট নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনা	৩৪	৪৯	২৩	৭
নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার শতকরা হার	২.৫৩	৩.৬৮	১.৬৬	০.৫২

চিত্র: ২০১২-২০১৫ সালে NRCP কার্যক্রমের নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার সংখ্যা

আরএএসএফএফ নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা হ্রাস
(Reduction in number of RASFF consignments)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে রপ্তানিকৃত কোনো খাদ্য দ্রব্যের কনসাইনমেন্ট কোন্ কারণে নন-কম্প্লায়েন্ট হলে তার সম্পর্কে র‍্যাপিড অ্যালার্ট জারি করা সংক্রান্ত নোটিফিকেশন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এটি RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) নোটিফিকেশন হিসেবে পরিচিত। নিম্নের চিত্রে বিগত ২০০৫ হতে ২০১৫ সালের বাংলাদেশ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে রপ্তানিকৃত মৎস্যপণ্যের RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

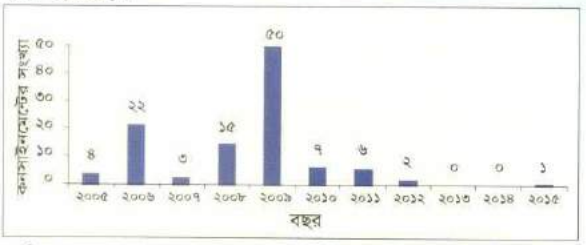

চিত্র : ২০০৫ হতে ২০১৫ সালের RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা

উপরের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০৫ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে ২০০৯ সালে সর্বোচ্চ ৫০টি মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, Brussels-এর একটি ল্যাবরেটরির ত্রুটিপূর্ণ প্রটোকল ব্যবহার করে চিংড়ি নমুনা পরীক্ষা করায় ২০০৯ সনে নন-কম্প্লায়েন্ট কনসাইনমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ২০০৯ সনের পর হতে RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্টের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমতে থাকে এবং ক্রমশ কমতে কমতে ২০১৩ সালে তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। ২০১৪ সালেও কোন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত হয়নি। ২০১৫ সালে ১টি মাত্র মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত হলেও তা কোনো ক্ষতিকারক দূষিত পদার্থ বা জীবাণুর উপস্থিতির জন্য RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত হয়নি; এটি কোল্ড চেইনের ত্রুটির কারণে RASFF নোটিফিকেশনভুক্ত হয়।

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি
(Capacity building of quality control laboratories)

নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিত করতে হলে রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের পণ্যের প্রাক-রপ্তানি পরীক্ষণ ও স্বাস্থ্যকরত্ব সার্টিফিকেট প্রদান অনেক আমদানিকারক দেশের অবশ্য পালনীয় শর্ত। আর এ শর্ত পূরণে আধুনিক যন্ত্রপাতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি, প্রশিক্ষিত জনবল এবং উপযুক্ত পরীক্ষণ পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের পণ্যের প্রাক-রপ্তানি পরীক্ষণ ও NRCP নমুনার পরীক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এ তিনটি আন্তর্জাতিকমানের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ তিনটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি International Standard

সারণি: মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের পরীক্ষণ প্যারামিটার

অণুজীবতাত্ত্বিক পরীক্ষণ প্যারামিটারসমূহ

- স্টান্ডার্ড প্লেট কাউন্ট (SPC)
- টোটাল কলিফর্ম (Total coliforms)
- ফিকাল কলিফর্ম (Faecal coliforms/*E. coli*)
- *Salmonella* spp.
- *Vibrio cholerae*
- *Vibrio parahaemolyticus*
- *Staphylococcus aureus*
- *Listeria monocytogenes*
- *Shigella* spp.

রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষণ প্যারামিটারসমূহ

- অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ
  - নাইট্রোফুরান মেটাবোলাইটস (AOZ, AMOZ, AHD, SEM)
  - ক্লোরামফেনিকল
  - মেট্রোনিডাজল
  - টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন
- রঞ্জক পদার্থসমূহ (ম্যালাকাইট গ্রিন ও লিউকোম্যালাকাইট গ্রিন, ক্রিস্টাল ভায়োলেট ও লিউকো ক্রিস্টাল ভায়োলেট)
- অ্যাহ্লেলমেন্টিক্স (ফ্লুবেনডাজল, মেবেনডাজল, ফেনবেনডাজল)
- মিথাইলটেস্টোস্টেরন (MTS), ডাই ইথাইল স্টিলবেস্টেরল (DES)
- টোটাল ভোলাটাইল বেসিক নাইট্রোজেন (TVBN)/ ট্রাইমিথাইল অ্যামাইন (TMA)
- হিস্টামিন
- ভারী ধাতুসমূহ (As, Cd, Hg, Pb & Cr)
- ফিল্‌থ (Filth)
- ফরমালিন
- মৎস্য খাদ্যের প্রক্সিমেট কম্পোজিশন
- ফসফেট লবণসমূহ
- আর্দ্রতা

Organization এর বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত। এ তিনটি ল্যাবরেটরির বিভিন্ন প্যারামিটারের পরীক্ষণ পদ্ধতিসমূহ ISO/IEC 17025:2025 অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত। এ ল্যাবরেটরিসমূহে যে সব প্যারামিটারের পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে তা উপরের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। এ সারণিতে উল্লেখিত পরীক্ষণ প্যারামিটারসমূহ ছাড়াও এ সকল ল্যাবরেটরিতে কীটনাশকের অবশেষ ও মাইকোটক্সিন পরীক্ষণ পদ্ধতির মেথড ভ্যালিডেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ সকল প্যারামিটারের পরীক্ষণের নিমিত্ত এ তিনটি ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার তালিকা পাশের সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি: মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে স্থাপিত বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির তালিকা

যন্ত্রপাতির নাম	যন্ত্রপাতির সংখ্যা (টি)			
	মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকা	মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম	মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, খুলনা	মোট (টি)
Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS-MS) machine	৩	১	২	৬
Gas Chromatography - Mass Spectrometry - Time of Flight (GC-MS-(TOF)) machine	১	১	-	২
Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) machine	-	১	১	২
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) machine	১	২	২	৫
Atomic Absorption - Spectroscopy (AAS) machine	-	১	১	২
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) machine	১	১	-	২
Polymerase Chain Reaction (PCR) machine	১	১	১	৩
Kjeldahl Digester & Distiller machine	১	-	-	১
DUMAS Nitrogen (Protein) Analyzer machine	১	-	-	১
Fiber Extractor machine	১	-	-	১
Lipid Extractor machine	১	-	-	১
Near-Infrared Spectroscopy (NIR) machine	১	-	-	১

চিত্র: মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত LC-MS-MS মেশিন

চিত্র: মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত GC-MS (TOF) মেশিন

চিত্র: মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত ICP-MS মেশিন

পূর্ব পৃষ্ঠার সারণিতে উল্লেখিত মেশিনসমূহ পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারামিটারের টেস্ট পরিচালনায় মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে নিয়োজিত অ্যানালিস্টদের দেশে-বিদেশে হাতে-কলমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রত্যেকটি ল্যাবরেটরি প্রতিবছর বিভিন্ন টেস্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। নিরন্তর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তঃল্যাবরেটরি নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। ফলে পরীক্ষণ সক্ষমতার বিচারে মৎস্য অধিদপ্তরের তিনটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবেরেটরি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ল্যাবরেটরির সমকক্ষতা অর্জন করেছে।

উপসংহার (Conclusion)

নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হ্যাচারি পর্যায়ের জন্য মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ জারি ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। 'চিংড়ি হ্যাচারির জন্য অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা' প্রণয়ন করা হয়েছে। চাষ পর্যায়ে মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১ জারি ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারি এবং মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কারখানা, আমদানীকারক ও বিপণনকারীদের লাইসেন্সের আওতায় আনা হয়েছে। 'মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, আমদানী ও বিপণন বিষয়ে প্রতিপালনীয় দিকনির্দেশনা' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মাছচাষে মেডিকেটেড ফিড-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও এ বিষয়ক চাষি সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মৎস্য চাষিদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চাষিদেরকে 'পুকুর রেকর্ড বুক' সরবরাহ করা হয়েছে। ট্রেসিবিলিটি (traceability) নিশ্চিত করতে প্রায় ২,০৭,০০০টি চিংড়ি ও ৯,৬২৪টি সাদা মাছের খামার নিবন্ধন করা হয়েছে। রোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় বাগদা চিংড়ির পিসিআর পরীক্ষার পাশাপাশি Specific Pathogen Free (SPF) ব্রুড আমদানি করা হয়েছে ও এ সকল ব্রুড হতে উৎপাদিত পিএল চাষ পর্যায়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। চাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। মাছচাষে ভেটেরিনারি ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং টীম গঠন করা হয়েছে এবং এর অবৈধ ব্যবহার প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার প্রয়াসে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) প্রয়োগ করা হচ্ছে। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট ডিপো, আড়ত, বরফ কল, সরবরাহকারী, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাসম্পন্ন সামুদ্রিক মাছ আহরণ ট্রলার, নন-প্যাকার রপ্তানিকারক ইত্যাদি সকল স্থাপনার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এ সকল স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছচাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনা কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত 'Fish and Fishery Products Official Controls Protocol' প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হচ্ছে। নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদন হতে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত এ সকল আইন-বিধি-বিধান-নির্দেশিকা কঠোর ও যথাযথভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণের পাশাপাশি সফলভাবে NRCP বাস্তবায়ন, NRCP ও প্রাক-রপ্তানি নমুনা পরীক্ষণে মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের ফলে NRCP নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার সংখ্যা ও রপ্তানিকৃত নন-কম্প্লায়েন্ট কনসাইনমেন্টের সংখ্যা হ্রাসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত 'EC/2260/2015' জারি করা হয়েছে। জাতি হিসেবে এ অর্জন অনন্য। সম্মিলিত প্রয়াসে এ অর্জন ধরে রাখতে হবে।

[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৪]উপপরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

স্বাদুপানির কুঁচিয়ার নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

Controlled Breeding and Nursery Technique of Freshwater Kuchia

ড. ডেভিড রিন্টু দাস[১], সোনিয়া শারমীন[৩] ও মোঃ মাহমুদুর রহমান[৩]

Abstract

Monopterus cuchia is a common freshwater species, which is known as mud eel. It belongs to the family Synbranchidae under the order Synbranchiformes. It is a long snake-like fish with a smooth, slimy and scale-less skin commonly found in the freshwater of Bangladesh, Pakistan and all over India. They often spend their day time hiding under mud, stone and burrowing in hole. They can thrive in adverse environmental conditions such as low oxygen level, high temperature and shallow water. *M. cuchia* have the remarkable ability to distend their respiratory air-sac for gaseous exchange. Breeding season of *M. cuchia* is summer and spawn during month of April-June which is found to be peak at May. It was found that fry reared with the stocking density of 75 fry/m^2 gives the best performance in terms of growth (5.889 ± 0.248 g) and survival (94%). For grow-out in cistern condition, 5 Juveniles/m^2 stocking density and fed with earthworm slice gives better growth and survival rate. The tribal people and a few minorities group of Bangladesh takes it as food fish. It is commercially important due to its high value in export markets. It is now over exploited from the natural waterbodies mainly for export. Once it was available in the inland waters of Bangladesh, but in recent years its availability has been decreased significantly due to over exploitation. The broods and breeding grounds of *M. cuchia* are decreasing day by day. Continuation of the current situation will bring the species in extinct condition. Artificial propagation, development of nursing and culture technologies is very important for the conservation of this commercially important species.

চিংড়ি ও কাঁকড়ার পরে বাংলাদেশে কুঁচিয়া রপ্তানির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কুঁচিয়া আদিবাসি সমাজ ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনপ্রিয় সুস্বাদু খাদ্য। বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন- ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে কুঁচিয়া পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সিলেট, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি জেলার বিল, হাওর, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, ডোবা, মজাপুকুর, ক্ষেতের আইল ও জলজ আগাছাযুক্ত স্যাঁতসেঁতে ঝোপঝাড়ে প্রচুর পরিমাণে কুচিয়া পাওয়া যায়। আমাদের দেশে একসময় জলজ পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে কুঁচিয়া পাওয়া গেলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ যথা- ভৌগোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তনে অতিরিক্ত খরা, জলাভূমি ভরাট, অপরিকল্পিত স্লুইসগেইট বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, জলাভূমি কৃষি ভূমিতে রূপান্তর, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, অতিআহরণ ইত্যাদি কারণে কুঁচিয়ার আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র নষ্ট হওয়ায় ক্রমশ এর পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাছাড়া জলাশয় থেকে অতিআহরণের কারণে যেমন আমাদের জলজ জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সাথে সাথে অদূর ভবিষ্যতে এ প্রজাতির মাছটি বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন জরিপে জানা যায় যে, বাংলাদেশের চার প্রজাতির কুঁচিয়া পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৩ প্রজাতির কুঁচিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। রপ্তানিকৃত তিন প্রজাতির কুঁচিয়ার মধ্যে মাড ইল/স্বাদুপানির কুঁচিয়া *Monopterus cuchia* অন্যতম। প্রতিবছর এ প্রজাতির কুঁচিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে আহরণ করে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ফলে কুঁচিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর বগুড়ার সান্তাহারস্থ প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, গবেষণার মাধ্যমে কুঁচিয়ার নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। কুঁচিয়া মাছ একটি চমৎকার খাদ্যমান সম্পন্ন খাবার। এতে আমিষের পরিমাণ বেশি। প্রতি ১০০ গ্রাম কুঁচিয়ায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন ও ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়, যেখানে অন্যান্য সাধারণ ১০০ গ্রাম মাছ হতে পাওয়া যায় ১১০ কিলোক্যালরি শক্তি। তাছাড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠী কুঁচিয়া ব্যাথানাশক, রক্ত উৎপাদক ও হজমশক্তি বর্ধনকারী হিসেবে খেয়ে থাকে।

কুঁচিয়ার মাছের প্রজনন বৈশিষ্ট্য
(Breeding habit of kuchia)

কুঁচিয়া বছরে একবার প্রজনন করে। কুঁচিয়া গর্তের মধ্যে ডিম দেয় এবং গর্তের মধ্যেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। একটি পরিপক্ব ৩০০-৪০০ গ্রামের স্ত্রী কুঁচিয়া গড়ে ২০০-২৫০টি ডিম দেয়। কুঁচিয়ার ডিম কমলা বর্ণের ও আঠালো হয়, অর্থাৎ একটির সঙ্গে অপরটি ভুট্টার দানার মত লেগে থাকে। কুঁচিয়ার ডিম একসাথে পরিপক্ব হয় না বলে একবারে সব ডিম ছেড়ে দেয় না। পর্যায়ক্রমে ১-২ মাসের মধ্যে সব ডিম ছেড়ে দেয়। কুঁচিয়ার ডিম পাড়ার তিন দিনের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভি বের হয়, ৪ দিন পর লার্ভির ডিম্বথলি নিঃশেষ হয় এবং এর ৮ দিন পর কুঁচিয়ার বাচ্চা গর্ত ছেড়ে বের হয়। প্রজননকালে মা কুঁচিয়া হিংস্র স্বভাবের হয়, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনুভূত হলে ডিম ও লার্ভি মুখে নিয়ে নেয়। পুকুরে একটি কুঁচিয়ার গর্তে গড়ে ১৫০-২০০টি বাচ্চা পাওয়া যায়। কুঁচিয়ার লার্ভি কালো ও বাদামি বর্ণের হয়।

কুঁচিয়ার নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ও পোনা লালন কলাকৌশল
(Controlled breeding and nursery of kuchia)

ব্রুড কুঁচিয়া সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা: প্রজননের জন্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কুঁচিয়া সংগ্রহ করে তিন মাস (জানুয়ারি-মার্চ) পুকুরে পরিচর্যার মাধ্যমে ব্রুড কুচিয়া উৎপাদন করা হয়।

ব্রুড প্রতিপালন পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি: পুকুরের আয়তন ৫-১০ শতাংশ হলে ব্যবস্থাপনা সুবিধা হয়। পুকুর শুকিয়ে চুন (১ কেজি/শতাংশ), ইউরিয়া (০.১০ কেজি/শতাংশ), টিএসপি (০.০৭৫ কেজি/শতাংশ) ও গোবর (৮ কেজি/শতাংশ) প্রয়োগ করে পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। কুঁচিয়া যেহেতু গর্ত করে অন্যত্র চলে যায়। তাই পুকুরের তলায় আড়াআড়ি (প্রায় ২ ফুট) এবং পাড়ের দিকে আনুভূমিক (প্রায় ২ ফুট) মাটি সরিয়ে নাইলনের নেট বিছিয়ে দিতে হবে। পুকুরে পানির গড় গভীরতা ১-১.৫ ফুট রাখতে হবে। অবাঞ্ছিত প্রাণীর উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের চারদিকে নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। কচুরিপানা ও হেলেঞ্চা সহযোগে শক্ত-নরম কাদামাটির জলাভূমি/বিলের ন্যায় পুকুরে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।

পরিপক্ব কুঁচিয়া মজুদ: সংগ্রহকৃত কুঁচিয়া সাথে সাথে পুকুরে না ছেড়ে মজুদ পুকুরের পানির সাথে ১-২ দিন প্লাস্টিকের ড্রাম অথবা চৌবাচ্চায় রেখে খাপখাইয়ে নিলে ভালো হয়। সুস্থ ও সবল ১৫০-২০০ গ্রাম ওজনের পুরুষ এবং ২৫০-২৮০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী কুঁচিয়া পুকুরে প্রতি শতাংশে ৫ জোড়া (স্ত্রী ও পুরুষ) ১ঃ১ অনুপাতে মজুদ করতে হবে।

খাবার ও পরিচর্যা: কুঁচিয়া সাধারণত জীবন্ত খাবার খেয়ে থাকে। তাই নিয়মিতভাবে জীবিত খাবার যেমন- পুঁইয়া মাছ, ছোট টাকি মাছ, কার্পজাতীয় মাছের পোনা, কেচোঁ, ব্যাঙের বাচ্চা এবং কার্পিও মাছের পোনা মোট দেহ ওজনের ৫% হারে প্রতি সপ্তাহে সরবরাহ করতে হবে। এসময় নিয়মিত মজুদ পুকুরের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে পুকুরের পানি কমিয়ে/শুকিয়ে কুঁচিয়ার প্রজননক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে। সার্বিক ব্যবস্থাপনা ভালো হলে প্রজনন মৌসুমের পূর্বে ২-৩ মাস প্রতিপালন করলে কুঁচিয়া প্রজনন উপযোগী হয়।

প্রজননক্ষম কুঁচিয়া মাছ নির্বাচন: পরিপক্ব স্ত্রী কুঁচিয়া আকারে পুরুষ কুঁচিয়ার চেয়ে বড় হয়। প্রজননকালে সময় পুরুষ কুঁচিয়া সক্রিয় ও পেটের দিকে গাঢ় বাদামি বর্ণ এবং স্ত্রী কুঁচিয়ার পেট স্ফীত ও পেটের দিকটা লালচে-বাদামি বর্ণ ধারণ করে। পুরুষের জননছিদ্র লালচে-কালো বর্ণের এবং স্ত্রী কুঁচিয়ার লালচে বর্ণের হয়। স্ত্রী কুঁচিয়ার ওজন ৩০০-৪০০ গ্রাম এবং পুরুষ কুঁচিয়ার ওজন ২০০-২৮০ গ্রাম হলে ভালো হয়।

কুঁচিয়ার প্রজনন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা: কুঁচিয়ার প্রজনন ও হ্যাচিং (ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়া) কার্যক্রম পুকুর এবং সিমেন্টের চৌবাচ্চা উভয় পরিবেশেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পুকুরের ন্যায় চৌবাচ্চা ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হয়। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কুঁচিয়া মাছের প্রজনন পুকুর ও চৌবাচ্চা প্রস্তুত করে নিতে হয়।

প্রজনন পুকুর ও চৌবাচ্চা প্রস্তুতি: পুকুরে কুঁচিয়ার প্রজননের জন্য ৪-৫ মাস পানি থাকে এ রকম ৮-১০ শতাংশের আয়তাকার পুকুর নির্বাচন করতে হবে। পুকুরের তলায় এবং পাড়ের দিকে প্রায় ২ ফুট মাটি সরিয়ে নাইলনের নেট বিছিয়ে নিতে হবে। পুকুরে সার্বক্ষণিক ১-১.৫ ফুট পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। আয়তাকার চৌবাচ্চায় (দৈর্ঘ্য ২.৫ মি, প্রস্থ ১.৫ মি ও গভীরতা ১.০ মি) কাদা মাটির স্তর (প্রায় ১ ফুট) ও পানির গভীরতা ৩০-৩৫ সেমি হলে ভাল। জলজ আগাছা যেমন কচুরিপানা ও হেলেঞ্চা দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। অবাঞ্ছিত প্রাণী পুকুরে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য পুকুরের চারদিক নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে পুকুরে পানি প্রবেশ ও বের করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পুকুর ও চৌবাচ্চায় ব্রুড কুঁচিয়া মজুদ ও পরিচর্যা: পুকুরে নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য মার্চ মাসের শেষের দিকে পরিপক্ব ও উপযুক্ত ব্রুড (স্ত্রী ও পুরুষ) কুঁচিয়া বাছাই করে প্রতি শতাংশে ৩ জোড়া ১:১ (স্ত্রী : পুরুষ) অনুপাতে মজুদ করতে হবে এবং চৌবাচ্চায় নিয়ন্ত্রিত প্রজননের জন্য প্রতি বর্গমিটারে ২টি ব্রুড কুঁচিয়া ১:১ (স্ত্রী : পুরুষ) অনুপাতে মজুদ করতে হবে। খাবার হিসেবে পুঁইয়া মাছ, ছোট টাকি মাছ, কার্প জাতীয় মাছের পোনা, কেচোঁ, ব্যাঙের বাচ্চা এবং কার্পিও মাছের পোনা মোট দেহ ওজনের ৫% হারে প্রতি সপ্তাহে একবার সরবরাহ করতে হবে।

চিত্র: পরিপক্ব কুঁচিয়া

চিত্র: কুঁচিয়ার প্রজনন পুকুর

চিত্র: চৌবাচ্চা

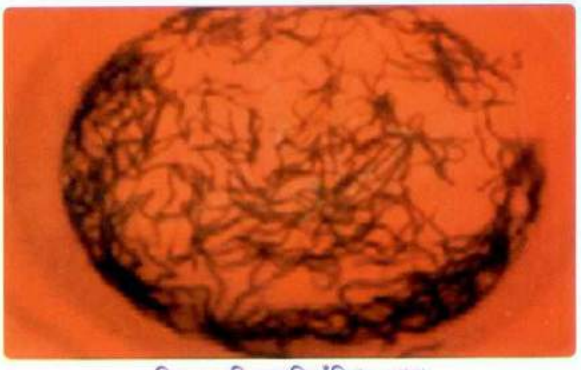

চিত্র: ১৫ দিন বয়সি কুঁচিয়ার পোনা

কুঁচিয়ার পোনা নার্সারি ব্যবস্থাপনা: স্টিলের ট্রে ও সিমেন্টের চৌবাচ্চায় কুঁচিয়ার পোনা লালন করা যায়। নিম্নে দুই পরিবেশে (ট্রে ও চৌবাচ্চা) পোনা লালন-পালন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ উল্লেখ করা হলো:

স্টিলের ট্রেতে পোনা পালন: আয়তাকার ট্রেতে পোনা লালন করলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে ট্রের দৈর্ঘ্য ১.২৫ মি, প্রস্থ ০.৭৫ মি এবং গভীরতা ০.১৫ মি হলে ভাল। গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায়, কুঁচিয়ার পোনা নার্সিং ৪৫-৬০ দিন হলে ভাল হয়। ট্রেতে লালন করার আগে ট্রের মধ্যে মাটির স্তর (৪-৫ সেমি), পানি ও কচুরিপানা দিয়ে পোনার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে। ট্রের মধ্যে পানির গভীরতা হবে ০.২৫ ফুট। ছোট অবস্থায় কুঁচিয়ার বাচ্চার জন্য জলজ উদ্ভিদ বিশেষ করে কচুরিপানা একটি ভালো সাবস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে। কুঁচিয়ার বাচ্চা কচুরিপানার শিকড়ের মধ্যে লেগে থাকে। এছাড়া কচুরিপানা থাকলে পানি ঠান্ডা থাকে। ট্রেতে অক্সিজেনের প্রাপ্যতার জন্য সার্বক্ষণিক প্লাস্টিকের পাইপের মাধ্যমে পানির ঝরনার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ট্রেতে প্রতি বর্গমিটারে ৭৫-১০০টি কুঁচিয়ার বাচ্চা মজুদ করলে পোনার বৃদ্ধি ভাল পাওয়া যায়। পোনার খাবার হিসেবে জুওপ্লাংকটন ও কেঁচোর জুস উত্তম খাবার হিসেবে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এ সময় পোনার দেহ ওজনের ৫০-২০% হারে প্রতিদিন ২ বার (সকাল ও সন্ধ্যায়) খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

সিমেন্টের চৌবাচ্চায় পোনা পালন: আয়তাকার সিমেন্টের চৌবাচ্চায় (দৈর্ঘ্য ২.৫ মি, প্রস্থ ১.৫ মি ও গভীরতা ০.৭৫ মি) কুঁচিয়ার পোনা নার্সিং করা সুবিধাজনক। চৌবাচ্চায় নার্সিং করার ক্ষেত্রে ট্রের মতো কাদা মাটির স্তর (৫-৬ সেমি), পানি ও কচুরিপানা দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে। চৌবাচ্চায় পানির গভীরতা হবে ০.৪ ফুট। প্রতি বর্গমিটারে ১৫০-২০০টি কুঁচিয়ার বাচ্চা মজুদ করলে পোনার বৃদ্ধি ভাল হয়।

নার্সারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা: পোনার খাবার হিসেবে জুও-প্লাংকটন ও কেঁচোর জুস পোনার দেহ ওজনের ৫০-২০% হারে প্রতিদিন ২ বার (সকাল ও সন্ধ্যায়) প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ৩-৪ দিন পরপর ট্রের পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে। প্রতি ১০ দিন পর পর কুঁচিয়ার পোনার আকার ও ওজন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পোনার আকার ও ওজন বাড়ার সাথে সাথে ট্রেতে পোনার ঘনত্ব কমিয়ে ফেলতে হবে। ট্রেতে পোনা লালনের সময় পোনার আকার ছোট-বড় লক্ষ্য করা যায়। তাই এ সময় ছোট পোনাগুলো সরিয়ে অন্য ট্রেতে স্থানান্তর করতে হবে, নইলে বড় পোনা ছোট পোনাকে খেয়ে ফেলবে। কুঁচিয়া একটি স্ব-প্রজাতিভোজী প্রাণী, তাই কুঁচিয়ার পোনার ক্যানিব্যালিস্টিক স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রেতে সবসময় খাবারের পর্যাপ্ততা থাকতে হবে। ট্রেতে নার্সিং শেষে কুঁচিয়ার পোনাকে অন্যত্র বা মজুদ পুকুরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

কুঁচিয়ার প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে পরামর্শ: উপযুক্ত ব্রুড বাছাই ও ব্যবস্থাপনা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে পোনা উৎপাদনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়। পরিমিত পরিমাণে জীবন্ত খাবার প্রয়োগ ব্রুড কুঁচিয়ার যৌন পরিপক্কতা সঠিকভাবে আনয়ন করে। পুকুরে অবাঞ্ছিত প্রাণী প্রবেশ রোধে পুকুরের চারদিক নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। প্রজননের জন্য ব্যবহৃত পুকুর ও চৌবাচ্চার মাটি অবশ্যই এঁটেল-দোঁআশ হতে হবে। এ মাটিতে কুঁচিয়ার গর্ত তৈরিতে সুবিধা হয়। কুসুমথলেযুক্ত পোনা কখনোই সংগ্রহ করা ঠিক নয়। কারণ কুসুমথলেযুক্ত পোনার বাঁচার হার কম। কুসুমথলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পোনা সংগ্রহ করতে হবে, নইলে বড় কুঁচিয়া পোনা খেয়ে ফেলতে পারে। নার্সিং এর সময় কুঁচিয়ার পোনার আকার ছোট-বড় লক্ষ্য করা যায়। তাই এ সময় ছোট পোনাগুলো সরিয়ে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে; নইলে বড় পোনা ছোট পোনাকে খেয়ে ফেলবে। কুঁচিয়া একটি ক্যানিব্যালিস্টিক স্বভাবের প্রাণী। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার সরবরাহ না করলে সবল কুঁচিয়া দুর্বলটিকে খেয়ে ফেলবে।

উপসংহার (Conclusion)

বিএফআরআই ২০১৪ সালে মার্চে প্লাবনভূমি উপকেন্দ্রে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি *Monopterus cuchia* এর কৃত্রিম প্রজনন এবং খাদ্য ও খাদ্য অভ্যাস বিশ্লেষণ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি বিশেষ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির আওতায় নতুনভাবে শুরু করা হয়। কুচিয়ার গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত কাজে লাগিয়ে দেশে কুঁচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ করলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক কুঁচিয়ার উপর চাপ কামিয়ে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

[১] উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাস্তাহার, বগুড়া
[২] বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাস্তাহার, বগুড়া
[৩] বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাস্তাহার, বগুড়া

বাংলাদেশে কাঁকড়া চাষ

Crab Culture Practice in Bangladesh

ড. বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী

Abstract

Traditional mud crab (*Scylla serrata*) culture has been practiced in Bangladesh based on capture and fattening of juvenile from the wild. Now mud crab is recognized as a valuable export commodity. It has been harvested in greater Khulna, Barisal and Chittagong regions. Based on the increasing demand of gravid female in the South-East Asian countries, a sustainable aquaculture technology has been developed. Culture of juvenile crab (nursery) in pen and cage is now practicing in some selected areas of Bangladesh. This culture technology and production performance changed the socio-economic condition of the adopted communities and the fellow farmers also became interested to practice this kind of crab fattening. Department of Fisheries is implemening a project for the development of culture and management technique of crab in the selected areas of coastal region of Bangladesh. Based on the lessons learnt from the culture practice and Indegenous Technological Knowledge (ITK) of stakeholders the existing culture technology will be redesigned for future expansion. The mud crab aquaculture will generate income and employment and enhance export earnings.

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, সুন্দরবন, ও চকোরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে শীলা কাঁকড়ার বিস্তৃত পরিবেশ ও খাদ্য বিদ্যমান। এ অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বা মোটাতাজাকরণ করা হয় এবং জীবন্ত কাঁকড়া রপ্তানি হয়। রপ্তানির প্রায় শতভাগই শক্ত খোলস এবং গোনাডযুক্ত কাঁকড়া। দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা পুকুর, খাল এবং নদীতে খাঁচা স্থাপন করে দিনে মাত্র এক-দুই ঘণ্টা শ্রম ব্যয় করে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করে। এশিয়ার চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত এ কাঁকড়া রপ্তানি হচ্ছে; যার চাহিদা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে ২.৫-৩.০ লক্ষ লোক কাঁকড়া আহরণ ও বিপণন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কেবল খুলনার সুন্দরবন এলাকাতেই প্রায় ৬০-৭০ হাজার নারী ও পুরুষ এ পেশার সাথে জড়িত। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উৎস। দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদেশে অধিক চাহিদা, সহজ চাষ পদ্ধতি এবং উৎপাদন চিংড়ির চেয়ে অনেকটা ঝুঁকিমুক্ত; সর্বোপরি ক্ষতির পরিমাণ কম ইত্যাদি কারণে কাঁকড়া চাষ এবং মোটাতাজাকরণ ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। কাঁকড়া ব্যবসা এবং কাঁকড়া ব্যবসায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববাজারে কাঁকড়ার চাহিদা ক্রমান্বয়েই বাড়ছে। কাঁকড়া থেকে পাওয়া রপ্তানি আয় বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২ কোটি ২৯ লাখ ডলার মূল্যের কাঁকড়া রপ্তানি হয়েছে। এসব দেশে বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ১,২০০ মে.টন কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়। অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (যেমন- ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত) বর্তমানে কৃত্রিমভাবে কাঁকড়ার

পোনা তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত এর প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যদি পোনা তৈরি করা সম্ভব না হয়; তবে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঁকড়ার প্রাচুর্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার সাথে সাথে কাঁকড়ার উৎপাদন বাড়াতে হলে হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা তৈরির কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে কাঁকড়ার প্রাপ্যতা
(Availability of crab in Bangladesh)

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দু'ধরনের কাঁকড়া বেশি পাওয়া যায়। যথা- (১) শিলা কাঁকড়া ও (২) লাল কাঁকড়া। এর মধ্যে একমাত্র চাষযোগ্য কাঁকড়া হলো শিলা কাঁকড়া।

চিত্র: শিলা কাঁকড়া *(Scylla serrata)*

চিত্র: লাল কাঁকড়া *(Scylla olivacea)*

স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া শনাক্তকরণ
(Identifying male and female crab)

স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়াকে সহজেই পৃথক করা যায়। পুরুষ কাঁকড়ার বুকের ফ্ল্যাপটি অপেক্ষাকৃত সরু। দেখতে ইংরেজি অক্ষর 'V' এর মতো। স্ত্রী কাঁকড়ার বুকের ফ্ল্যাপটি অর্ধ-গোলাকার। দেখতে ইংরেজি অক্ষর 'U'-এর মতো। একই বয়সের পুরুষ কাঁকড়ার চিমটা অপেক্ষাকৃত বড় ও ধারালো এবং স্ত্রী কাঁকড়ার চিমটা অপেক্ষাকৃত ছোট ও মসৃণ।

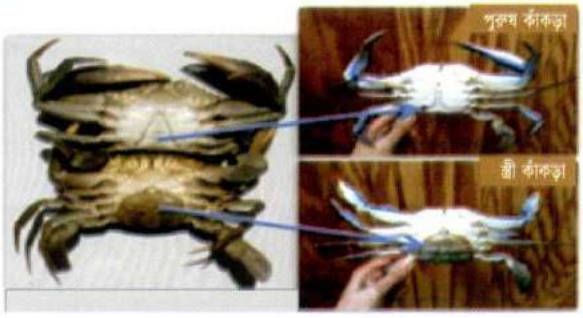

চিত্র: পুরুষ ও স্ত্রী কাঁকড়া শনাক্তকরণ

কাঁকড়ার শারীরিক গঠন
(Morphological characteristics of crab)

কাঁকড়ার শরীর মসৃণ খোলস দ্বারা আবৃত থাকে। এদের ৫ জোড়া পা থাকে যার শেষ জোড়া চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। এর দ্বারা সে সাঁতার কাটে। এরা দ্রুত চলতে পারে এবং খুব শক্ত প্রকৃতির। বড় আকারের চিমটা থাকে যা দ্বারা কোনো কিছু খুব শক্তভাবে ধরে থাকে। একবার যদি কোথাও ধরে ফেলে অর্থাৎ চিমটা আটকিয়ে ফেলে তবে আর খোলা যায় না; যদিওবা তা তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ চিমটার দ্বারা তারা আত্মরক্ষা করে থাকে। শীলা কাঁকড়া ৩০০ মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে যার ওজন ২.৫০ কেজি পর্যন্ত হয়। এদের দেহের বৃদ্ধি অবিরত হয় না। বৃদ্ধি সাধিত হয় খোলস পরিবর্তন (moulting) এর মাধ্যমে। আর খোলস পরিবর্তন হয় হরমোনের ক্রিয়ার মাধ্যমে।

কাঁকড়া চাষ
(Crab aquaculture)

কাঁকড়া চাষের প্রযুক্তি

১. কিশোর কাঁকড়ার চাষ; এবং
২. কাঁকড়া ফ্যাটেনিং।
   ক. পেনে কাঁকড়ার চাষ; ও
   খ. খাঁচায় কাঁকড়ার চাষ।

১. কিশোর কাঁকড়ার চাষ

স্থান নির্বাচন: যেহেতু চাষযোগ্য শীলা কাঁকড়া আধা-লবণাক্ত পানিতে বাস করে আর গভীর সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে ডিম দেয় ও লার্ভা পর্যায় পর্যন্ত অবস্থান করে; সেহেতু স্থান নির্বাচনের সময় বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। বছরে ৮-১০ মাস ৫ পিপিটি'র ওপর লবণাক্ততা থাকে এমন পানির জলাশয় হলে কাঁকড়া চাষে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কাঁকড়া চাষের জন্য আদর্শ ঘের/পুকুরের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যথা:

- ঘেরে বা পুকুরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটা নদী সংলগ্ন দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটিযুক্ত এলাকা সর্বাধিক উপযুক্ত;
- পুকুরের পাড় আগাছা ও ঝোপঝাড় মুক্ত হবে;
- দিনের অধিকাংশ সময়ই যাতে সূর্যের আলো পড়ে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- পুকুরের পাড় উঁচু ও বন্যামুক্ত হবে এবং পুকুরের তলা সমান থাকবে;
- পুকুরের মাটি অম্লমুক্ত এঁটেল ও দোআঁশ হওয়াই উত্তম;
- পুকুরের তলায় ১-২% জৈব কার্বন থাকবে;
- কাদার পরিমাণ ৪-৬ ইঞ্চি হওয়া বাঞ্ছনীয়;
- কাঁকড়া ফ্যাটেনিংয়ের জন্য পানির লবণাক্ততা ৬ পিপিটির বেশি থাকতে হবে। তবে ১০ - ২৫ পিপিটি সবচেয়ে উপযোগী;
- ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে পুকুরের আয়তন ০.০৫ থেকে ০.২ হেক্টর ও গভীরতা ১.০ মিটারের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়;
- জোয়ার-ভাটার পুকুরের পানি উত্তোলন ও নির্গমনের জন্য সূক্ষ্ম ফাঁসের নাইলন জালের পাটাতনসহ পৃথক গেইট থাকলে ভালো হয়; এবং
- ফ্যাটেনিং ঘের বা পুকুরের অবকাঠামো উন্নয়ন (ঘের শুকানো, তলদেশের কাদা মাটি অপসারণ, পাড় সংস্কার ও পাড় বরাবর বানা স্থাপন ইত্যাদি) ও পুকুর প্রস্তুতি (চুন প্রয়োগ, পানি উত্তোলন, সার প্রয়োগ ইত্যাদি) ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

চিত্র: কিশোর কাঁকড়া চাষ

চিত্র: কিশোর কাঁকড়া

পুকুর/ঘের প্রস্তুতি: পুকুর/ঘেরের সার্বিক প্রস্তুতির জন্য কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তলার কাদা অপসারণ ও মেরামত করতে হবে। পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মেরামত করতে হবে যেন রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত প্রাণী প্রবেশ না করে। তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ (পেরী) থাকলে বিষাক্ত গ্যাস (বিশেষত অ্যামোনিয়া) উৎপন্ন হয়। ফলে বিশেষ করে চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে পুকুরে যখন পানি কম এবং সূর্যের তাপ বেশি থাকে; তখন কাঁকড়ার মড়ক দেখা দিতে পারে। পুকুর/ঘেরের ওপর বড় বড় গাছের ডালপালা ও পাড়ে জঙ্গল থাকলে সূর্যের আলো কম পড়ে। ফলে পুকুরের প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, পাতা পচে গিয়ে পানিতে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে; রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা কাঁকড়া আক্রান্ত হয়। পুকুর/ঘের শুকানোর

পর ভাঙ্গা পাড় ও অসমান তলা মেরামত করতে হবে। পাড়ের জঙ্গল ও গাছের ডালপালা কেটে ফেলতে হবে এবং অতিরিক্ত কাদা প্রয়োজনমত অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে।

ছাঁকনি স্থাপনা/ মেরামত: পুকুর/ঘেরে পানি ঢুকানো ও বের করার ব্যবস্থা থাকলে উভয় পথে ছাঁকনির ব্যবস্থা করতে হবে। পানি ঢুকানোর পথের ছাঁকনিটি দু'স্তর বিশিষ্ট হতে হবে। এর প্রথমটির ফাঁস হবে ১.৫ মিমি এবং দ্বিতীয়টির ফাঁস হবে ০.৫ মিমি। পানি বের হবার পথে একটি ছাকনি থাকলেই চলে। এ ক্ষেত্রে জালের ফাঁস হবে ১.৫ মিমি। ছাঁকনির বাইরে একটি নিরাপত্তা বানার ব্যবস্থা রাখলে মূল ছাঁকনিটির কার্যক্ষমতা বাড়বে। পুরাতন ছাঁকনি পুকুর/ঘের প্রস্তুতকালেই মেরামত করে নেয়া উচিত। রাসায়নিক বর্জ্যমুক্ত খালের কাছের পুকুরে/ঘেরে ছাঁকনির ব্যবস্থা রাখা ভালো। প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বদল করার সুবিধা কাজে লাগানো যায়। অবাঞ্ছিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ০.২৫ মিমি ছিদ্রযুক্ত নাইলন জাল দিয়ে ছেকে ৩০ সেমি পর্যন্ত পানি উত্তোলন করতে হবে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন পদ্ধতি: অবাঞ্ছিত পোকা-মাকড়, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ মারার জন্য পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভালো। শ্যালো পাম্প ব্যবহার করে এ কাজটি করা যায়। শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর বেশ ক'দিন ফেলে রাখতে হবে যেন তলা দিয়ে হেটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা দেবে না যায়।

চুন ও সার প্রয়োগ

- পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হয়। পিএইচের মাত্রার ওপর চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে।
- ৭ দিন পর ৫০০ কেজি/হেক্টর সরিষার খৈল প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ৪ দিন পর টিএসপি ও ইউরিয়া ৩ঃ১ অনুপাতে হেক্টর প্রতি ৩৫ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- এ সময় পানির গভীরতা থাকবে ০১ মিটার।

পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ: জলাশয়ের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ; যথা- আলো, তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব, স্বচ্ছতা, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, অম্লত্ব, ক্ষারত্ব, পিএইচ ঠিক আছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

পোনা নির্বাচন ও মজুদ এবং মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা: সমুদ্র উপকূল থেকে জোয়ারের সময় কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করতে হবে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কাঁকড়ার পোনা শক্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। বাতাসে এরা কমপক্ষে ৪-৫ দিন স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে। ফলে কাঁকড়ার পোনা পরিবহনে কোনো সমস্যা হয় না।

পোনা নির্বাচন: সুস্থ ও সবল পোনা নির্বাচন করতে হবে। প্রতিটি কাঁকড়ার ওজন ৩০-৩৫ গ্রাম হওয়া ভালো। প্রতি হেক্টরে ৫০,০০০টি কাঁকড়ার পোনা ছাড়তে হবে। মজুদকৃত পোনা একই আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল পোনা শক্তিশালী পোনার খাবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

খাদ্য প্রয়োগ

- কাঁকড়া নিশাচর প্রাণী। এরা দিনের বেলায় বিভিন্ন গর্ত অথবা অন্য কোনো কিছুর নিচে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। রাতের বেলায় তারা খাদ্যের সন্ধানে বের হয়ে আসে।
- ছোট অবস্থায় এরা জুপ্লাংকটন (ডায়াটম, রটিফার, আর্টিমিয়া ইত্যাদি) খেতে পছন্দ করে।
- এ সময়ে এরা জীবন্ত বা মাংসালো খাবার খেতে পছন্দ করে বিধায় শামুক ঝিনুকের মাংস, ছোট ছোট মাছ, মাছের টুকরা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

লক্ষ্য রাখতে হবে যেন-

- সরবাহকৃত খাবার চাহিদার তুলনায় কম না হয়। অন্যথায়, একে অন্যকে খেয়ে ফেলবে।
- দ্রুত বৃদ্ধির জন্য শামুক, ঝিনুকের নরম মাংস, ট্রাস ফিস তেলাপিয়া, ছোট চিংড়ি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- সাধারণত দৈনিক মোট দৈহিক ওজনের ৮-১০% হারে খাদ্য সরবরাহ করা ভাল।

কাঁকড়া স্থানান্তর: কাঁকড়ার পোনা তথা কিশোর কাঁকড়ার ওজন যখন ১৭৫ থেকে ১৮০ গ্রাম হবে তখন খোলস পাল্টানো বা গোনাড পরিপক্বতার জন্য ওদেরকে পেনে বা খাঁচায় মজুদ করতে হবে। যেহেতু কাঁকড়া বাতাসেও ৪-৫ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। তাই পরিবহনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা হয় না।

২. কাঁকড়া ফ্যাটেনিং

ক. পেনে কাঁকড়ার চাষ

স্থান নির্বাচন ও পুকুর প্রস্তুতি: পুকুর প্রস্তুতি, চুন প্রয়োগ, পানি বৃদ্ধিকরণ ও সার প্রয়োগ একই ধরনের।

পোনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ: কাঁকড়া ফ্যাটেনিং-এর জন্য সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চল থেকে জোয়ারের সময় পোনা সংগ্রহ করতে হবে। উপকূলীয় নদী, চিংড়ি ঘের বা ম্যানগ্রোভ এলাকা হতে অপরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়া সংগ্রহ করতে হবে। উপকূলীয় ঘের/পুকুর হতেও অপরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়া সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রকৃতি থেকে সুস্থ, সবল ও অক্ষত অবস্থায় কাঁকড়ার পোনা/অপরিপক্ব কাঁকড়া সংগ্রহ করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যাবে।

চিত্র: পেনে কাঁকড়ার চাষ

পোনা নির্বাচন: সুস্থ কাঁকড়ার দেহের বহিরাবরণ সবুজাভ-বাদামি বা নীলাভ-বাদামি রং এর শক্ত খোলস দ্বারা

আবৃত থাকে। কোনো অবস্থাতেই নির্বাচিত কাঁকড়ার পা ভাঙ্গা থাকবে না অর্থাৎ সুস্থ, সবল ও অক্ষত অবস্থায় কাঁকড়ার পোনা/অপরিপক্ব কাঁকড়া সংগ্রহ করতে হবে।

পোনা মজুদ: সুস্থ ও সবল অপরিপক্ব কাঁকড়া ১:৯ (স্ত্রী ও পুরুষ) অনুপাতে মজুদ করা ভালো। শতাংশ প্রতি ১৭৫-১৮০ গ্রাম ওজনের ১০০-১২০ টি কাঁকড়ার পোনা/অপরিপক্ব কাঁকড়া মজুদ করতে হবে।

পোনা মজুদকালীন সতর্কতা

মজুদকৃত পোনা একই আকারের হওয়া ভালো। কারণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল পোনাকে শক্তিশালী পোনা খাবার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। মজুদকৃত প্রতিটি কাঁকড়ার ওজন ১৭৫-১৮০ গ্রামের নিম্নে না হওয়া ভালো। কেননা ১৮০ বা তদূর্ধ্ব ওজনের কাঁকড়া সর্বোচ্চ গ্রেডভুক্ত হওয়ায় অধিক মূল্যে বিক্রি হয় এবং রপ্তানিতেও এ আকারের কাঁকড়ার চাহিদা বেশি। কাঁকড়া সংগ্রহ ও মজুদকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাঁকড়া সুস্থ-সবল হয় এবং এর কোনো পা বা অঙ্গ ভাঙ্গা না থাকে।

খাদ্য, খাদ্য প্রয়োগ হার এবং খাদ্যাভ্যাস: কাঁকড়া নিশাচর; তবে জোয়ারের সময় এরা দিনেও সাঁতার কেটে খাদ্য শিকার করে থাকে। কাঁকড়া চিমটা পা দিয়ে জীবন্ত খাদ্য শিকার করে। এ সময়ে এদেরকে জীবন্ত বা মাংসালো খাবার সরবরাহ করতে হবে যেমন- শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি, মাছ, ইত্যাদি। ছোট আকারের তেলাপিয়া, শামুক, ঝিনুকের নরম মাংস ও ছোট চিংড়ি বা স্বল্প মূল্যের মাছ (ট্রাস ফিস) এদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কাঁকড়ার মোট দৈহিক ওজনের শতকরা ৫ ভাগ হারে দৈনিক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন মতো খাবার প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় বা রাতে দু'বার সমহারে ভাগ করে অধিকাংশ পরিমাণ পাড় বরাবর বানার পাশে এবং অল্প পরিমাণ অন্যান্য জায়গায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ: ফ্যাটেনিং এর ক্ষেত্রে কাঁকড়ার বৃদ্ধি নয় বরং গোনাডের পরিপক্বতাই মুখ্য বিষয়। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য যথাসময়ে সরবরাহ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সরবরাহকৃত খাবার যেন চাহিদার তুলনায় কম বা বেশি না হয়। খাবারের অভাবে যেন এরা একে অন্যকে আক্রমণ করে আহত করতে বা খেয়ে ফেলতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহের ফলে ঘেরের পানি যেন নষ্ট হতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ফিডিং ট্রে তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণ খাবার সরবরাহ করে অথবা প্রতি সকালে খাবার প্রয়োগের পূর্বে বানার পাশ দিয়ে হাতিয়ে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পর্যবেক্ষণপূর্বক খাবারের চাহিদা নিরূপণ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা: কাঁকড়ার সরবরাহকৃত অতিরিক্ত বা অব্যবহৃত খাবার পচনের ফলে পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পানিতে অতিরিক্ত প্লাংকটন (অতিরিক্ত সবুজাভ পানি) আধিক্যও পানির গুণাগুণ নষ্ট করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী অতিরিক্ত তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাতের কারণেও পানির গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।

পানি ব্যবস্থাপনায় করণীয়: কাঁকড়ার পুকুরের পানির গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার ভরা জোয়ারে অথবা প্রয়োজনে নিয়মিত জোয়ার-ভাটার সময় ৩০-৪০% হারে পেন এর পানি পরিবর্তন করতে হবে। তবে অতিমাত্রায় ও ঘন ঘন পানি পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা এর কারণে পরিপক্ব কাঁকড়ার ডিম ছাড়াসহ খোলস পরিবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে; যা ফ্যাটেনিং এর লক্ষ্য ব্যাহত করতে পারে।

কাঁকড়া আহরণ: পেনে মজুদকৃত কাঁকড়ার অবস্থা ও ফ্যাটেনিং ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে সাধারণত ১২-১৮ দিনের মধ্যে কাঁকড়ার গোনাড পরিপুষ্ট হয়। হাতিয়ে অথবা টোপ (থোপা) দিয়ে প্রলুব্ধ করে ধরার পর প্রতিটি কাঁকড়াকে সূর্যের আলোর বিপরীতে রেখে তার গোনাড পরীক্ষা করে গোনাড পরিপুষ্ট কাঁকড়াকে আহরণ করতে হবে। আহরিত কাঁকড়াকে ধরার সাথে সাথে খুব সাবধানে প্লাস্টিকের ফিতা/নাইলন রশি দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। কাঁকড়ার চিমটাযুক্ত পা-সহ অন্যান্য পা যাতে ভেঙ্গে না যায় সেদিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। কাঁকড়ার পা ভেঙ্গে গেলে তার বিক্রয়মূল্য কমে যেতে পারে।

পেনে কাঁকড়া চাষে আয়-ব্যয়

(Cost-benefit of crab culture in pen)

উপকূলীয় অঞ্চলে নভেম্বর-জুন পর্যন্ত পেনে কাঁকড়া চাষে নিম্নবর্ণিত আয়-ব্যয়ের হিসেব নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সারণি: পুকুরে কাঁকড়া চাষে আয়-ব্যয় (পুকুরের আয়তন ৩৩ শতাংশ)

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	পরিমাণ/ সংখ্যা (৩৩ শতাংশের জন্য)	একক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
ক. মূলধন ব্যয়				
১	বাঁশ ও নাইলনের জাল দিয়ে বেড়া স্থাপন	২৫ মিটার	২৫০	৬২৫০
২	কাঠের গেইট	১	১১০০	১১০০০
৩	গার্ড সেড	১	৫০০০	৫০০০
৪	ইজারা মূল্য	৩৩ শতাংশ	২০০	৪০০০
৫	পাড় মেরামত	থোক	থোক	৪০০০
			উপমোট (ক)	৩০২৫০
খ. পরিচালনা ব্যয় (প্রতি উৎপাদন চক্রের জন্য)				
১	চুন প্রয়োগ	২০ কেজি	২০	৬৬০
২	ইউরিয়া	১০ কেজি	১৫	২২৫
৩	টিএসপি	১০ কেজি	৪০	৬০০
৪	কাঁকড়ার পোনা (১৮০ গ্রাম)	১৪৫ কেজি	২৫০	৭০০০০
৫	খাদ্য (৮%-৫%)	১৯০ কেজি	১০০	৩১৫০০
৬	শ্রমিক	৪০ দিন	৩০০	১২০০০
৭	অন্যান্য	থোক	থোক	৫০০০
			উপমোট (খ)	৭২২০০
			সর্বমোট ব্যয় (ক+খ)	১০২৪৫০
	প্রতি বছরে একটি চক্রে উৎপাদন		২৯৬ কেজি	
	মোট আয় (৯০০X৫০০)		৪৫০০০০ টাকা	
	নীট আয়		৪৫০০০০-১০২৪৫০=৩৪৭৫৫০	

খ. খাঁচায় কাঁকড়া ফ্যাটেনিং

পুকুর প্রস্তুতি, চুন প্রয়োগ ও পানি বৃদ্ধিকরণ ও সার প্রয়োগ একই ধরনের।

সুবিধা: ঘের বা পুকুরের তুলনায় কম সময়ে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়। প্রতি প্রকোষ্ঠে একটি করে কাঁকড়া মজুদ করা হয়। খাবারের অপচয় রোধ এবং মজুদকৃত কাঁকড়ার মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা হয় না। গোনাডের পরিপক্বতা তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা এবং বাঁচার হার সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। খাঁচায় খাবার দেয়া, আহরণ ও পরিচর্যা সহজেই করা যায়। চাষি একই জলাশয়ে যুগপৎভাবে সাদা মাছের চাষ করতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে জলাবদ্ধতায় সৃষ্ট স্থানে খাঁচা স্থাপনের মাধ্যমে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং আপদকালীন জীবিকা নির্বাহে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘের/পুকুরে খাঁচা স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন: উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ছোট ছোট পুকুরে (০.০৫-০.২ হেক্টর ও গভীরতা ১-১.৫ মি) এবং ঘেরে বাঁশের বানা স্থাপন করে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়। কাঁকড়া ফ্যাটেনিং পুকুরে জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে লবণাক্ত পানি পরিবর্তনের সুযোগ থাকতে হবে। বছরে ৮-১০ মাস ৫-৬ পিপিটির উর্ধ্বে লবণাক্ততা থাকে এ রকম স্থান কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর জন্য উপযোগী। উপকূলীয় লবণাক্ত নদী বা শাখা নদী এবং ম্যানগ্রোভ এলাকায় ভাসমান খাঁচা স্থাপন করে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়। অল্প স্রোতবিশিষ্ট জলাশয় খাঁচায় কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর জন্য অধিক উপযুক্ত।

মাটির ও পানির গুণাবলি: পানির গুণাবলি, পুকুর/ঘের প্রস্তুতি, চুন প্রয়োগ ও পানি উত্তোলন ও সার প্রয়োগ একই রকম।

পানিতে খাঁচা স্থাপন: উপকূলীয় অঞ্চলে নদীর কম স্রোতময় অংশে পুকুর/ঘেরে বাঁশের খাঁচা স্থাপন করতে হবে। খাঁচার চারপাশে শক্ত বাঁশ/কাঠের খুটি পুঁতে দিতে হবে এবং প্রয়োজন কয়েকটি প্লাস্টিকের ড্রাম খাঁচার উপরিভাগে বিভিন্ন স্থানে বেঁধে দিতে হবে। খাঁচা পানির ওপরে ১.৫-২.০ ইঞ্চি ভেসে থাকবে। জোয়ার-ভাটায় খাঁচা ওপরে নিচে ওঠানামা করবে। উপকূলীয় লবণাক্ত নদী বা শাখা নদী এবং ম্যানগ্রোভ এলাকায় ভাসমান খাঁচা স্থাপন করে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়। অল্প স্রোতবিশিষ্ট জলাশয় খাঁচায় কাঁকড়া ফ্যাটেনিং-এর জন্য অধিক উপযুক্ত।

কাঁকড়া মজুদ: অপরিপক্ব গোনাডসম্পন্ন, সুস্থ ও সবল, সকল পা-সহ ১৮০ গ্রাম/তদূর্ধ্ব ওজনের স্ত্রী কাঁকড়া খাঁচার প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে কাঁকড়া মজুদ করতে হবে। এটা সর্বোচ্চ গ্রেডভুক্ত এবং বিদেশে রপ্তানিযোগ্য। আবার অপরিপক্ব গোনাড-সম্পন্ন, সুস্থ ও সবল, সকল পা-সহ ১৭৫ গ্রাম ওজন সম্পন্ন স্ত্রী কাঁকড়া খাঁচার প্রতিটি প্রকোষ্ঠে মজুদ করা যেতে পারে।

খাঁচায় কাঁকড়া চাষ

খাদ্য প্রয়োগ: মাংস জাতীয় খাবার যেমন- শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি ও মাছ সরবরাহ করতে হবে। কাঁকড়ার দৈহিক ওজনের ৫% হারে দু'বেলা প্রয়োগ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা: পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় ৪-৭ দিন ৩০-৪০% হারে ঘের/পুকুরে পানি পরিবর্তন করতে হবে।

আহরণ: ১৪-৩৬ দিনের মধ্যে কাঁকড়ার গোনাড পরিপক্ব হলে এ সময় হাত দিয়ে সরাসরি বা স্কুপনেট দিয়ে বা জলাশয় হতে খাঁচা তুলে কাঁকড়া ধরতে হবে এবং আহরিত কাঁকড়াকে সাবধানে বিশেষ নিয়মে প্লাস্টিকের ফিতা/নাইলন রশি দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। ধৃত কাঁকড়াকে গ্রেডিং অনুযায়ী বাজারজাত করতে হবে।

সুপারিশমালা (Recommendation)

- কাঁকড়া চাষ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ভিত্তি স্থাপন করা;
- কাঁকড়া চাষি, ডিপো মালিক, সরবরাহকারী এবং আহরণকারীদের উপযুক্ত দক্ষ করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- পরিবেশবান্ধব কাঁকড়া চাষ উন্নয়নে সরকারি নীতিমালা এবং আইন তৈরি করতে হবে। সরকারি কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা এবং আইন প্রক্রিয়ায় পরিবেশবান্ধব কাঁকড়া চাষ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- অপচয় রোধে কাঁকড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে। হিমায়িত ও কাঁকড়ার গুঁড়া তৈরিকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন করলে কাঁকড়া রপ্তানির অর্থনৈতিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে;
- মাটি-পানি পরীক্ষাকরণের ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে;
- কাঁকড়া পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য হ্যাচারি তৈরি করতে হবে;
- জীবন্ত কাঁকড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গণ্য করে পরিবহন ব্যবস্থা সহজতর করতে হবে; এবং
- কাঁকড়া পরিবহনজনিত মৃত্যুরোধে উন্নত পরিবহন পদ্ধতির ব্যবস্থাকরণ।

প্রকল্প পরিচালক, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ ও গবেষণা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে লিফদের ভূমিকা

Role of LEAF on Aquaculture Extension

জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক[১] ও সৈয়দ মোঃ আলমগীর[২]

Abstract

The activities of DoF have been expanded a lot to meet up the growing extension demand of the nation. Special attention has been taken to transfer the developed aquaculture technology up to village level through different development projects. However, it has become very hard to keep the pace of extension activities and follow up due to withdrawal of recruited manpower from the completed project. At present, DoF has insufficient staff at Upazila level to meet up the demand of extension service. Under such circumstances, the following alternatives like local extension worker has been designated named as LEAF to reach the marginal fish farmers with extension services. The LEAF will work closely with the fish/prawn farmers hand to hand and facilitate to boost up fish/prawn production utilizing all the available resources. LEAF will not only be engaged for project activities but he will work as a bridge, messenger and facilitator between service providers (Development) and client (Farmer) in the respective union. Thus, a sustainable and accountable communication process would be developed which will ensure community participation for the development of the country, this will continue to be so even after completion of the project continues technical feedback between the LEAF and DoF extension staff at Upazila and district level would be maintained as a matter of obligatory institutional arrangements. Thus the LEAF will remain as a recipient outfit for transfer of local appropriate technology and for any other message that need to reach the fish farmers at the grass root level.

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রাম পর্যায়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, সংক্ষেপে 'ইউনিয়ন প্রকল্প' (২য় পর্যায়)। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা দক্ষতার সাথে চাষির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের অন্যতম আকর্ষণ হলো মৎস্যচাষি যেন তার পছন্দ মোতাবেক প্রযুক্তি বাছাই করে নিজে পুকুর বা চাষযোগ্য অন্যান্য জলাশয়ে প্রয়োগ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন। মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণকালে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নোত্তর প্রযুক্তির স্থায়িত্বশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবল স্বল্পতা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। বিভিন্ন রকম জলাশয়ে প্যাকেজভিত্তিক মাছচাষের উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সম্প্রসারণ পদ্ধতি। সম্প্রসারণ পদ্ধতিসমূহের ক্রমাগত উন্নয়নের সর্বশেষ রূপ হলো সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার মৎস্যচাষি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ। এ ধরনের সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যম হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে (২০০০-২০০৬) সর্বপ্রথম লিফ (LEAF)-এর নিয়োগ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এ লিফ সফল সংগঠক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। LEAF হলো Local Extension Agent for Fisheries-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলায় যাকে বলা হয় 'স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী'।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক লিফদের বাই-সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন

চিত্র: সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য অফিসে লিফদের মাসিক সভা

ইউনিয়ন প্রকল্পের 'লিফ'
LEAF at Expansion of Aquaculture Technology Services up to Union Level Project (Phase-II)

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) টি সম্প্রসারণধর্মী প্রকল্প। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মার্চ, ২০১৫ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং তা জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। দেশের ৮টি বিভাগের ৬১টি জেলার ৩৫০টি উপজেলার ৩,০০০টি ইউনিয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে স্থানীয় মৎস্যচাষি, পোনাচাষি, পোনা ব্যবসায়ী বা মৎস্য সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত উদ্যোগী যারা অন্যকে পরামর্শ প্রদানে আগ্রহী এমন এসএসসি উত্তীর্ণ এবং ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের পুরুষ বা মহিলাকে লিফ হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। লিফগণ মৎস্য অধিদপ্তরের বেতনভোগী কর্মচারী নন, তারা স্বেচ্ছাসেবী সম্প্রসারণ কর্মী। তারা সার্বক্ষণিকভাবে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত নন; তারা তাদের মূল পেশার পাশাপাশি খণ্ডকালীন হিসেবে প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত থাকেন।

সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং মৎস্যচাষ কার্যক্রমে সাধারণ পরামর্শ প্রদানে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য সম্প্রসারণ পদ্ধতি ও মৎস্যচাষ সম্পর্কে কারিগরি বিষয়ে লিফদের প্রথম ধাপে ১০ (দশ) দিনের বেসিক আবাসিক প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তীতে ২য় ধাপে আরো ০৭ (সাত) দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লিফগণের দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক যোগ্য ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হচ্ছে। লিফগণকে সম্প্রসারণ ও পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বাই-সাইকেল ও বিবিধ সম্প্রসারণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। তাদেরকে পরবর্তীতে ডিজিটাল ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং কিটও সরবরাহ করা হবে। তারা প্রকল্পের পক্ষ থেকে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব স্ব ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক মৎস্যসম্পদ জরিপকার্যে সহায়তা করেন এবং তা সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরে সরবরাহ করেন। এছাড়া ইউনিয়ন প্রকল্পের ০৯ (নয়) টি প্যাকেজভুক্ত ফলাফল প্রদর্শক (আরডি- রেজাল্ট ডেমোনেস্ট্রেটর), বন্ধুচাষি (এফএফ- ফেলো ফার্মার) ও সিবিজি (কমিউনিটি-বেইজড গ্রুপ) সদস্যদেরকে মৎস্য উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ও মাছচাষ কার্যক্রমে সহায়তা করেন। তারা স্থানীয় মৎস্যচাষিদেরও সাধ্যমতো পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। পরামর্শ প্রদানের বিনিময়ে সমঝোতার ভিত্তিতে তারা চাষির নিকট থেকে ফি গ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক লিফ তাদের নিজের বাড়িতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে বা কোনো জনবহুল স্থানে 'মাছচাষ পরামর্শ কেন্দ্র' স্থাপন করে চাষিদের পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। প্রকল্পের সম্প্রসারণ কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রত্যেক লিফকে মাসে ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী নেই। লিফগণ মৎস্যচাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী, বার্তাবাহক এবং প্রভাবক হিসেবে সেতু বন্ধনের কাজ করেন।

প্রকল্পে নিয়োজিত এরূপ একজন লিফ'এর সফলতার কাহিনী এখানে উপস্থাপন করা হলো।

সফল লিফ মোঃ দুলাল বেপারী এর জীবন গাঁথা
(Life story of succedful LEAF- Md. Dulal Bepari)

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার ডিএম খালী ইউনিয়নের একটি গ্রাম মাঝিকান্দি। উপজেলা সদর থেকে গ্রামটির দূরত্ব ৭ কিমি। সেই গ্রামের মৃত জব্বার বেপারীর পুত্র একজন অতিসাধারণ ব্যক্তি হলেন মোঃ দুলাল বেপারী। ৮ম শ্রেণি পাশ করার পর লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে যাওয়ায় শুরু হয় বেকার জীবন। কাজের মধ্যে ছিল বাড়ীর পাশের বিলে মাছ ধরা আর বেকার সহপাঠীদের সাথে আড্ডা দেয়া। ২০১০ সালে ইউনিয়ন প্রকল্পের লিফ হিসেবে মনোনয়ন পেয়ে স্থানীয় উপজেলা মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে শুরু করেন। প্রথমে মাছ চাষের ওপর ফরিদপুরস্থ মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে ০৭ (সাত) দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে উপজেলা মৎস্য অফিসে আবার ০৩ (তিন) দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। মনোনীত ও প্রশিক্ষিত লিফ হিসেবে তিনি ২টি পুকুরে মাছচাষ শুরু করেন।

চিত্রঃ স্থানীয় মৎস্যচাষিদের সাথে সফল লিফ মোঃ দুলাল বেপারী

মৎস্য অফিসারের পরামর্শে তিনি উক্ত পুকুরে শতাংশ প্রতি ১৬ কেজি মাছ উৎপাদন করেন। মৎস্য দপ্তরের লিফ হওয়ার সুবাদে সামাজিকভাবে তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে; মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ থাকায় তার ওপর মৎস্যচাষিদের আস্থাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫ সালে আগস্ট মাসে তিনি ইউনিয়ন প্রকল্পে পুনর্বার লিফ হিসেবে মনোনয়ন পান। তিনি এবারও মাছচাষের ওপর ফরিদপুরস্থ মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে ১০ (দশ) দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি মোট ৩টি পুকুরে কার্পজাতীয় মাছ চাষ করছেন। বর্তমানে তার পুকুরে শতাংশ প্রতি মৎস্য উৎপাদন ২০ কেজি। মাছচাষে তার উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে এলাকার আগ্রহী মৎস্যচাষিরা তার কাছে পরামর্শের জন্য আসলে তিনি সাধ্যমতো পরামর্শ প্রদান করে থাকেন এবং প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তার সাথে আলোচনাক্রমে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। তার গ্রহণযোগ্যতা বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এলাকার মানুষ এখন তাকে মৎস্য অফিসের নিবেদিত প্রশিক্ষিত সহযোগী কর্মী হিসেবে জানেন। উপজেলা দপ্তরে জনবলের সংকট থাকায় উপজেলা কর্মকর্তার সাথে বর্তমানে দুলাল বেপারী ইউনিয়ন প্রকল্পের বাইরেও অফিসের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এমনকি মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য এলাকার সর্বত্র তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র: লিফ কর্তৃক মৎস্য চাসিদের পরামর্শ প্রদান

সে দিনের অবহেলিত দুলালকে এখন সবাই সম্মান করেন। সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের কারণে তিনি এখন একজন সফল মৎস্যচাষি, সবার অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব সর্বোপরি তিনি ইউনিয়ন প্রকল্পের একজন আদর্শ লিফ।

চিত্র: লিফদের নিকট বাই-সাইকেল বিতরণ

উপসংহার (Conclusion)

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর আওতায় প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে একজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লিফ তৃণমূল পর্যায়ে মৎস্যচাষিদের সম্প্রসারণ সেবা দিয়ে আসছেন। লিফগণ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ায় সাধারণ মৎস্যচাষিরা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ও স্বল্প আয়াসে সেবা গ্রহণ করার পথ সহজতর হয়। তাদের মাধ্যমে মৎস্যচাষিরা আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সক্ষম হচ্ছেন। লিফদের আরো উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে ডিজিটাল ওয়াটার টেস্টিং কিট সরবরাহসহ অধিকতর সরকারি সহযোগিতা প্রদান করা হলে মৎস্য অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ের জনবলের অভাব অনেকখানি দূর করা সম্ভবপর হবে। সর্বোপরি লিফদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ দেশের আনাচে-কানাচের দরিদ্র মৎস্যচাষিরা মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা পেয়ে পুকুর এবং অন্যান্য চাষযোগ্য জলাশয়ে উন্নত লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। ফলে সরকারের রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে লিফগণ নিজ এলাকাতেই থেকে যাবেন। ফলে লিফদের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে অর্থাৎ চাষিরা তাদের নিকট থেকে সম্প্রসারণ সেবা পেতে থাকবেন। এভাবে দেশের ৩,০০০টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে একজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লিফের মাধ্যমে একদিকে বেকার যুবক-যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত হবে; অন্যদিকে মৎস্যচাষেও **রুপালি বিপ্লব** সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

[১]ড. জোয়ান্দার মোঃ আনোয়ারুল হক, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
[২]সৈয়দ মোঃ আলমগীর, উপ-প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

মৎস্যখাতের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ জনবল তৈরির আবশ্যকতা

Necessity for the Creation of Mid Level Skilled Manpower in Sustainable Fisheries Sector

ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার[১] ও মনিকা দাস[২]

Abstract

Fisheries sector is very important and potential for its significant contributions in the development of agrarian economy of Bangladesh. The present contribution of the fisheries sector in the national economy is much higher than its 3.69 percent share in GDP, as it provides about 60% of the animal protein intake and about 17.8 million people are engaged with this sector on full time and part-time basis for their livelihood support. Aquaculture and fisheries activities in various water bodies are now very popular among the rural people of Bangladesh. Additionally, aquaculture activities are increasing immensely to satisfy the domestic as well as global demand of fish. To ensure the sustainable development of fisheries sector as well as to achieve the target of vision 2021, it is necessary to provide skilled technical manpower. To develop mid level technical manpower, Department of Fisheries has already established one Fisheries Diploma Institute at Chandpur and has been establishing other three Fisheries Diploma Institute at Gopalganj sadar, Kishoreganj sadar and Belkuchi, Sirajganj to run Diploma-in-Fisheries course. Different Government, non-government organizations and private sectors like fish processing plants, feed mills have the opportunity to utilize and appoint Diploma Fisheries degree holder skilled manpower in the Fisheries sector. So, the manpower developed through Diploma-in-Fisheries course would render better service in fisheries sector and thus fish farmers, fishers, entrepreneurs and other related people would get better service and would earn more. Thus, it would be possible to increase the total production of the fisheries sector through the efficient utilization of skilled manpower that will be produce through Fisheries Diploma Institutes.

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২২.২১ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত থেকে এবং রপ্তানি আয়ে এ উপখাতের অবস্থান দ্বিতীয়। এদেশে রয়েছে ৪৬.৯৯ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং ১.১৮ লক্ষ বর্গ কিমি সামুদ্রিক জলসম্পদ। রয়েছে অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘি ও প্লাবনভূমি। প্রকৃতি ও পরিবেশগত অনুকূল আবহাওয়ার কারণে আবহমানকাল হতেই এ দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় মৎস্যখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের প্রায় ১১% লোক জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্যখাতের ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে ১৫ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিকভাবে মৎস্যখাতে নিয়োজিত। এছাড়া আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মৎস্যসম্পদের বিদ্যমান উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যজাত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ ও জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা, আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছচাষ পদ্ধতির নিবিড়করণ এবং সকল ধরনের জলজ সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫০ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের বর্তমান বিদ্যমান জনশক্তির মাধ্যমে এ উপখাতের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ : সমৃদ্ধ আগামী'- এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা দুরূহ হয়ে পড়বে। কারণ, আজও বিগত ১৯৮৩ সালে ৮.৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের ৯ লক্ষ পুকুর-দিঘি তদারকির জন্য এনাম কমিটি কর্তৃক সৃজনকৃত জনকাঠামোর জনবল দ্বারা বর্তমানের প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের ২৫ লক্ষ পুকুর-দিঘিতে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই উন্নয়নের জন্য দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরির মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনকাঠামোর পরিবর্তন আজ সময়ের দাবি। বর্তমানে মৎস্য উপখাতের কার্যক্রম বিশেষ করে পুকুরে মাছচাষ, মৎস্য খামার পরিচালনা, হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, প্লাবন-ভূমিতে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি দেশব্যাপী ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তির অধিকাংশই তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। আগামী দিনে মৎস্য উপখাতের সম্ভাবনাকে অধিকতর কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ জনবল। জলজ ও মৎস্যসম্পদের এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মাথাপিছু মাছের প্রাপ্তি এবং মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। তাই উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত

করা প্রয়োজন। কর্মসংস্থান, জীবিকা নির্বাহ, দারিদ্র্য বিমোচন, জলজ পরিবেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর উন্নয়নের লক্ষ্যে এখন থেকেই সতর্ক হয়ে মৎস্যসম্পদের স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্যই মৎস্য অধিদপ্তর বর্তমানে গ্রহণ করছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে মৎস্যসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বর্তমানে ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মোট অর্থের এক বিরাট অংশ প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ, সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হচ্ছে।

মধ্যম পর্যায়ে দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা
(Necessity of skilled manpower at mid-level)

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন, অভয়াশ্রম স্থাপন, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও পোনা অবমুক্তিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশীয় মৎস্য প্রজাতি রক্ষা পাচ্ছে। এসব কার্যক্রম গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মধ্যম পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশে মৎস্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎকর্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপযুক্ত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন, চিংড়ির পিএল উৎপাদন, মুক্ত জলাশয়ে জৈব ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, সমাজভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, মৎস্য সেক্টরের মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সর্বপ্রকার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান জনবলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান বাস্তবিক পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছে। বর্ণিত অবস্থার আলোকে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান এবং গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ও মৎস্য সেক্টরের সার্বিক কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মধ্যম পর্যায়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা অত্যাবশ্যক।

মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট (এফডিআই) স্থাপন ও কোর্স চালু
(Establishment of FDI and commencement of course)

মৎস্যখাতের অমিত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থিতিশীল উৎপাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদানকে অধিকতর কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন এ খাতের অধিকতর উন্নয়ন। দেশের মৎস্যখাতে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার জন্য দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। কৃষি বিভাগে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার জন্য কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ জনবল রয়েছে যারা কৃষি খাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। কিন্তু মৎস্য বিভাগে এরূপ জনবল নেই। তাই মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন তৃণমূল পর্যায়ের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর সদরে একটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রম চালু করেছে। মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, চাঁদপুরে ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বের হয়েছে। এসব জনবল মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও বেসরকারি সংস্থায় নিয়োজিত হয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। মাঠ পর্যায়ে দক্ষ জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে মৎস্য অধিদপ্তর চাঁদপুরের অভিজ্ঞতার আলোকে আরও তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক অন্য একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮ এর আলোকে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পল্লী অঞ্চলের বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি ঘরে ঘরে চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর ও সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচিতে শিক্ষার আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন ও যুগোপযোগী তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম বিগত ২০১১-১২ অর্থবছর হতে শুরু হয়েছে যা আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও মজবুত এবং স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে যুবসমাজকে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অধিকতর সচেতন ও সম্পৃক্ত করা। প্রতিটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, অধ্যক্ষের

চিত্র: মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট গোপালগঞ্জের নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সঙ্কটে বাংলাদেশের মৎস্যখাত : জলবায়ু অভিযোজন বিষয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ

Climate Change Issues in Fisheries Sector of Bangladesh : Mainstreaming Climate Change Adaptation

ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক[১] ও মোঃ হুমায়ুন কবির[২]

Abstract

Bangladesh has been formed as the greatest deltaic at the confluences of the Ganges, Brahmaputra and Meghna rivers and their tributaries. Therefore, Bangladesh has a huge area of water resources of 4.575 million hectares and livelihoods of a good number of people depend on it. But Bangladesh has been experiencing serious environmental degradation in recent years. Several factors make Bangladesh particularly vulnerable to environmental damage due to climate change. There are many dimensions of this environmental degradation like ground water sinking and contamination, surface water squeezing and pollution, encroachment of rivers and other water bodies, deforestation, loss of biodiversity etc. Climate changes in the form of temperature fluctuations, erratic rainfall & flooding, prolonged drought, salinity intrusion, frequent cyclones, storms and tornado etc. affect aquatic ecosystems and their productivity. Higher water temperature bring changes in physiology and sex ratios of fish species, altered timing of spawning, migrations, and/or peak abundance, changes in timing and levels of productivity across marine and freshwater systems. Fisheries and aquaculture are also threatened by the secondary effects of climate change. This makes living and catching or farming fish extremely hazardous. For protecting the resources, it would require successful mainstreaming of Climate Change and Fisheries Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA) by Department of Fisheries (DoF) at all parts of mainstreaming system like policy formulation, extension of technology, project cycle management. So that, mainstreaming disaster-climate adaptation is now essential towards achieving a resilient fisheries production system.

নদীমাতৃক দেশ, বাংলাদেশ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের পলিতে গঠিত এ দেশ। এ বেসিন ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ, চীনের একাংশ, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তৃত। হিমালয় পাহাড়ের বরফ গলা পানিসহ এ বেসিনের ১.৭ মিলিয়ন বর্গ কিমি আয়তনের বিশাল এলাকার বৃষ্টির পানি অসংখ্য নদ-নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে সাগরে পতিত হয় যা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম স্বাদু পানির প্রবাহ। তাই বাংলাদেশ ৪৫.৭৫ লক্ষ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় জলসম্পদে সমৃদ্ধ এক দেশ। প্রকৃতিগতভাবে মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া যা আজ মূলত মনুষ্যসৃষ্ট কারণে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর প্রাণিকূল তথা মানুষের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছে। পৃথিবীর স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার জন্যই আজ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমধারা প্রতিরোধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণে সকলে তৎপর হচ্ছেন। দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা, মাত্রা ও অস্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধিতে দেশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন তথা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে দেশের মৎস্যসম্পদ সঙ্কুচিত হচ্ছে, কমছে বা ধ্বংস হচ্ছে আবাসস্থল, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রজনন সুবিধা, বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃত্যুহার, কমছে উৎপাদন এমনকি বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে অনেক মৎস্য ও জলজ প্রজাতি, বলা যায় দেশের মৎস্যসম্পদ সঙ্কুচিত হতে হতে আজ সঙ্কটাপন্ন। দেশের মৎস্যসম্পদের স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য মৎস্য ও জলজ প্রাণীর জন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ আজ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কম দায়ী হয়েও বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate change)

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির সম্মিলিত রূপই হলো আবহাওয়া যা অঞ্চল ও ঋতুভেদে পরিবর্তনশীল। আর দীর্ঘমেয়াদি সময়ের বা কমপক্ষে ৩০ বছরের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়ার গড় হলো জলবায়ু। এ দীর্ঘমেয়াদি সময়ের মধ্যে আবহাওয়ার গড় মানের যে পরিবর্তন হয়, তাই জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের একাধিক প্রভাবক রয়েছে। এর মধ্যে তাপমাত্রাই প্রধান। মানুষের ভোগ ও জীবন-জীবিকা উন্নয়নের নিমিত্ত গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পৃথিবীতে আসা সূর্যকিরণ গ্রিনহাউসের প্রভাবে তাপে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে

আবদ্ধ হচ্ছে, ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত ব্যাপক হারে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের আবহাওয়ার ধরন ও ঋতুবৈচিত্র্য পাল্টে দিচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমন- অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটার সম্ভাবনা, মাত্রা, তীব্রতা ও ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এসব দুর্যোগে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটছে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি হচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবিকার ওপর।

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Effect of climate change in fisheries sector)

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব প্রধানত তিন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে- প্রথমত উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব; দ্বিতীয়ত মাছচাষের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব এবং তৃতীয়ত মাছের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জীবিকায় প্রভাব।

১. উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সার্বিক মাছ উৎপাদন ও মাছের জীববৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে যা সমগ্র মৎস্যখাতের জন্য উদ্বেগজনক। উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো:

- নদীসহ সকল সংযোগ খালের নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় পানির প্রবাহ বন্ধ বা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া।
- আবাসস্থল নষ্ট হওয়া বা সংকুচিত হওয়ার কারণে প্রজনন কম হওয়ায় উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের নতুন মজুদ কম হচ্ছে।
- পানির স্বাভাবিক প্রবাহ কমে যাওয়ায় পলি জমাটের হার বৃদ্ধির কারণে বা শুকিয়ে যাওয়া এবং সংযোগ খালসমূহ বন্ধের কারণে মাছের অভিপ্রয়াণ বা স্বাভাবিক বিচরণ বিঘ্নিত হচ্ছে।
- উন্মুক্ত জলাশয়ে পানির অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি; তাপমাত্রার অতি পার্থক্য; বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণে তারতম্য হওয়ার কারণে পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির ক্রমাবনতি হচ্ছে।
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে নদীর উজানে লোনা পানির অনুপ্রবেশের ফলে স্বাদুপানির জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলের মাছের প্রজননসহ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

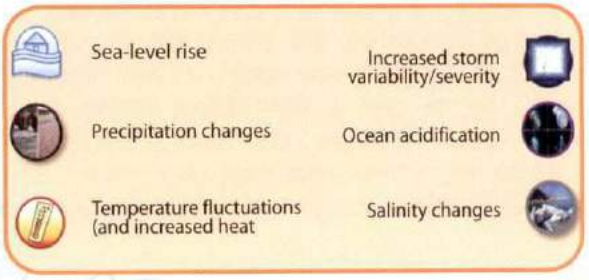

- উপরোক্ত বিবিধ কারণে মাছের পরিপক্বতায় ও প্রজননকাল পরিবর্তন হচ্ছে; এমন কি অঞ্চলভেদে কোনো কোনো মাছ তাদের প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় প্রজনন করা থেকে বিরত থাকছে।
- মাছের জীববৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে; কোনো কোনো মাছ বিপন্ন অবস্থায় আছে যেমন- মলা, টেংরা, বুজুরি, বাতাসি, শিং, পাবদা, গুলশা, আইড়, মেনি/ভেদা, রিঠা, বাঁশপাতা, কাউনিয়া, রায়েক/টাটকিনি, সরপুঁটি, জাতপুঁটি, চ্যাং, টাকি/লাটি, শোল, গজার, বাইম, গুচি,তারাবাইম ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু মাছ (কাউনিয়া, এলঙ্গ, রিটা, পাবদা, ফাসা, শিলং, বাচা এবং ঘাওড়া) নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

২. মাছচাষে প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মাছচাষে সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে যা মৎস্যখাতের জন্য সতর্কতামূলক। মাছচাষে উল্লেখযোগ্য প্রভাবের ক্ষেত্র ও কারণসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো:

➔ **হ্যাচারির উৎপাদন ব্যবস্থা:** প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি, বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিকতা, উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা এবং দিবা-রাত্র তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে হ্যাচারিতে ব্রুড মাছসহ পোনার উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো এলাকায় হ্যাচারি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

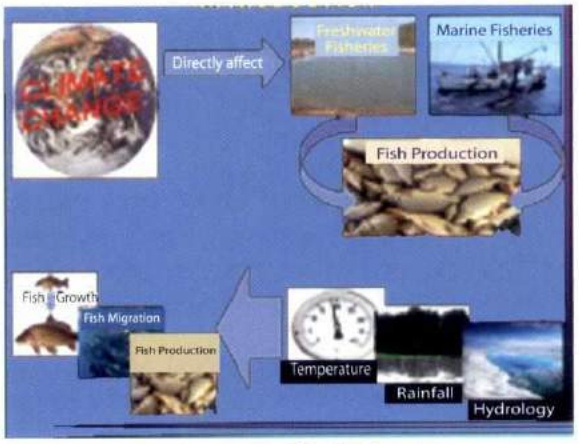

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

➔ **মাছচাষ উৎপাদন ব্যবস্থা:** পুকুরসহ চাষ উপযোগী সকল জলাশয়ের পানি ধারণক্ষমতা ও পানি ধারণকাল হ্রাস; ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া; পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির অবনতি এবং উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার অতি ওঠানামার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মাছ চাষিরা বিপাকে রয়েছেন।

৩. জীবন-জীবিকায় প্রভাব

উন্মুক্ত জলাশয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সার্বিক মাছ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ায় প্রতিদিনের মাছ আহরণের গড়হার ক্রমাবনতির ফলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী যেমন-জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা বিপন্ন। দেশব্যাপী জেলে সম্প্রদায়ের প্রায় ১৫% ইতোমধ্যেই তাদের আদি জীবিকা পরিবর্তন করে অন্য জীবিকা ধারণের চেষ্টা করছে।

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় (Actions for reducing effect of climate change in fisheries sector)

মৎস্যখাতের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় ও দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। এ খাতে স্থিতিশীল উন্নয়ন উপযোগী মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন-

- উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রজনন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ;
- নদী, খাল ও বিলসহ সকল প্লাবনভূমির সংযোগ খালসহ আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে অবাধ পানি প্রবাহের কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ;
- পানির গুণগতমান ও পরিমাণের ঘাটতি এবং তাপমাত্রার পার্থক্য মোকাবেলায় হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিরূপ পরিবেশে ও স্বল্প সময়ে চাষ করা যায় এমন মাছ চিহ্নিতকরণ এবং চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- এলাকাভিত্তিক উপযোগী স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও কার্যকর ব্যবস্থাপনায় আনয়ন;
- জলাধার নির্মাণ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ভূগর্ভস্থ পানির নিয়ন্ত্রিত উত্তোলন ও পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভূগর্ভস্থ পানি পুনঃপূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ:
- উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের কৌশল নির্ধারণ;
- লবণাক্ততা সহনশীল প্রজাতির চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন বিষয়ক অনুমোদিত অনুস্বাক্ষরিত দলিলপত্রের সাথে সমন্বয় করে নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম গ্রহণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজ ও মৎস্য অধিদপ্তরের করণীয় (Actions for reducing risks of climate change to be priotized by DoF)

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি এবং বহুমুখী। তাই প্রয়োজন এ খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার সম্ভাব্য কার্যক্রমগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা যা মৎস্য অধিদপ্তরের অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম হিসেবে নেয়া উচিত। এরূপ কিছু কার্যক্রম হলো:

১. জলবায়ু পরিবর্তনে মৎস্য সেক্টরের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
২. সকল প্রকল্প গ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাবের বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া;
৩. জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনমূলক গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ;
৪. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সেল গঠন;
৫. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা;
৬. সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মৎস্যখাতে জলবায়ু পরির্তনের ঝুঁকি, প্রভাব ও করণীয় বিষয়গুলো বাধ্যতামূলককরণ;
৭. বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কোর গ্রুপ গঠন; এবং
৮. আন্তঃমন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমন্বয় জোরদারকরণ।

মূলধারার কর্মকান্ডে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ (Mainstreaming of climate change issues)

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ সময়ের প্রয়োজনেই আজ সামনে এসেছে। বিষয়টি একটি নদীর মূল স্রোতধারার সাথে তুলনা করে সহজভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন- বিচ্ছিন্ন পানির ধারা একটি নদীর মূলস্রোতে মিশে নদীকে আরো প্রশস্ত ও তীব্রতার সাথে প্রবাহিত হতে সহায়তা করে। সহজ কথায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত পানির প্রবাহকে নদীর মূল প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি-করণ বুঝায়। একইভাবে বলা যায় মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ হলো জাতীয় জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্পভিত্তিক বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালাসহ নিজস্ব কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এখন সর্বজনস্বীকৃত জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় যা বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকরণ বা মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হলে স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচনের ফলাফল অর্জন, অবকাঠামো, জীবিকা, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষতি প্রতিরোধ, টেকসই উন্নয়ন, জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, বিপদাপন্ন অবস্থা কমানো, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো সহজতর হবে।

মানুষের জীবন ও জীবিকায় দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন সমস্যা সমাধানে সাধারণত বিক্ষিপ্তভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমগুলো মেয়াদভিত্তিক হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদে ধারণ, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ। যে কোনো খাতের

প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক কার্যক্রম বা বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ একটি চলমান ও জটিল প্রক্রিয়া যা ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়। মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও প্রয়োজনীয় কাঠামো, নীতিমালা, পদ্ধতি, বরাদ্দ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়। নতুন কার্যক্রম মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে ধাপে-ধাপে যে কাজগুলো করতে হয়:

- দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট খাতে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ যা কোনো একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রকল্প দ্বারা সমাধান সম্ভব নয়;
- চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পন্থা নিরূপণে পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সফল পন্থা নির্দিষ্টকরণ;
- প্রকল্প নির্ধারিত সফল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণের নিমিত্ত ঐ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নীতিমালা, কাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ পর্যালোচনা করা;
- বর্তমান ও প্রত্যাশিত নীতিমালা, কাঠামো ও অর্থবরাদ্দ পদ্ধতির সমন্বয় করে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যক্রমে সন্নিবেশিত করা ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া;
- প্রতিষ্ঠানের নতুন কাঠামোয় জনবল ন্যাস্ত করা ও ন্যস্তকৃত জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়া; এবং
- নিজস্ব কর্মসূচি হিসাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (Mainstreaming of climate change adaptation in DoF)

বাংলাদেশের মৎস্যখাত জলবায়ু পরিবর্তনের নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যেমন- তাপমাত্রার পার্থক্য; বৃষ্টিপাতের ধরন ও পরিমাণে পার্থক্য; জলাশয়ে পানি ধারণক্ষমতা ও পানি ধরে রাখার মেয়াদকাল হ্রাস; পলি জমাটের হার বৃদ্ধি; পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলির পরিবর্তন এবং লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি। এছাড়াও মাছের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপন্ন হচ্ছে এখাতে সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবন ও জীবিকা। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে পুষ্টি সরবরাহে, জীবিকায় এবং বৈদেশিক অর্থ উপার্জনে মৎস্যখাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখাতও মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। তাই মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ও ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে মাছের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করা বর্তমান সময়ের একটি জাতীয় জনগুরুত্বসম্পন্ন কাজ। এ কাজ ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন মৎস্যবান্ধব সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম অধিদপ্তরের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ করা হলে যেসব সুফল পাওয়া যাবে:

- নীতি নির্ধারণী থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত অধিদপ্তরের নিজস্ব কাজ হওয়ায় বিষয়টি সকল স্তরে অধিক গুরুত্ব পাবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম অধিদপ্তরের নিজস্ব কাজ হিসেবে সকলের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে। ফলে কর্মসূচি গ্রহণ, বস্তবায়ন এবং ফলাফল অর্জন সহজ হবে;
- অধিদপ্তরের নীতিমালা ও কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত থাকায় রাজস্ব বা দাতা সংস্থার অর্থায়নে কার্যক্রম গ্রহণ সহজতর হবে; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ ও স্থিতিশীল মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সহজ হবে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও জীবিকার মান উন্নত থাকবে।

উপসংহার (Conclusion)

প্রধানত মানুষ তার জীবন-জীবিকা উন্নয়নে শিল্পায়ন করায় গ্রিন হাউজ গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে পানি বরফ, তরল ও বাষ্পীয় অবস্থায় অবস্থান করে এবং তাপমাত্রা কম/বেশির জন্য বায়বীয় পদার্থের ঘনত্ব বেশি/কম হওয়ায় বায়ু প্রবাহ অব্যাহত থাকে যা চক্রাকারে পৃথিবীর সমস্ত অংশে জীবকূলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পানির প্রবাহ বিদ্যমান রেখে জৈবিক ক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। অথচ বর্তমানে তাপমাত্রার অতি বৃদ্ধিতে পৃথিবীতে পানি ও বায়ুর মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি/অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা প্রভৃতি আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়নের পর হতে অর্থাৎ বিগত ৫০ বছরে বায়ুম-লের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে দেশের মৎস্যখাত ও এ খাতের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা আজ সঙ্কটাপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের এ হার নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে দেশের মৎস্যখাত তথা জাতির জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের দায় ন্যূনতর, অথচ বাংলাদেশে এর প্রভাব গুরুতর। প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য দায়ী দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের দাবী যতই জোরালো হোক না কেন, প্রাপ্তি সামান্যতে সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ ও মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করে আত্মরক্ষার কাজ আমাদেরই করতে হবে। একই সাথে বলা যায় মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণার্থে কাণ্ডারির ভূমিকাও মৎস্য অধিদপ্তরকেই পালন করতে হবে।

[১]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালট্যান্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিরোধের কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধান
Causes of Conflicts in Shrimp Farming in South-West Coastal and Probable Solutions

অজিত কুমার পাল[১], ড. আইভিন রসকাফট[২] ও নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস[৩]

Abstract

The south-west coast of Bangladesh is dominated by shrimp farms along with involvement of different types of stakeholders'. In this area, traditional forms of agriculture such as livestock rearing, rice farming, cereal crop farming, and the alternate farming of rice and shrimp were established on indigenous knowledge. After a long period of practice, shrimp farming has also become an occupation for large numbers of stakeholders. Since the shrimp became a major export commodity of Bangladesh shrimp farming was prioratized and involved multiple stakeholders. Some of these stakeholders are now involved in conflict regarding shrimp farming. Environmental degradation, loss of traditional agriculture could be considered as major causes of this conflict. So, now it is most important to we should take measures to take care of the environment, maintain traditions and the livelihoods of stakeholders, and pursue development. A community based management, land zoning and the vertical expansion of farms, proper design and construction of farms and the invention of control measures for viral diseases could play vital role in resolving the conflict.

কৃষি জমি তথা ফসলকে জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষার জন্য ষাটের দশকের প্রথম দিকে সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঁধ নির্মাণ করে। অধিকাংশ ছোট খাল ও মাঝারি আকারের নদীসমূহ এসব আড়াআড়ি বাঁধের কারণে বন্ধ হয়ে যায় এবং সমগ্র উপকূলীয় এলাকা কয়েকটি পোল্ডারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরিণতিতে এ এলাকায় প্রথাগত চিংড়ি চাষ পদ্ধতির অবসান ঘটে। ১৯৭০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির ব্যাপক চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে চিংড়ি চাষের পোল্ডার এলাকায় আবার চিংড়ি চাষ শুরু করতে উৎসাহিত করে। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারি, উন্নয়ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা চিংড়ি চাষের দ্রুত ও অপরিকল্পিত প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যা পরবর্তীতে চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিরোধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিরোধের কারণ
(Causes of conflicts in shrimp farming in coastal area)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিরোধের কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ
(Construction of unplanned infrastructure)

প্রথমত জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ থেকে কৃষি জমি তথা ফসল রক্ষার জন্য উপকূলীয় এলাকায় নির্মিত বাঁধ এর কারণে ফলে অধিকাংশ ছোট খাল ও মাঝারি আকারের নদীসমূহের স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি ও দূষণ নিষ্কাশন সুবিধা হ্রাস পায়। প্রতিদিনের জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে বাহিত পলি উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে থিতিয়ে পড়ে ভূমি গঠন এবং উপযোগী ফসলসহ চিংড়ি চাষের ক্ষেত্র তৈরিতে অবদান রাখতে পারত। কিন্তু বাঁধের কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয়ে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের পরিবর্তে শুধুমাত্র নদীগর্ভে জমা হয়ে নদী ভরাট হতে থাকে। পোল্ডারের পানি নিষ্কাশন জন্য বাঁধের সাথে যেসব স্লুইস গেইট নির্মাণ করা হয়েছিল; নদীর তলা ভরাট হয়ে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পোল্ডারের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে এবং পোল্ডারে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া পোল্ডারের অভ্যন্তরে অবস্থিত ঘর-বাড়ির উচ্চতা বর্তমানে নদীর তলার নিচে হওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং এ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়। এভাবে অপরিণামদর্শী বাঁধ নির্মাণের কারণে পোল্ডারের অভ্যন্তরে মিঠা পানির ফসল তৈরির কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত না হওয়া এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন না ঘটায় স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং এর কারণ হিসেবে অযৌক্তিকভাবে চিংড়ি চাষকে দোষারোপ করা হয়। ফলশ্রুতিতে চিংড়ি চাষি ও অন্যান্য চাষিদের মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধতে থাকে। এছাড়া অধিকাংশ ঘেরে পার্শ্ববর্তী জমিতে লোনা পানির চুয়ানো রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (যেমন- অতিরিক্ত নালা) না থাকায় পার্শ্ববর্তী ফসলি জমিতে লোনা পানি চুইয়ে গিয়ে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত করে এবং এর অত্যাবশ্যকীয় পরিণতি হিসেবে ফসলী জমির চাষীর সাথে চিংড়ি চাষীর বিরোধের সূত্রপাত ঘটে।

চিংড়ির উৎপাদনে আকস্মিক বিপর্যয়
(Incidental loss of shrimp crop)

রোগ, পরিবেশিক চাপ ইত্যাদি কারণে চিংড়ির ব্যাপক মড়কের ফলে অধিকাংশ চাষিরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসকল হতাশাগ্রস্ত চাষিরা চিংড়ি চাষ ছেড়ে দেয় এবং ধান ও অন্যান্য ফসল ফলাতে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে যেসব চাষি সফলতা লাভ করে তাঁরা চিংড়ি চাষ অব্যাহত রাখে। এ অবস্থায়

যেসব খামারে চাষ অব্যাহত থাকে তার মালিকের সাথে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদের বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পরিবেশগত পরিবর্তন
(Environmental degradation)

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশগত বিপর্যয় শুরু মোঘল ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বন ধ্বংস করে কৃষি জমি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এরপর উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণের কারণে লবণাক্ত পানির স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং পোল্ডার এলাকায় ব্যাপক জনবসতি গড়ে উঠে। দীর্ঘ দিন এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর পর বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে পরিবেশগত পরিবর্তনের সম্মুখীন। অনেক গবেষক চিংড়ি চাষের জমিতে লোনা পানি ব্যবহারের ফলে এলাকায় মিঠা পানির ঘাটতি হয় বলে মতামত প্রকাশ করেন। কিছু চিংড়ি চাষি অবৈধভাবে বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ কেটে কাঠের গেইট তৈরি করে ঘেরে পানি ঢুকায়; যার ফলে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় সহজেই পোল্ডারের মধ্যে লোনা পানি প্রবেশ করে থাকে। এসব কারণে শর্তের শিকারে পরিণত কিছু লোক চিংড়ি চাষের বিরোধিতা করে।

আধা-লোনা পানি নিজেদের ঘেরে নিয়ে থাকে এবং অন্য চিংড়ি চাষিদের নিকট পানি বিক্রয় করে। যেসব প্রান্তিক চাষিরা তাঁদের জমিতে চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আধা-লবণাক্ত পানির সরবরাহ পায় না; তাঁরা চিংড়ি চাষের জন্য লোনা পানি গ্রহণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করার ফলে দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

জমির ইজারা মূল্য পরিশোধে অনিয়ম ও জমির মালিকদের প্রতারণা (Irregular payment of lease money and fraud done by land owner)

কিছু কিছু ঘের মালিক জমির ইজারা মূল্য নিয়মিত পরিশোধ করে না বা ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ইজারাদাতার মতামতের তোয়াক্কা না করেই ঘের পরিচালনা করতে থাকে এবং তাদের ইচ্ছা মতো ইজারা মূল্য পরিশোধ করে; যার ফলে জমি মালিকের সাথে ঘের মালিকের বিরোধ দেখা দেয়। অপরদিকে কিছু জমির মালিক ঘের মালিকদের নির্দিষ্ট মেয়াদে জমি লিজ দেয়ার পরও চিংড়ি চাষ বিরোধী প্রচারণা/চক্রান্তে সামিল হয় এবং ঘের মালিকদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি লিজ নেয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে। এভাবে তার জমি থেকে ঘের মালিককে ইজারা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই উচ্ছেদ করে অন্য কোনো প্রভাবশালী উদ্যোক্তাকে ইজারা প্রদান করে।

চিত্র: অপরিকল্পিত ঘের নির্মাণ

চিত্র: বন্য-রক্ষা বাঁধে অবৈধ সেচ-নিষ্কাশন পাইপ

চিত্র: পরিবেশগত বিপর্যয়ের চিত্র

প্রথাগত কৃষিকাজের ঐতিহ্য হারানো
(Loss of traditional agriculture)

সারা বছর লোনা পানি আটকিয়ে চিংড়ি চাষের ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আমন ধান ও দানা জাতীয় ফসল চাষে বিঘ্ন ঘটে। ফলে অধিকাংশ প্রান্তিক চাষিদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য ধান, ডাল ও তৈল-বীজের ঘাটতি দেখা দেয়। ভূমিহীন জনগণ যারা সরকারি খাস জমিতে তাঁদের গবাদিপশু চড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো অবৈধভাবে ঐসব খাস জমিতে চিংড়ি ঘের গড়ে ওঠায় তাঁদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে। প্রথাগত জীবিকা নির্বাহের পথ রুদ্ধ ও প্রধান খাদ্য শস্যের অভাবে বেশির ভাগ ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিরা চিংড়ি চাষের বিরোধিতা করে।

আধা-লোনা পানি বণ্টনের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব
(Unequal sharing of brackish water supply)

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চিংড়ি ঘের থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোনা পানি বণ্টনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সাধারণত সম্পদশালী চাষিরা পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে অনুমতি নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে স্লুইস গেইট নির্মাণ করে পার্শ্ববর্তী খাল বা নদী থেকে

চিংড়ি বিরোধী অপপ্রচার
(Propaganda against shrimp farming)

কিছু কিছু স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা দেশীয়/ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের পরিপূরক হিসেবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের দোহাই দিয়ে চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে বিদেশি অর্থায়ন আকৃষ্ট করে এবং শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। চিংড়ি চাষি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রেখে এবং সেই বিরোধ পুঁজি করে এসব বেসরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থার অবাস্তব তত্ত্ব বাস্তবায়ন করে নিজেরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। এছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রভাব বিস্তারকারী স্বার্থান্বেষী মহল চিংড়ি বিরোধী অপপ্রচারকে তাঁদের প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে যার ফলে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিরোধ প্রকট হয়।

এছাড়াও বেকারত্ব সৃষ্টি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন কৌশলের ভিন্নতা, সরকারি প্রণোদনা নিয়ে ব্যবসায়ী ও চাষিদের মধ্যে মতভেদ, রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক আরোপিত

নন-ট্যারিফ ট্রেড ব্যারিয়ার, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রান্তিক চাষিদের ঋণাত্মক উদ্বুদ্ধকরণ, ঘের নির্মাণের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণেও চিংড়ি চাষে বিরোধ দেখা যায়।

বিরোধ নিরসনের উপায়
(Measures for resolving conflict)

চিংড়ি চাষকে স্থায়িত্বশীল করে এর সুফল সমভাবে বণ্টনের স্বার্থে বিরোধ নিরসনের উপায় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ভূমির জোনিং পদ্ধতি প্রবর্তন
(Introduce zoning system for different activities)

বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ভূমির জোনিং পদ্ধতি চালু করা হলে চিংড়ি চাষের বিরোধ অনেকাংশে প্রশমিত করা যেতে পারে। এজন্য উপকূলীয় এলাকার ভৌত-রাসায়নিক, আর্থসামাজিক এবং জীব-তাত্ত্বিক প্যারামিটার সম্পর্কে ব্যাপক জরিপ কাজ পরিচালনা করা প্রয়োজন। এসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও বহুমুখী ভূমি ব্যবহার কৌশলের জন্য জোন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়
(Development of infrastructure and coordination among stakeholders)

চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়ি জোনে পর্যাপ্ত লোনা পানি (brackish Water) সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য উপযোগী স্লুইস গেইট, সরবরাহ ও নিষ্কাশন নালা পরিকল্পিতভাবে তৈরি/সংস্কার করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চিংড়ি চাষি, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রসাশনের কর্মকর্তাদের নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। যথাযথ নকশা অনুসরণ করে পর্যাপ্ত গভীরতা বিশিষ্ট ঘের নির্মাণ করা গেলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক রোধ করা ও চিংড়ি চাষ এলাকায় বিরোধ প্রশমিত করা সম্ভব। যখন চিংড়ি ঘের ও ধানক্ষেত পাশাপাশি থাকে; তখন চিংড়ি ঘেরের লবণাক্ত পানি চুঁইয়ে পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতের মাটিতে লবণাক্ততা বাড়াতে পারে এবং পরিণতিতে ধান বা দানা শস্যকে নষ্ট করতে পারে। যদি চিংড়ি ঘেরের চারিপাশে গভীর আউটলেট ড্রেন তৈরি করা হয় তবে খামারের চুঁয়ানো লবণাক্ত পানি ঐ ড্রেনে জমা হবে এবং পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতের মাটিতে লবণাক্ততা সংক্রমণ হবে না।

সমাজভিত্তিক-ব্যবস্থাপনা চালু করা
(Adoption of community-based management)

একই ওয়াটার ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে চিংড়ি চাষ ও ধান চাষ বিরোধপূর্ণ হবে না; যদি চিংড়ি চাষি ধান চাষের শুরুর সময় সীমার মধ্যে চিংড়ি আহরণ সম্পন্ন করে ঘের থেকে লোনা পানি বের করে ঘেরে নদীর স্বাদুপানি ঢুকায়। পক্ষান্তরে চিংড়ি চাষি যদি ঘের থেকে লোনা পানি বের না করে তবে পার্শ্ববর্তী ধানের জমিতে লোনা পানি সংক্রমিত হয় এবং ধানের চারা মারা যায় বা বৃদ্ধি কম হয়। এ কারণে পোল্ডার এলাকায় প্রতিটি ওয়াটার ক্যাচমেন্ট এরিয়ার জন্য সকল শ্রেণির স্টেকহোল্ডারদের (সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিসহ) প্রতিনিধি নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি (water management association) গঠন করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোল্ডার এলাকায় চাষ ও পানি ব্যবস্থাপনা করা হলে বিরোধ নিরসন সম্ভব।

পরিবেশবান্ধব পর্যায়ক্রমিক চাষ অনুশীলন
(Ecofriendly alternative farming practice)

পাল ও রসক্যাফট (২০১২) তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন মিঠা পানি সংশ্লিষ্ট (যেমন ধান ও চিংড়ির পর্যায়ক্রমিক চাষ) চাষে ফিরে যাওয়ার ফলে চিংড়ি চাষে বিরোধ হ্রাস পায়। ধান ও চিংড়ির পর্যায়ক্রমিক চাষের ফলে পরিবেশের ওপর চাপ কম পড়ে; বিধায় এটাকে পরিবেশবান্ধব চাষ বলা যেতে পারে। পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পরিবর্তনে অনাগ্রহী চাষিদের পুরাতন প্রথাগত চাষ পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার আগ্রহকে যেমন পরিতৃপ্ত করতে পারে; তেমনি চিংড়ি চাষে বিরোধ হ্রাস পেতে পারে। এছাড়াও একই সাথে গলদা ও বাগদা চাষ প্রচলন, স্টেকহোল্ডারদের পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করা; চিংড়ি চাষিদের গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা; হোয়াইট স্পট ভাইরাসজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিসিআর পরীক্ষিত ভাইরাসমুক্ত পোনা ঘেরে অবমুক্ত নিশ্চিত করা; এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট-এর মাধ্যমে নতুন প্রকল্প শুরু করার আগে সম্ভাব্যতা যাচাই; আধা-নিবিড় পদ্ধতির চিংড়ি চাষ প্রচলন; নদী ও খালের অবৈধ দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো; এবং সকলের জন্য ঘের করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে চিংড়ি চাষে বিরোধ হ্রাস পাবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল এক সময় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ছিল। কালের পরিক্রমায় দেশজ প্রযুক্তি ও কৌশলের সাথে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহারের মাধ্যমে এখানে চিংড়ি চাষ বিস্তার লাভ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশের বিপর্যয় না ঘটিয়ে কিভাবে এসমস্ত স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায় সেটা ভাবা প্রয়োজন। চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে একটি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রনয়ন করার মধ্যেই এ বিরোধের সমাধান নিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি বেশি বৃদ্ধি পায় তখন উপকূলীয় অঞ্চল লোনা পানিতে তলিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় এ এলাকায় লোনা পানির সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে এখনই পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ আবশ্যক।

[১]উপ-প্রকল্প পরিচালক, এফসিডিআই প্রকল্প (চতুর্থ পর্যায়), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]Professor, Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology
[৩] প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফআইকিউসি), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পারসে মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

Induced Breeding and Fry Rearing of Parse

ড. শ্যামলেন্দু বিকাশ সাহা[১] ও সৈয়দ লুৎফর রহমান[২]

Abstract

Green back mullet, *Chelon subviridis*, locally known as parse is a popular brackishwater fish. The high quality of flesh, high economic value and wide rang of temperature and salinity tolerance capacity, make this species popular for aquaculture in the intertidal impoundments (locally called ghers). At present, the farmers depend upon the wild source for seed. Due to indiscriminate exploytation from natural sources and some environmental reasons, the abundance of this fish is decreasing day by day. There is no alternate of supply of seed from artificial sources to conserve natural biodiversity and increase production of this fish. With the objective of producing seed in the hatchery, a study has been conducted on artificial breeding and development of nursery technology of this important fish by Bangladesh Fisheries Research Institute. The species normally breed in saline water in the sea during winter season. For breeding, matured broods were collected from brackishwater ponds. After acclimatization to water with 28-30 ppt salinity and 24-25°C temperature, both male and female broods were induced with GnRHa hormone at a single dose of 20 mg/kg body weight of fish in the deep muscle at the base of the dorsal fin. After 32-36 hour, the female released eggs. After 19-21 hour of spawning the hatchlings came out from the floating fertilized eggs. One day old rotifers were supplied to the hatchlings for first feeding. Artemia nauplli and dry powdered feed (60 μ size) were supplied to the growing fries after 15 and 17 day, respectively. Forty days old fries (2.0-2.5 cm) were transferred to the earthen nursery where they grew up to 3-4 cm. During the age of 21-27 days 80-100 μ size dry feed with 40% protein content were supplyed.

বাংলাদেশে লোনাপানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে পারসে (*Chelon subviridis*) একটি অত্যন্ত সুস্বাদু, জনপ্রিয় এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছ। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ মাছের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এ মাছ সাধারণত অগভীর উপকূলীয় জলাশয়ে, খাড়ি অঞ্চলে ও প্যারাবনের জলাশয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। মাংশাসী স্বভাবের না হওয়ায় এবং অধিক লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা সহনশীল হওয়ায় উপকূলীয় ঘেরে এ মাছ চাষের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারসে মাছের প্রজনন স্বভাব কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। প্রাকৃতিক পরিবেশে সাধারণত শীত মৌসুমে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) এ মাছ অধিক লবণাক্ত পানিতে সমুদ্রে প্রজনন করে থাকে এবং পরবর্তী জীবনধারণের জন্য পোনা লোনাপানিতে অভিপ্রয়াণ করে। চাষের জন্য বর্তমানে পারসে মাছের পোনার একমাত্র উৎস প্রাকৃতিক জলাশয়। কিন্তু নির্বিচার আহরণ ও পরিবেশগত কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে এ মাছের প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। লোনাপানির গুরুত্বপূর্ণ এ মাছের সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ সরবরাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ নিরলস গবেষণার মাধ্যমে পারশে মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছেন। বাণিজ্যিকভাবে এ মাছের চাষ সম্প্রসারণের জন্য কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

প্রজননক্ষম পারসে মাছের পরিচর্যা
(Parse brood management)

পারসে মাছের প্রজনন শীত মৌসুমে হলেও ডিসেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহ এবং ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দুই সপ্তাহ এদের সর্বাধিক প্রজনন হয়ে থাকে। প্রজনন মৌসুমের তিন মাস পূর্বে ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী ও ২০-২৫ গ্রাম ওজনের পুরুষ মাছ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে প্রতি শতাংশে ৭০-৮০টি হারে মাছ লোনাপানির পুকুরে মজুদ করতে হবে। ব্রুড প্রতিপালন পুকুরের আয়তন ২৫-৩০ শতাংশ ও পানির গভীরতা ১-১.৫ মিটার হওয়া উত্তম। ব্রুড মাছের পরিপক্বতা আনয়নের জন্য শতকরা ৩০-৩২ ভাগ আমিষসমৃদ্ধ খাবার প্রতিদিন মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ৫ ভাগ হারে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। মোট খাবার দু'ভাগ করে সকালে ও বিকালে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য ২.৫ পিপিএম হারে ইউরিয়া ও ৩.০ পিপিএম টিএসপি পনর দিন পর পর প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিমাসে একবার করে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ব্রুডের পরিপক্বতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ পারসে মাছ প্রাকৃতিক জলাশয় হতেও সংগ্রহ করে প্রজনন করা যেতে পারে।

প্রজননকার্যে ব্যবহারার্থে পানি ব্যাবস্থাপনা
(Water mManagement for breeding)

গবেষণায় দেখা যায় যে, ২৪-২৫° সে. তাপমাত্রা এবং ২৮-৩০ পিপিটি লবণাক্ত পানিতে পারসে মাছ সফলভাবে প্রজনন করে থাকে। প্রজননের জন্য প্রাকৃতিক উৎস হতে ২৮-৩০ পিপিটি লবণাক্ত পানি সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে মজুদ করতে হবে। এ লবণাক্ততার পানি প্রাকৃতিক উৎস হতে সহজপ্রাপ্য না হলে কম লবণাক্ত পানির সাথে ব্রাইন মিশ্রিত করে ২৮-৩০ পিপিটি লবণাক্ত পানি তৈরি করা যেতে পারে। এ পানি পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে বালির ফিল্টারের মাধ্যমে

ফিল্টার করতে হবে এবং জীবাণু মুক্তকরণের জন্য ১০ পিপিএম হারে ক্লোরিন মিশিয়ে ২-৩ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর অবশিষ্ট ক্লোরিন দূরীকরণের জন্য পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এয়ারেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি ক্লোরিন মুক্তকরণের জন্য প্রয়োজনবোধে পরিমাণ মতো সোডিয়াম থায়োসালফেট মিশিয়ে পর্যাপ্ত এয়ারেশন দিতে হবে। অধিকতর জীবাণু মুক্তকরণের জন্য ইউভি ফিল্টারের মাধ্যমে পানি ফিল্টার করা যেতে পারে।

প্রজননক্ষম পারসে মাছ সংগ্রহ ও হ্যাচারিতে অভ্যস্তকরণ
(Collection of mature parse brood and conditioning in hatchery)

কৃত্রিম প্রজননের জন্য সঠিকভাবে মাছের পরিপক্কতা যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথাযথভাবে যৌন পরিপক্ক না হলে হরমোন প্রয়োগ করলেও মাছ প্রজনন করবে না। সাধারণত পরিপক্ক স্ত্রী মাছের পেট ফোলা ও নরম থাকে এবং জননেন্দ্রিয় গোলাকার ও হালকা লালচে রংয়ের হয়ে থাকে (নিম্নের চিত্র)। পেটে হালকা চাপ দিলে জননেন্দ্রিয় দিয়ে হালকা হলুদ রংয়ের ডিম বেরিয়ে আসলে বুঝতে হবে যে স্ত্রী মাছ প্রজননের জন্য তৈরি হয়েছে। অপরদিকে পরিপক্ক পুরুষ মাছের জননেন্দ্রিয় পেটের সাথে মিশানো ও আকারে ছোট থাকে। পেটে হালকা চাপ দিলে পরিপক্ক পুরুষ মাছের জননেন্দ্রীয় দিয়ে সাদা রংয়ের শুক্রণু বের হয়ে আসে।

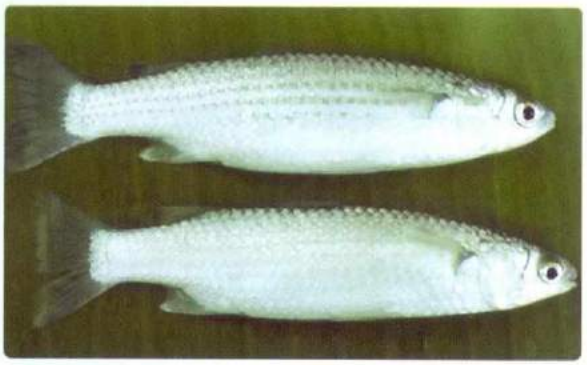

চিত্র: পরিপক্ক স্ত্রী ও পুরুষ পারসে মাছ

পুকুর হতে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ আলাদা ট্যাংকে একই পানিতে রাখতে হবে। সাধারণত ব্রুড মাছের পুকুরের পানির লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা কম থাকে। হঠাৎ তাপমাত্রা কিংবা লবণাক্ততার ওঠানামা হলে মাছের প্রজননে যাতে ব্যাঘাত না হয় সেজন্য ধীরে ধীরে অধিক লবণাক্ত পানি (ব্রাইন) মিশিয়ে এবং থার্মোস্ট্যাট সংযোজিত ইলেকট্রিক হিটারের সাহায্যে ব্রুড ট্যাংকের পানির লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা প্রজননের জন্য ব্যবহৃত পানির সমপর্যায়ভুক্ত করতে হবে।

হরমোন প্রয়োগ ও প্রজনন
(Application of hormone and breeding)

গবেষণায় দেখা যায় যে, পারশে মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য GnRHa হরমোন বিশেষভাবে কার্যকর। এ হরমোন তরল কিংবা পাউডার আকারে বিভিন্ন নামে (ওভুপ্রিম, ওভুলিন, ওভাটিড ইত্যাদি) বাজারে পাওয়া যায়। তবে তরল হরমোন ব্যবহার অধিকতর ফলপ্রদ। পারসে মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য এ হরমোন সরু সিরিঞ্জের মাধ্যমে স্ত্রী ও পুরুষ মাছের পৃষ্ঠপাখনার গোড়ায় ২০ মিগ্রা/কেজি মাছের দেহ ওজন হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে (নিচের চিত্র)। মাছের পরিপক্কতার ওপর নির্ভর করে হরমোন প্রয়োগের পরিমাণ কিছুটা কমবেশি করা যেতে পারে। হরমোন প্রয়োগের পর পুরুষ ও স্ত্রী মাছ ২ঃ১ অনুপাতে একটি ৫০০ লিটার পানির ট্যাংকে মজুদ করতে হবে। মাছের প্রজননে যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেজন্য হ্যাচারির পরিবেশ কোলাহলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাংকের পানির তাপমাত্রা যথাযথ পর্যায়ে রাখার জন্য পূর্বের ন্যায় থার্মোস্ট্যাট সংযোজিত ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার

চিত্র: ইনজেশনের মাধ্যমে হরমোন প্রয়োগ

করা যেতে পারে। হরমোন প্রয়োগের ৩২-৩৬ ঘণ্টা পর বহিঃসঙ্গমের মাধ্যমে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে। নিষিক্ত ডিম স্বচ্ছ, আকারে ৭৫০-৮৫০ মাইক্রন হয় এবং ডিমে একটি তৈলের গ্লোবিউল থাকে। এজন্য নিষিক্ত ডিম পানির উপরে ভাসমান অবস্থায় থাকে (নিচের চিত্র)। অনিষিক্ত ডিম অস্বচ্ছ এবং ট্যাংকের তলায় জমা হয়। ডিম ইনকিউবেশনের জন্য প্রজনন ট্যাংকের পানির একই তাপমাত্রা ও লবণাক্ততাসম্পন্ন আরো একটি পানির ট্যাংক তৈরি করতে হবে। প্রজনন ট্যাংকের

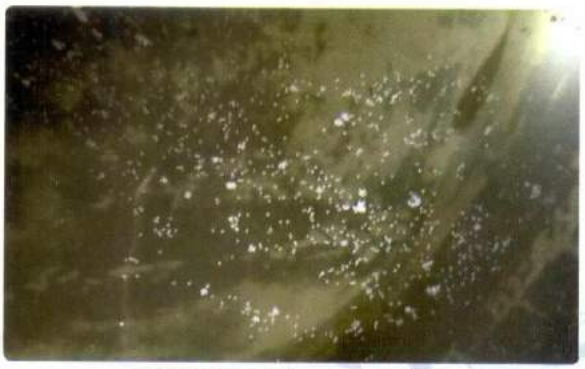

চিত্র: সদ্য স্পন করা পারসে মাছের ডিম

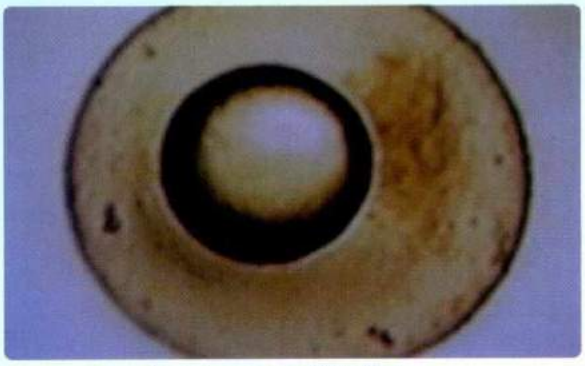

চিত্র: পরসে মাছের নিষিক্ত ডিম

ভাসমান ডিমগুলো একটি প্লেটের সাহায্যে ইনকিউবেশন ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে। প্রজনন ট্যাংক ও ইনকিউবেশন ট্যাংকে অবশ্যই এয়ারেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিষিক্ত হওয়ার ১৯-২১ ঘণ্টা পর ডিম ফুটে মাছের রেণু বের হয়। সদ্য প্রস্ফুটিত রেণু আকারে ২.০-২.৫ মিমি লম্বা হয় (নিচের চিত্র)। রেণু বের হওয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ট্যাংকের তলায় জমা হওয়া ডিমের খোসা ও অন্যান্য বর্জ্য সাইফনিং এর মাধ্যমে সরিয়ে ফেলতে হবে।

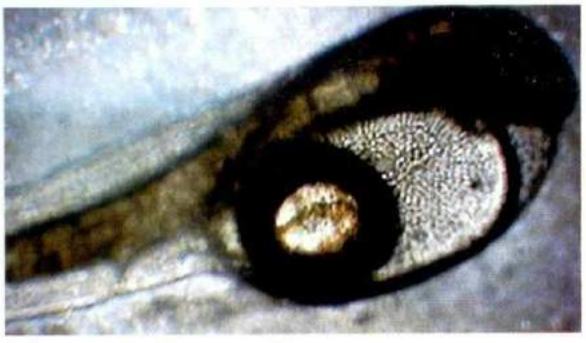

চিত্র: সদ্য প্রস্ফুটিত পারসে রেণু পোনা

রেণুপোনা প্রতিপালন
(Rearing of parse fry)

ডিমফুটে রেণু পোনা বের হওয়ার তিন দিন পর ডিম্বথলি নিঃশেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় রেণু প্রতিপালনের জন্য খাবার সরবরাহ করতে হবে। পারসে মাছের রেণু স্বাদুপানির মাছের রেণুর ন্যায় ডিমের কুসুম খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। এ অবস্থায় রেণু পোনা জীবনধারণের জন্য জীবন্ত প্রাণিকণার (রটিফার) ওপর নির্ভর করে। রেণু পোনাকে খাবারের সাথে অভ্যস্তকরণের জন্য ডিম্বথলি নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই জীবন্ত রটিফার সরবরাহ করতে হবে। এজন্য হ্যাচারিতে আলাদাভাবে রটিফার চাষ এবং রটিফার এর খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য জীবন্ত উদ্ভিদকণা (ন্যানোক্লোরপসিস) চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। একদিন বয়সের রটিফার রেণু পোনা ফোটার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দিন পর্যন্ত যথাক্রমে ৫, ১০ ও ১৫ টি/মিলি, ৫ম দিন থেকে ৯ম দিন পর্যন্ত ২০ টি/মিলি এবং ৯ম দিন থেকে ২০তম দিন পর্যন্ত ২০টি/মিলি ঘনত্বে যাতে সবসময় পানিতে বিদ্যমান থাকে সেভাবে সরবরাহ করতে হবে। একই সাথে রটিফারের খাবার জন্য ২য় হতে ২০তম দিন পর্যন্ত প্রয়োজনমত ন্যানোক্লোরপসিস সরবরাহ করতে হবে। ১৫তম দিনে পোনার সাইজ ০.৭-১.০ সেমি হয়ে থাকে (নিচের চিত্র)। এই সময়ে রটিফারের সাথে আর্টিমিয়া নপ্লি এমনভাবে সরবরাহ করতে হবে যাতে ১৫-১৯তম দিন পর্যন্ত ৫টি/লিটার এবং ২০-৩০তম দিন পর্যন্ত ৫-১০ টি/লিটার সবসময় প্রতিপালন ট্যাংকের পানিতে বিদ্যমান থাকে।

চিত্র: সদ্য প্রস্ফুটিত পারসে মাছের পোনা

এছাড়া ১৭-৩০তম দিন পর্যন্ত ১ গ্রাম/টন এবং ৩১-৪০তম দিন পর্যন্ত ৩-৫ গ্রাম/টন হিসাবে ৪৫-৫০% আমিষসমৃদ্ধ ৬০ মাইক্রন সাইজের শুকনো খাবার দৈনিক দু'বার সরবরাহ করতে হবে। ৩০ দিন বয়সের রেণু পোনা ১.৩-১.৭ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। এ অবস্থায় নার্সারিতে পোনা স্থানান্তর করা যায়। তবে এ অবস্থায় নার্সারিতে পোনা স্থানান্তর করলে

চিত্র: দিন বয়সের পারসে পোনা

মৃত্যুহার বেশি হতে পারে। তাই ৪০ দিন পর্যন্ত হ্যাচারিতে প্রতিপালন করার পর ২.০-২.৫ সেমি সাইজের পোনা নার্সারিতে স্থানান্তর করলে মৃত্যুহার কম হবে। পোনা প্রতিপালন ট্যাংকে সবসময় এয়ারেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে ৬-৯ দিন পর এয়ারেশন কমিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় পোনা মারা যেতে পারে।

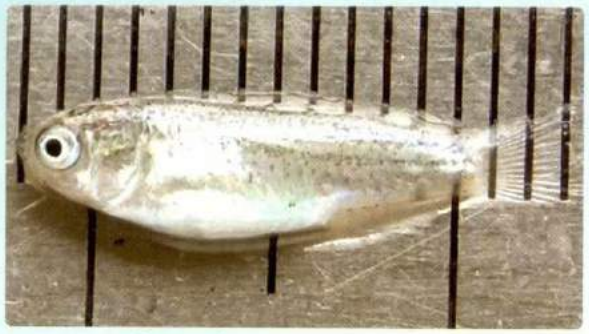

চিত্র: ৩০ দিনের পারসে মাছের পোনা

পানি পরিবর্তন
(Water exchange)

দৈনিক সাইফনিং-এর মাধ্যমে পোনা প্রতিপালন ট্যাংকের তলায় জমা হওয়া বর্জ্য পরিষ্কার করতে হবে এবং ট্যাংকের পানির একই তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার পানি দিয়ে ২-১০ম দিন পর্যন্ত ১০%, ১১-২০তম দিন পর্যন্ত ১৫%, ২১-৩০তম দিন পর্যন্ত ২৫% পানি পরিবর্তন করতে হবে। ৩০তম দিন থেকে একই তাপমাত্রার স্বাদুপানি যোগ করে প্রতিপালন ট্যাংকের পানির লবণাক্ততা ধীরে ধীরে কমিয়ে নার্সারি পুকুরের পানির সমপর্যায়ে আনতে হবে।

পারসে মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা
(Nursery management of parse)

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতি

নার্সারি পুকুরের আয়তন ৫-১০ শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। নার্সারি পুকুরের পানির লবণাক্ততা ০৩-১০ পিপিটির মধ্যে হলে ভালো হয়। তবে এর থেকে সামান্য কম বা বেশি লবণাক্ত পানিতেও রেণুপোনা লালন-পালন করা যেতে পারে। পুকুরের পানির গভীরতা ০.৬-০.৮ মিটার, পিএইচ ৭.৫-৮.৫ এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন ৪-৬ পিপিএম থাকলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। পুরাতন পুকুরের ক্ষেত্রে পানি সম্পূর্ণ সেচে ফেলে রৌদ্রে ভালোভাবে শুকিয়ে অতিরিক্ত কাদামাটি তুলে ফেলতে হবে। নার্সারি পুকুরে যাতে পোনার জন্য ক্ষতিকর কোন প্রাণী (সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি) না থাকতে পারে বা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পুকুরের চারদিকে নাইলন নেটের বেড়া দেয়া প্রয়োজন। পুকুর প্রস্তুতির সময় মাটিতে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগের পর সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত নাইলনের জাল দিয়ে ছেঁকে নার্সারিতে পানি প্রবেশ করাতে হবে। নার্সারি পুকুরে পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য প্রতি শতাংশে ৭৫০ গ্রাম খৈল, ৪০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৬০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর পানিতে জন্মানো হাঁসপোকা এবং বড় আকারের প্রাণিপ্লাংকটন ধ্বংস করতে হবে। এজন্য পানিতে ১-১.৫ পিপিএম হারে ডিপটারেক্স প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর এবং কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার ২৪ ঘন্টা পর নার্সারি পুকুর পোনা মজুদের জন্য উপযুক্ত হবে।

পুকুরে পোনা মজুদকরণ

নার্সারি পুকুরে ২.০-২.৫ সেমি আকারের রেণু পোনা প্রতি শতাংশে ৮,০০০-১০,০০০টি হারে মজুদ করা যেতে পারে। পোনা সকালে কিংবা সন্ধ্যায় মজুদ করতে হবে। মজুদের সময় নার্সারি পুকুরের পরিবেশের সাথে পোনাগুলোকে ধীরে ধীরে অভ্যস্তকরণ করে নিতে হবে।

পোনা মজুদ পরবর্তী নার্সারি ব্যবস্থাপনা
(Post nursery management of fingerlings)

পোনার বৃদ্ধি ও পানির প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার ওপর ভিত্তি করে পূর্বে উল্লিখিত পরিমাণের অর্ধেক পরিমাণ সার এক সপ্তাহ পর পর প্রয়োগ করতে হবে এবং নিয়মিত পানির বিভিন্ন গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে। পোনা মজুদের দ্বিতীয় দিন থেকে ১ম সপ্তাহে প্রতি দশ হাজার পোনার জন্য ৬ কেজি হারে ৮০-১০০ মাইক্রন সাইজের শতকরা ৪০ ভাগ আমিষসমৃদ্ধ খাবার দিনে দু'বার প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে দৈনিক ২ কেজি হারে খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এভাবে ২১-২৭ দিন পর্যন্ত নার্সারিতে পোনা লালন-পালন করার পর পোনার দৈর্ঘ ৩-৪ সে.মি. লম্বা হবে এবং এ অবস্থায় পোনা চাষের জন্য মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করা যাবে।

পরামর্শ (Recommendation)

- পারসে মাছের প্রজননের জন্য হ্যাচারিতে সব ধরনের পানির সমান তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা বজায় রাখতে হবে।
- পোনা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সকল আসবাবপত্র এবং উপকরণসমূহ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- ব্রুড মাছ কিংবা পোনা যাতে কোনোভাবেই পীড়িত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রজনন মৌসুমে ব্রুড মাছের পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে পারসে মাছের চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃত্রিমভাবে এ মাছের প্রজনন সম্ভব হওয়ায় চাষের পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ মাছের প্রজননের প্রচেষ্টা যত অব্যাহত রাখা যাবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন সফলতা তত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের যে সকল নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল এলাকায় পারসে মাছের চাষের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার এক সম্ভাবনাময় দিক উন্মোচিত হয়েছে।

[১]মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
[২]মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অ.দা.), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত : মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা

Plant and Animalia Kingdom of Inland Fisheries : Significant Roles on Fish Production and Biodiversity Conservation

ড. সৈয়দ আলী আজহার

Abstract

There are so many members of plant and Animalia kingdom living in wetlands of Bangladesh. Their roles on fish production, conservation and wellprotection of biodiversity; and life cycle of creatures are very much significant. Many members of these plant animal kingdom are consuming by human being as food, using for medicinal purposes, utilizing as means of livelihoods etc. and many are playing vital role as a source of food for fish and other carnivorous animals. Some members are very much dangerous for humanbeing besides their useful roles. But as a whole they are maintaining equilibrium condition of aquatic ecosystem and playing a vital role for conservation and wellprotection of biodiversity as well as on the lifecycle of many of the living entities. Therefore, it is essential to apply appropriate management and conservation tools with a view to protect and conserve all members of plant and animalia kingdom for healthy aquatic ecosystem and for the wellbeing of humanbeing and all other lives on the earth.

বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গ আসা মাত্রই একসময় আমরা শুধু পুকুরে মাছচাষ এবং উন্মুক্ত জলাশয় বা জলমহালের মাছ আহরণ ও এর ব্যবস্থাপনাকেই বুঝেছি। কিন্তু কালের বিবর্তনে মৎস্যবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় এবং এর বিকাশ ঘটে। ফলে এখন অনেক অজানা প্রযুক্তি আমাদের হাতের মুঠোয়। আর এর বদৌলতে এখনও মৎস্য সেক্টর দেশের মানুষের প্রায় ৬০% প্রাণিজ আমিষের যোগান দেয়। বিগত ১০ বছরের (২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪) মৎস্যখাতে প্রবৃদ্ধি ৫.৩৮ % (ডিওএফ, ২০১৪) যা স্পষ্টত উর্ধ্বমুখী। তবে ২০২০-২১ সালে দেশের বর্ধিত জনসাধারণের জন্য প্রক্ষেপিত মৎস্য চাহিদা ৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন অর্জনের জন্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেসব বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন, সম্পদের অতিআহরণ, ক্ষতিকর জাল ও আহরণ সরঞ্জামের ব্যবহার, জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, পলি জমে জলাশয় ভরাট হয়ে যাওয়া, কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার ইত্যাদি কারণে জলাভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীরা আজ হুমকির মধ্যে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সার্বিকভাবে জলজ ইকোসিস্টেমও হুমকির মধ্যে আছে। যা হোক অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জীবজগতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পরিচিতি এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও জীবের জীবনচক্রে তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাসমূহ অতিসংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক. উদ্ভিদ জগতের সদস্যবৃন্দ (Members of plantae kingdom)

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, আবাসন নির্মাণ, ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি, খাদ্য, জ্বালানি, ঔষধ, প্রাণীদের প্রজনন ইত্যাদি কাজে জলজ উদ্ভিদ পৃথিবীতে মানুষ আসার পর থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে; কেননা এক সময় এসব প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভিদই ছিল মূল ভরসা। মাছচাষেও উদ্ভিদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। টাঙ্গুয়ার হাওরে ২০০টি জলজ উদ্ভিদ শনাক্ত করা হয়েছে (আইইউসিএন, ২০১৫)। সম্ভবত বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জলজ উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব এখানেই। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীবিকায়ন ও জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব রক্ষায় জলজ পরিবেশে এদের ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. শেওলা (Algae)

শেওলা অতি প্রাচীন জলজ উদ্ভিদ। এদের প্রকৃত মূল নেই। এরা পাতা ও ফুলবিহীন। এরা মুক্তভাবে পানিতে ভেসে বেড়ায় বা অন্য কোনো উদ্ভিদ বা অন্য কোনো অবলম্বনের সাথে লেগে থাকে বা জলাশয়ের তলদেশে পাথর বা শক্ত কাঠামোর মধ্যে জন্ম নেয় এবং লেগে থাকে। জলাশয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের

চিত্র: উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন (বাম থেকে নীল-সবুজ, চারা, ডিডিমো, তন্তুজাতীয়, নিটেলা এবং প্লাঙ্কটন শেওলা)

শেওলা রয়েছে, যেমন- নীল-সবুজ শেওলা (blue green algae, *Cyanobacteria*); চারা (Chara/Muskgrass); ডিডিমো *(Didymo, Didymosphenia geminata);* তন্তুজাতীয় শেওলা (filamentous algae/pondscum); নিটেলা (*Nitella*) এবং এককোষী উদ্ভিদ বা কলোনিয়াল উদ্ভিদ বা প্লাঙ্কটন শেওলা (planktonic algae)। এরা প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনকারী (primary producer)। ইউফোটিক বা সানলাইট জোনে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে এরা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২. ভাসমান উদ্ভিদ (Floating vegetation)

এসব উদ্ভিদ পানির উপর ভেসে থাকে এবং বাতাস বা স্রোতের টানে এক স্থান হতে অন্য স্থানে ভেসে বেড়ায়। ঝুলন্ত মূলের সাহায্যে এরা পনি থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে। আমাদের দেশের পুকুর ও অন্যান্য জলাভূমিতে প্রধানত দু'ধরনের ভাসমান উদ্ভিদ পাওয়া যায়। যথা-

ক. প্রকৃত ভাসমান উদ্ভিদ: ক্ষুদিপানা বা গুড়িপানা (duck weed, *Lemna minor*), কচুরিপানা (waterhyacinth, *Eichhornia crassipes*), টোপাপানা (water lettuce, *Pistia stratiotes*), সিংগাড়া/সিংড়া বা পানিফল (*Trapa natans, Trapa bispinosa*) ইত্যাদি প্রকৃত ভাসমান উদ্ভিদ।

চিত্র: ভাসমান উদ্ভিদ (বাম থেকে কচুরিপানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা এবং পানি ফল)

খ. মূল তলদেশী মাটিতে আবদ্ধ ও ভাসমান পাতাযুক্ত উদ্ভিদ: লাল শাপলা, সাদা শাপলা (white water lily, *Nymphaea pubescens*), ফুটকি (*Hygroryza aristata*), লাল শাপলা (*Nymphaea rubra*), নীল শাপলা (*Nymphaea stellate*), শুশনি শাক (*Marsilea quadrifolia*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*) ইত্যাদি মূল তলদেশী মাটিতে আবদ্ধ ও ভাসমান পাতাযুক্ত উদ্ভিদ।

৩. ডুবন্ত উদ্ভিদ (Submersed vegetation)

এ জাতীয় উদ্ভিদ তুলনামূলকভাবে গভীর পানিতে সাধারণত জলাশয়ের তলায় কাদার মধ্যে জন্মে। এরা ডুবন্ত অবস্থায় থাকে; তবে ফুল ও ফল পানির বাইরে এসে জন্ম নিতে পারে। দেশের জলাশয়গুলোতে বিশেষত বিল, নদী ও প্লাবনভূমিতে গুঁড়া শেওলা (bushy pond weed, *Najas sp.*), পানি ঘাস (water weed, *Elodea sp.*), eel grass (*Vallisneria Americana*), হাইড্রিলা (*Hydrilla verticillata*), কেওরালি গাছ (Ottelia alismoides), শোলা (*Blyxa japonica, Ceratophyllum sp.*), কাটাশেওলা/কাঠলা (*Hydrilla verticillata*), কাটা ঝাজি (*Cartophyllum demersum*) ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৪. ইমারজেন্ট উদ্ভিদ (Emergent vegetation/plant)

এ জাতীয় উদ্ভিদের কান্ড ও মূল পানিতে ডুবন্ত থাকে এবং মূল জলাশয়ের তলদেশে থাকে কিন্তু উদ্ভিদসমূহের দেহের অন্যান্য অংশ পানির নিচে থাকে। এরা জলাশয়ের পাড় বরাবর জন্ম নেয়। এরা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন- অ্যারোহেড (*Sagittaria*) ক্যাটটেইল (*Typha latifolia*), বুলব্রাশ (*Scirpus*), সফটনিডিলরাশ (*Juscus acicularis*), স্মার্ট আগাছা/বিশকাটালি (*Polygonum*) ইত্যাদি।

চিত্র: ইমারজেন্ট উদ্ভিদ (বাম থেকে অ্যারোহেড, বুলরাশ, বার-রেড এবং আড়াল জাতীয় উদ্ভিদ)

৫. জলজ বৃক্ষ (Swamp trees/forest)

হাওর, প্লাবনভূমি, বিল বা নদীর পাড়, পুকুর পাড় ইত্যাদি স্থানে এদের দেখা যায়। হাওর অঞ্চলে এদের আধিক্য অনেক বেশি। পানিতে ডুবন্ত অবস্থায়ও এরা বেঁচে থাকতে পারে। যেমন- হিজল (*Barringtonia acutangula*), কড়চ (*Pongamia pinnata*), ভাতশোলা (*Aeschynomene aspera*), নলখাগড়া (*Phragmites kakra*) ইত্যাদি। বেশ কিছু গাছকে স্বল্প পানিযুক্ত স্থানে বেঁচে থাকতে দেখা যায়; যেমন- অর্জুন (*terminalia arjuna*), বরুন (*Crataeva nurvala*), বট (*Ficus bengalensis*), জারুল (*Lagerstroemia speciose*) ইত্যাদি।

৬. আচ্ছাদন প্রদানকারী উদ্ভিদ (Spreading vagetation)

এ জাতীয় উদ্ভিদের মূল জলাশয়ের কিনারায় মাটিতে আবদ্ধ থাকে কিন্তু উদ্ভিদসমূহের কান্ড এবং পাতা পানির উপরিতলে সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পানির উপরিতল ঢেকে ফেলে এবং এর ফলে এক প্রকার আচ্ছাদন তৈরি হয়। যেমন- কেশরদাম (water primrose, *Jussiacea repens*), হেলেঞ্চা (*Enhydra fluctuans*), কলমিলতা (*Ipomaea reptans*), মালঞ্চ (alligator weed, *Alternanthera philoxerodies*) ইত্যাদি।

৭. অনুপ্রবেশকারী উদ্ভিদ (Invasive plants)

দেশে বেশ কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলো উজান থেকে পানিতে ভেসে এসে এখন বাংলাদেশের জলাভূমিতেও ব্যাপকভাবে জন্ম নিয়েছে। আন্তঃদেশীয় নদীসংযোগ, অতিথি পাখির মলের মাধ্যমে বীজ পানিতে ও মাটিতে আসা, অবৈধ উপায়ে বীজ জবা চারা নিয়ে আসা ইত্যাদি উপায়ে এগুলোর আগমন হয়েছে। ঢোল কলমি (*Ipomoea fistulosa*) এমনই একধরণের উদ্ভিদ যা ভারত থেকে এসেছে।

খ. প্রাণিজগতের সদস্যবৃন্দ (Members of Animalia Kingdom)

খাদ্য শিকলে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের পরিপূরক। মাংসাশী বা রাক্ষুসে শ্রেণীর জলজ প্রাণীরা ছোট-বড় প্রাণীদের খেয়েই বেঁচে আছে। আর মাছের বিষয়ে বলতে গেলে সকল প্রাকৃতিক জলাভূমির অধিকাংশ মাছই কম-বেশি মাংসাশী বা রাক্ষুসে স্বভাবের। তাই অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীবিকায়ন ও জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব রক্ষায় জলজ প্রাণীদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে জলাভূমির প্রাণী জগতের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

১. প্রাণিকণা (Zooplankton)

জলজ প্রাণীদের মাছচাষ ও উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে প্রাণিকণা (*zooplankton*)। এরা উদ্ভিদ

কণার চেয়ে আকারে বড়। এদের অনেক প্রজাতি খালি চোখেও দৃশ্যমান। বসমিনা, ডেফনিয়া, সাইক্লোপস, ইউগ্লেনা ইত্যাদি প্রাণিকণা আমাদের দেশের সকল পুকুর ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জলাশয়সমূহে পাওয়া যায়।

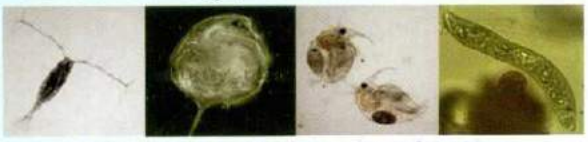

চিত্র: প্রাণিকণা- বাম থেকে সাইক্লোপস, ড্যাফনিয়া, বসমিনা ও ইউগ্লেনা

২. তলদেশীয় প্রাণীসমূহ (Benthic organisms)

প্রকৃতিতে অধিকাংশ মাছই রাক্ষুসে শ্রেণির আর এরা প্রায় সকলেই তলদেশীয় বিভিন্ন প্রাণীদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বিশেষত তলদেশীয় মাছসমূহ প্রায় সবাই বোটম ফিডার। ফলে এদের উৎপাদন বেনথিক বা তলদেশীয় প্রাণীসমূহের প্রাচুর্যের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রকারের বেনথিক প্রাণী জলাভূমিতে পাওয়া যায়। তলদেশীয় প্রাণীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক. অ্যানিলিডা (Annelida)

অ্যানিলিড প্রাণীদের শরীর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। অ্যানিলিড প্রাণীদের মধ্যে পলিকিটা *(Polychaeta)* এবং ওলিগোকিটা (*Oligochaeta*) জলাভূমিতে বিদ্যমান। পলিকিটের শরীরে অসংখ্য কুচি গুচ্ছাকারে সন্নিবেশিত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয়সমূহে পলিকিটের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। হাওরসহ বিভিন্ন নদীসমূহে একটি প্রজাতি শনাক্ত করা গেছে। ওলিগোকিট *Tubifex* নর্দমা বা ড্রেনে প্রচুর পরিমাণে লক্ষণীয়। এছাড়াও *Branchiura sp. Aleosoma sp. Limnodrilus sp. Dero sp.* ইত্যাদি ওলিগোকিটা জলাভূমিতে পাওয়া যায়।

হিরোডিনিয়া *(Hirudinea)*: এরা জোক বা জোক জাতীয় প্রাণী। এরা রক্ত শোষক। মাছের শরীর থেকে সাকারের মাধ্যমে রক্ত শোষক করার জন্য এদের ঝুলে থাকতে দেখা যায়। আগাছাযুক্ত জলাশয়ের পানিতে নামলে মানুষ এদের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

চিত্র: বাম থেকে: প্রথম দুটো এনিলিড- কেঁচো ও টিউবিফেক্স, তৃতীয়টি হিরোডিনিয়া- জোক

খ. কৃমিজাতীয় প্রাণী

মাছে প্রধানত তিন ধরনের কৃমির সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়, যথা- গোলকৃমি (round worm, Nemathelminthes): এদের কাপ ক্যাটফিস, স্নেকহেড প্রভৃতি শ্রেণীর মাছের অন্ত্রে পাওয়া যায়। *Diplogasteroides sp, Eustrongylides sp.* ইত্যাদি গোল কৃমি মাছের অন্ত্রে সংক্রামণ সৃষ্টি করে।

চ্যাপ্টা ও ফিতাকৃমি (Platyhelminthes): এ দলে চ্যাপ্টা ও ফিতাকৃমি অন্তর্ভুক্ত (চিত্র ৮)। চ্যাপ্টাকৃমি *(Flat worm)*: চ্যাপ্টাকৃমি শীতকালে আমাদের দেশে টাকি, শোল, গজার, মাগুর ইত্যাদি মাছের শরীরে সিস্ট গঠন করে এর মধ্যে বসবাস করে। অল্পসিদ্ধ মাছ খেলে মানুয়ের শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। উন্নত বিশ্বে অর্ধসিদ্ধ মাছ খাওয়ার কারণে চ্যাপ্টা কৃমিদ্বারা মানুষ এবং কুকুরের সংক্রমণ একটি বিরাট সমস্যা।

ফিতাকৃমি (Tape worm): কার্প, ক্যাটফিস, স্নেকহেড ইত্যাদি মাছের শরীরে সংক্রমণ সৃষ্টি করে। ক্রাস্টাসিয়া বিশেষ করে ফিতাকৃমির প্রধান বাহক কপিপোড যা মাছের উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক খাবার। *Diphyllobothrium latum* ফিতাকৃমি একটি খুবই সহজলভ্য প্রজাতি। শীতকালে আমাদের দেশে টাকি, শোল, গজার, বোয়াল, আঁইড় ইত্যাদি মাছের কপিপোডকে খাওয়ার ফলে মাছের পেটে সহজেই এসে যায়। আমাদের দেশে মাছ ভালভাবে সিদ্ধ করে খাওয়া হয় বলে ফিতা কৃমি দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে কিন্তু উন্নত বিশ্বে কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ মাছ খাওয়ার কারণে জনস্বাস্থ্যের জন্য এটি একটি বিরাট সমস্যা।

চিত্র: বাম থেকে: মাছের গোলকৃমি, চেপ্টাকৃমি, ফিতাকৃমি এবং ফিতাকৃমির প্রগলোটিড

ক. কাইরোনমিডি (Chironomidae):

এরা ছোট ফড়িং জাতীয় প্রাণী। ছোট ফড়িং বা ফড়িংজাতীয় প্রাণীদের ডিম পানির উপরে ছাড়ার পর জলাশয়ের তলদেশে এসে নির্ধারিত সময়ে ডিম থেকে লার্ভা বের হয়ে ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে এবং পাখা গজানের পর এক পর্যায়ে পানির ওপরে এসে উড়ে চলে যায়। জলাশয়ের তলদেশে এদের লার্ভি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যেগুলো বোটম ফিডার মাছের জন্য উৎকৃষ্ট খাবার। *Chironomus sp., Tanypus sp., Pentaneura sp.* ইত্যাদি প্রজাতি জলাভুমিতে পাওয়া যায় (চিত্র ৯)।

৩. আর্থ্রোপোড বা সন্ধিপদী প্রাণী (Arthropoda) :

প্রাণিজগতের সবচেয়ে বড় পর্ব হচ্ছে আর্থ্রোপোডা। এদেরকে সন্ধিপদী প্রাণী বলা হয়। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ প্রাণী এ পর্বের সদস্য। পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যে এদের অস্তিত্ব নেই। মাছের উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন সব সন্ধিপদী প্রাণীদের সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

চিত্র: বাম থেকে প্রথম দুটো কাইরোনমিড লার্ভি এবং শেষ দুটো মশার লার্ভি

Chaborus, Culex sp., *Aedes* sp. ইত্যাদির লার্ভি জলাশয়ে অসংখ্য পরিমাণে থাকে (উপরের চিত্র)।

খ. সিরাটোপোগোনিডি (Ceratopogonidae): এরা মাছি জাতীয় প্রাণী। এদের প্রায় সকল জলাশয়েই পাওয়া যায়। *Ceratopogon sp.* খুবই সহজলভ্য প্রজাতি। এরা রোগজীবাণু বহণকারী প্রাণী। এরাও পানিতে ডিম দেয় এবং লার্ভাসমূহ পানিতে দেখা যায়। জীবনচক্রের শেষ ধাপে পাখা গজানোর পর পানি থেকে বের হয়ে মুক্ত বাতাসে উড়ে চলে যায়। এদের লার্ভা ছোট মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র: বাম থেকে প্রথম দুটো লার্ভিসহ সিরাটিপোগন, পরে রানাট্রা, হাঁসপোকা এবং জলজ মাকড়সা

গ. কলিওপটেরা (Beetle, Coleoptera): এরা বিটল বা পোকা জাতীয় প্রাণী। প্রচুর পরিমাণ বিটল পানিতে বাস করে। প্রকৃতির বাতি রাতের জোনাকি পোকার কথা আমরা সকলেই জানি। এদের জন্ম ও বাসভূমিও পানি। *Belestoma, Ranatra, Backswimer, Dytiscus sp. Enochrus sp.* ইত্যাদি বিটল আমাদের জলাভূমিসমূহে রয়েছে।

ঘ. ট্রাইকোপটেরা (Caddies fly, Trichoptera): এরা ছোট প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ। পুকুর, নদী, খাল, বিল, প্লাবনভূমি ইত্যাদি সকল প্রকার জলাভূমিতে এদের পাওয়া যায়। *Leucotrichi, Athriopsodes, Molana, Polycentropus, Leoptocella, Limnephilus, Chimmarra* ইত্যাদি প্রজাতি আমাদের দেশের জলাভূমিতে পাওয়া যায়। এদের অনেকের লার্ভার বাইরে আবরণ থাকে যাসহ চলাচল করতে দেখা যায়। পাখা গজালে পানি থেকে বের হয়ে তারা মুক্ত বাতাসে চলে যায়।

চিত্র: বাম থেকে প্রথমটি ট্রাইকোপটেরা,মাঝে পূর্ণবয়স্ক ওডোনেটা বা ফড়িং এবং সব শেষে ড্রাগনফ্লাই লার্ভি

ঙ. ওডোনেটা (Dragon fly and damsel fly, Odoneta): এরা সকলেই ফড়িং জাতীয় প্রাণী। আমাদের জলাশয়গুলোতে *Ophiogamphus, Aphylla, Pentala, Anax, Lestes. Rhodothemis, Macromia* ইত্যাদি প্রজাতির বড় জাতের ফড়িং পাওয়া যায়। এরা দ্বিতীয় বৃহত্তম দলভুক্ত প্রাণী। এরা পানিতে ডিম ছাড়ে এবং জলাশয়ের তলদেশে ডিম থেকে লার্ভা বের হয়ে ক্রমান্বয়ে বড় হয় এবং পাখা গজালে পানির উপরে এসে উড়ে চলে যায়। জলাশয়ের তলদেশে এদের লার্ভি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যেগুলো বোটম ফিডার মাছের জন্য উৎকৃষ্ট খাবার।

চ. ক্রাস্টাসিয়ান প্রাণী: কাঁকড়া, চিংড়ি, আরগুলাস, লার্নিয়া ইত্যাদি ক্রাস্টাসিয়ান প্রাণী। গলদা (*Macrobrachium rosenbergii*), ঠেঙ্গুয়া (*Macrobrachium birmanicus*), ডিমুয়া (*Macrobrachium villosimanus*), ছটকা ইচা (*Macrobrachium malcolmsonii*), গুড়াইচা (*Macrobrachium lamarrei*) ইত্যাদি প্রজাতির চিংড়ি খুবই জনপ্রিয়। লার্নিয়া ও কপিপোড ক্রাস্টাসিয়ান প্রাণী। আরগুলাস ও লার্নিয়া উভয়ই মাছের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক বহিঃদেশীয় পরজীবী।

চিত্র: ক্রাসটাসিয়ান প্রাণী- বাম থেকে চিংড়ি, কাঁকড়া এবং আর্গুলাস

৪. মোলাস্ক (Mollusca)

প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তর পর্ব হলো মোলাস্ক। এরা এক অনন্য ধরনের খোলকযুক্ত অমেরুদন্ডী প্রাণী। এরা ভিন্ন লিঙ্গ বিশিষ্ট এবং ডিম পাড়ে। দুই ধরনের মোলাস্ক জলাভূমিতে পাওয়া যায়, যথা- ইউনিভাল্‌ভ এবং বাইভাল্‌ভ।

চিত্র: চিত্র মিঠাপনিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের ইউনিভাল্‌ভ ও বাইভাল্‌ভ মোলাস্ক

ক. ইউনিভালভ: সকল প্রকার শামুক এ দলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- *Amnicola sp. Gyraulus sp. Lymnaea sp. Physa sp, Pila globose, Planorbis sp., Thiara sp., Viviparus sp.* ইত্যাদি।

খ. বাইভালভ: সকল প্রকার ঝিনুক এ দলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- *Carbicula sp, Lamellidens sp., Unio sp* ইত্যাদি।

৫. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীসমূহ: মানুষের কাছে এরা সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীদের এখানে উল্লেখ করা হলো।

ক. পিণ্ডাকার-পাখনা বিশিষ্ট প্রাণী: জলাভূমির সকল প্রকার মাছ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় এরা শীর্ষে রয়েছে।

খ. এম্ফিবিয়ান প্রাণী বা চতুস্পদী প্রাণী: এরা চার পাযুক্ত ও উভচর প্রাণী। তবে পানিতেই ডিম পাড়ে। সকল প্রকার ব্যাঙ এ দলের সদস্য।

গ. সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী: এদের শরীর শুষ্ক ও এপিডার্মিস উদ্ভুত আঁইশ বা শক্ত প্লেটে আবৃত থাকে। সাপ, কচ্ছপ, গুইসাপ, নদীর কুমীর ইত্যাদি এই দলের সদস্য।

চিত্র: কর্ডাটা পর্বের প্রাণীসমূহ-বাম থেকে মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কচ্ছপ এবং কুমির

ঘ. অ্যাভিস বা পাখি:

এরা আকাশচারী, এদের দেহ পালকে আবৃত। বাংলাদেশে দেশীয় পাখী ছাড়াও শীতকালে জলাভূমিতে প্রচুর অতিথি পাখির আগমন ঘটে। যেমন: দেশীয় বক, কুঁড়া, সড়ালি, গাংচিল, মাছ রাঙা ইত্যাদি ছাড়াও শীতকালে চখা, লেঞ্জা হাঁস, পেরি হাঁস, ফিশ ঈগল ইত্যাদির প্রচুর সমাগম লক্ষণীয় বিষয়। যেমন: প্রতি বছর ৩০-৪০ হাজার অতিথি পাখি টাঙ্গুয়ার হাওরে আসে। এ সংখ্যা অনেক সময় ৬০ হাজার পর্যন্ত হয়ে যায়।

ঙ. স্তন্যপায়ী প্রাণী

ডলফিন, উঁদবিড়াল ইত্যাদি জলাভূমির স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মাঝে অন্যতম বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়সমূহে *Platanista gangetica* নামক প্রজাতির ডলফিন রয়েছে যার দুটো উপপ্রজাতি রয়েছে, যথা: *Platanista gangetica I Platanista gangetica minor*। *Lipotes vexillifer* নামক আরো একটি ডলফিন বাংলাদেশে পাওয়া যেত কিন্তু এটি এখন আর পাওয়া যায় না এবং এটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র সুরক্ষা ও জীবের জীবনচক্রে উদ্ভিদ ও প্রাণির ভূমিকা: অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও জীবের জীবনচক্রের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যা কোনোভাবেই খাট করে দেখার উপায় নেই। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তা উল্লেখ করা হলো:

১. খাদ্য উৎপাদনকারী ও প্রাকৃতিক খাবার হিসেবে:

প্লাঙ্কটন মাছের খাদ্য তালিকা ও খাদ্যশিকলের শীর্ষে রয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎসের প্রাথমিক খাদ্য যা খাদ্যশিকলকে সচল রাখে। উল্লেখ্য, উদ্ভিদ প্লাঙ্কটনের কিছু প্রজাতি মানুষ সরাসরি খেতে পারে। সিংগাড়া বা পানিফল,পদ্ম টোনা/পদের চাঁক, মাখনা, কেওরালি (*Ottelia alismoides*), শাপলা ইত্যাদি জলজ ফল হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতিতে আদিকাল থেকে মিশে আছে। শালুক এখনও অনেকের কাছে সমাদৃত খাবার। হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কলমি, কেওরালি, শাপলা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ শাক ও সবজি হিসেবে খাওয়ার প্রচলন সুদুর অতীতের। অন্যদিকে প্রাণিকণা ছাড়া মাছ ও চিংড়ি চাষ চিন্তাই করা যায় না। খাদ্য শিকলে উদ্ভিদকণার পরই প্রাণিকণার অবস্থান। প্রাণিকণা খাবারের জন্য উদ্ভিদ কণার ওপর নির্ভরশীল। পানিতে বসবাসকারী পোকা, কীট-পতঙ্গ, বিভিন্ন প্রকারের অমেরুদন্ডী প্রাণী, ছোট মাছ প্রাণিকণাকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। রটিফার জাতীয় প্রাণিকণা মাছচাষে প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে বিশেষ নিয়ামক। সব ধরনের কেঁচো মাছের উৎকৃষ্ট খাবার। টিউবিফেক্স কৈ, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস ও অন্যান্য ক্যাটফিসের রেণুর পছন্দনীয় খাবার বিধায় এসব মাছের হ্যাচারিতে এদের চাহিদা রয়েছে। মাছির লার্ভি ছোট মাছের খাবার হওয়ায় মাছ এদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিউলিসিড সদস্যদের লার্ভি ছোট মাছ খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। মোলাস্ক দলের সদস্যদের নরম ও মাংসল শরীর রাক্ষুসে ও তলদেশীয় মাছের খুবই প্রিয় খাবার। শামুক ও ঝিনুকের খোলক চূর্ণ পোল্ট্রি ও ফিস ফিড শিল্পে ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতিতে ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে মৃত মোলাস্ক এর খোলসই সর্ববৃহৎ উৎস। মাছের আঁইশের সজীবতা এবং শরীর নিরোগ রাখার জন্য প্রকৃতিতে ক্যালসিয়ামের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মাছচাষে বিশেষ করে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কৈ, শিং, মাগুর ইত্যাদি এবং চিংড়ি চাষে খাদ্য হিসেবে এদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

২. প্রজননে ভূমিকা: অনেক ছোট মাছের প্রজননের সময় যেমন; খলিশা, বৈচা ইত্যাদি মাছ ভাসমান বা আচ্ছাদন প্রদানকারী উদ্ভিদের মাঝে এক প্রকার ফেণা জাতীয় ভাসমান পদার্থ নির্গত করে এবং এর নিচে ডিম ছেড়ে এদের বংশবিস্তার করে। মাছের বেশ কিছু প্রজাতি ডুবন্ত উদ্ভিদের মধ্যে ডিম ছাড়ে। আড়াল জাতীয় উদ্ভিদের মাঝে কৈ, শিং, মাগুর, টাকি ইত্যাদি মাছ এবং বিভিন্ন প্রকারের অমেরুদন্ডী প্রাণীর জন্ম হয়। ফলি মাছ ধান এবং ইমার্জেন্ট উদ্ভিদের গোড়ায় গর্ত তৈরি করে তাতে ডিম ছাড়ে। মিঠাপানির জলাশয়ের পানির উপরিতল সংলগ্ন কাঁকড়া দ্বারা সৃষ্ট গভীর সুরঙ্গ বা গর্ত বাইম জাতীয় মাছ, জলজ সাপ ইত্যাদির উপযুক্ত বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।

৩. পানিতে অক্সিজেনের যোগানদাতা হিসেবে: প্ল্যাঙ্কটন বা শ্যাওলা সহ সকল সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে পানিতে অক্সিজেন উৎপাদন করে যা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীরা শ্বসনের সময় গ্রহণ করে। হাইড্রিলা অক্সিজেন উৎপাদন করে-এ সম্পর্কিত পরীক্ষাটি প্রায় সকলেরই জানা আছে। সূর্যের আলো এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ হয় যাঁর রাসায়নিক বিক্রিয়াটি নিম্নরুপ:

$$6CO_2+12H_2O= C_6H_{12}O_6+6H_2O+ 6O_2$$

৪. জৈব সার হিসেবে: সকল সবুজ উদ্ভিদ, বিশেষ করে কচুরিপানা, টোপা পানা, ফুটকি ইত্যাদিসহ অনেক জলজ সবুজ উদ্ভিদ কম্পোষ্ট সার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় যা কৃষি ফসল এবং মাছ চাষে আদর্শ জৈব সার হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কৃষি ফসল ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উক্ত সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. মাটির ক্ষয়রোধে ভূমিকা: ইমারজেন্ট উদ্ভিদ, বিশেষ করে বিন্নাছন *(Vetiveria zizaniodes)*, আগাইল বা গুগলা নল *(Phragmites kakra)*, ঢোল কলমি *(Ipomoea fistulosa)*, দুর্বাঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদ মাটির ক্ষয়রোধ করে।

৬. বাসা তৈরি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে: পদ্মটোনা, পানিকচু, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কলমি, শাপলা, মাখনা, সিংগারা বা পানিফল, কচুরিপানা, টোপাপানা, ঢোলকলমি, বেত, গুঞ্জকাটা, নলখাগড়া ইত্যাদি উদ্ভিদের মাঝে গুড়াইচা, চিকড়াবাইম, কৈ, খলিশা, বৈচা, শিং, মাগুর, টাকি, দাড়কিনা ইত্যাদি মাছ আশ্রয় নেয়, বাসা তৈরি করে এবং নিজেদের জীবন রক্ষা করে।

৭. জ্বালানি হিসেবে: হিজল, করচ, ভাতশোলা, নলখাগড়াসহ বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। বিশেষ করে হাওর অঞ্চলে এদের ব্যবহার ব্যাপক আকার।

৮. ঔষধি ও ভেষজ গুণ: হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কলমি ইত্যাদি উদ্ভিদে গাছের ঔষধি গুণ রয়েছে যেগুলো অতিপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের পেটের পীড়া নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জলজ বিষাক্ত সাপের বিষ মানুষের বেদনানাশক ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৯.পরিবেশ দুষণমুক্ত রাখায় ভূমিকা: কচুরিপানা, টোপাপানা ইত্যাদি ভাসমান উদ্ভিদ পানির পলিকে থিতিয়ে পানি পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ভাসমান, ইমার্জেন্ট ও আচ্ছাদন প্রদানকারী উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে কাজে লাগিয়ে পানিকে দূষণ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

১০. অবাঞ্ছিত মাছ নিয়ন্ত্রণে: বিষকাটালি গাছ, উরমইল গাছের ফল গুড়ো করে রোটেননের বিকল্প হিসেবে জলাশয়ের অবাঞ্ছিত মাছ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যায়।

১১. মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপাদনে: বেত আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। আদিকাল থেকে মোলাস্কের শক্ত খোলক সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

১২. জীবিকায়ন: জেলেদের জীবন ও জীবিকা মাছ আহরণ ও এর ব্যবসার সাথে প্রথাগতভাবেই জড়িয়ে আছে। জ্বালানি, শাক-সবজি, পাটি তৈরি, সাঁপুড়েদের সাপের খেলা দেখানো, উঁদবিড়াল দ্বারা মাছ শিকার ইত্যাদি মানুষের জীবিকার উৎস।

১৩. অ্যারোমেটিক গুণ: ডলফিনের তৈল মাছের জন্য আকর্ষণীয় বিধায় মাছ পানিতে ছিটিয়ে দেয়া হয়।

১৪. প্রাণীদের সাপোর্ট প্রদান: চিংড়ি, বিভিন্ন ধরনের জলজ পোকা-মাকড় ও কীট পতঙ্গ জীবন-ধারণের জন্য এদেরকে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যায়।

১৫. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা: প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

বিরূপ ভূমিকা (Adverse effect)

১. অক্সিজেন ঘাটতিতে: জলজ উদ্ভিদের অতিরিক্ত উৎপাদন জলাশয়ে অক্সিজেন ও সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা দেয়। ফলে পুকুরে মাছের উৎপাদন কমে যায়। অনেক সময় অক্সিজেনের অভাবে মাছের মৃত্যুও হয়। যেমন- সাইক্লপস, ড্যাফনিয়া ইত্যাদি।

২. রাক্ষুসে স্বভাব: রাক্ষুসে মাছ পোনা মাছের জন্য বিপজ্জনক। নদীর কুমির ভয়ঙ্কর বিপদযুক্ত প্রাণী। মানুষসহ সকল প্রাণীই এদের খাবার। ফিসিং কেট ও উঁদবিড়াল মাছচাষের পুকুরের জন্য বিপজ্জনক রাক্ষুসে প্রাণী। সাপের কতিপয় প্রজাতি ও গুইশাপ মাছ শিকার করে।

৩. পানিদূষণ ও মাছের মড়ক সৃষ্টি: নীল-সবুজ ও তন্তুজাতীয় শেওলা পানিতে আলো প্রবেশে বাধা দেয় এবং পানির স্বাদ ও গন্ধে সমস্যা সৃষ্টি করে, পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, পানিতে ব্লুম সৃষ্টি করে টক্সিন উৎপন্ন করে পানিকে বিনষ্ট করে ফেলে এবং মাছের মৃত্যু ঘটায়।

৪. মাছের শত্রুদের আশ্রয়দাতা হিসেবে: ঝোপ সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ, যেমন- কচুরিপানা, বেত, নলখাগড়া, ঢোল কলমি ইত্যাদির মাঝে মাছের শত্রু যেমন- ফিসিং কেট, উঁদবিড়াল, গুইশাপ, মাছ খেকো সাপ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে। শামুক ও ঝিনুক কিছু কৃমিজাতীয় রোগের মধ্যবর্তী বাহক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫. রোগসৃষ্টিকারী হিসেবে: জোঁক মাছের রক্ত শোষণ করে এবং মৃত্যু ঘটায়। গোলকৃমি দ্বারা সংক্রমণের কারণে মাছ যথাযথ খাদ্য গ্রহণের পরও মাছ দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে। গোলকৃমি মাছের শরীরের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে সংক্রমিত হয়ে অঙ্গের ক্ষতি করে। চ্যাপ্টা কৃমি কার্প, ক্যাটফিস, স্নেকহেড ইত্যাদি মাছের শরীরে সংক্রমণ সৃষ্টি করে। শুকর থেকে মানুষের মাঝে সংক্রমিত চ্যাপ্টাকৃমির *Taenia solium* প্রজাতিটি মানুষের মৃগীরোগের জন্য দায়ী। মাছ এদের মধ্যবর্তী পোষক। খাওয়ার ফলে এটি মানুষ বা কুকুরের পেটে চলে আসে। পানিতে জন্ম নেয়া মাছি ও মশা নানাবিধ রোগের জীবাণুর বাহক হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কলেরা, ডাইরিয়া ইত্যাদি রোগ মাছির মাধ্যমেই ছড়ায়।

৬. বিষক্রিয়া: শিং, মাগুর, কৈ, টেংড়া, চেং ইত্যাদি কাটাযুক্ত মাছের বিষক্রিয়া রয়েছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। জলজ বিষাক্ত সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও মানব কল্যাণে তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাকে কোনো অবস্থাতেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা, এদের কোন কোন্‌টি মানুষের উপকার করছে; আবার কোনটি রোগ সৃষ্টি করছে। অনেক সদস্য মাছের উৎপাদনে প্রাকৃতিক খাবারের যোগান দিচ্ছে; আবার কোনটি মাছকেই খাবার হিসেবে ব্যবহার করছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ হতে সর্বোচ্চ কল্যাণমুখী সেবা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

কনসালটেন্ট, টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম, আইইউসিএন, বাংলাদেশ

সাগর বেহুন্দি ও ভাসান জাল নির্ভর জেলেদের কর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

Status of Marine Set Bag Net and Drift Gill Net Dependant Fishers and their Future Prospect

মোঃ কদর আহমদ

Abstract

Bangladesh as a maritime nation is blessed with rich marine water fishery resources with 475 species. According to last baseline survey (BMFCBP) a total of 67,669 mechanized and non-mechanized boats and 247 industrial fishing trawlers (MFO) are engaged in fishing where about 0.50 million coastal fisher families derived their livelihood security. Due to open access nature intense fishing pressure with indiscriminate use of non-complied gears, mesh size, length and number of nets both by motorized and non-motorized boats jeopardized marine fisheries. Moreover, the industrial fishing sector operating in shallow nursery ground below 40 meter depth entraps juveniles to adult dewindling stocks of most economically valued species (Indian Salmon *Polynemous indicus,* Lambo and Black Snapper etc.). Subsequently marine fishing is becoming unpredictable and loosing venture. Boat owners are reluctant to send boat spending expenditure of Tk. 250,000.00 for 10-12 days fishing trip. BMFCBP baseline survey revealed that out of 12-15 fishing trips in a season of 9 months 4-5 trips concers loss, 4-5 trips runs at break-even point and mere 4-5 trips make profit. The verdict over maritime boundary by ITLOS established our soverign right in 118,813 sq km upto 200 nautical miles seawards as EEZ to explore and exploit all types of living and non-living resources to promote Blue Economy. Above all, sound and effective fishery resource standing stock assessment of our Bay water is a crying need to harmonize our fishing effort as well as to exercise effective monitoring, control and surveillance (MCS).

বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে স্বাদু ও লোনা পানির বৈচিত্র্যপূর্ণ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। 'মাছে ভাতে বাঙালি' এ প্রবাদ মৎস্যসম্পদের প্রাচুর্যেরই স্বাক্ষর। দেশটির ১৬ কোটি মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে অব্যাহত আহরণ চাপ এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট হাওর-বাঁওড়, নদ-নদী, খাল-বিল পলি ভরাট, কৃষি কাজে ও ম্যালেরিয়া নিরোধে ব্যবহৃত কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার মিঠাপানির মাছের জীববৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস করছে। আশার কথা মৎস্য অধিদপ্তরের সুযোগ্য দিক নির্দেশনায় প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছের সমান্তরালে মৎস্যচাষ বৃদ্ধিতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO of UN) হিসাব মতে মৎস্যচাষে বাংলাদেশ সারাবিশ্বের মধ্যে ৪র্থ স্থানে রয়েছে।

লোনা পানির বিশাল জলরাশির ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্যের আধার বঙ্গোপসাগরে ৪টি মৎস্য চারণক্ষেত্র (grazing ground) রয়েছে যা ফিসিং গ্রাউন্ড নামে পরিচিত। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের মতো বড় বড় নদী ছাড়াও ৭৪১টি ছোট বড় নদ-নদী বাহিত পুষ্টিসমৃদ্ধ পানি বঙ্গোপসাগরের সেই চারণক্ষেত্রে পতিত হয়ে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা উৎপাদন করে মৎস্যকূলের প্রজনন, খাদ্য গ্রহণ এবং ছোট মাছের লালনক্ষেত্র হিসেবে এক অনবদ্য প্রাকৃতিক আশ্রম তৈরি করেছে। গভীর সমুদ্র ও মহীসোপানের মৎস্যকূলের অধিকাংশ মাছ এই ৪টি চারণক্ষেত্রে লালিত হয়ে অভিপ্রায়ণ করে গোটা ভারত মহাসাগরকে সমৃদ্ধ করেছে। কোনো পাঠক প্রশ্ন ওঠাতে পারেন এই তথ্যের যুক্তি বা পরিসংখ্যানগত ভিত্তি কী? একটি উদাহরণ দিয়ে পাঠকের প্রশ্নের উত্তর খোলাসা করার জন্য আরও একটি প্রশ্নের অবতারণা করতে হলো। কর্ণফুলী, ইছামতি, শিকলবাহা, সাংগু ও চান্দখালীর রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউস সে সব নদীতে প্রজনন না করে হালদা নদীতে প্রজনন করতে আসে কেন? প্রতিটি নদীতে পাহাড়ের ঢল নামে, আকাশে ঘন কাল মেঘ, বিদ্যুৎ চমকানো, পানির পিএইচ, ক্ষারত্ব, তাপমাত্রা ও ঘোলাত্ব প্রায় এক তথাপিও সে সব নদীতে ডিম না দিয়ে হালদা নদীতে ডিম দেয়ার কারণগুলোর মধ্যে পাঠকের প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে। হালদা একটি অনন্য নদী যা ইন্ডিয়ান মেজর কার্পের প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক (gene bank) বলা হয়। এর উভয় পাড়ে ১৯টি শাখা নদী বা বড় খাল পতিত হয়ে ১৯টি ঘূর্ণন স্রোত (whirl pool) তৈরি করে। এই ঘূর্ণন স্রোতের একটু উজানে রুইজাতীয় মা মাছ ডিম ছাড়ে মাছ শুক্রাণু ছাড়ে যা ঐ ঘূর্ণন

খ. **ফসল আহরণে সতর্কতা:** আধা-পাকা বা কমপাকা শস্য আহরণ করা ঠিক নয়। এ ধরনের ফসলে এসপারজিলাস তৈরি হতে পারে। অতঃপর এ থেকে আফলাটক্সিন তৈরি হতে পারে।

গ. **ফসল শুকানোয় সতর্কতা:** ফসল কর্তনের পর ভালোভাবে শুকাতে হবে। ফসলের ভিজেভাব বা ময়েশ্চার যেন শতকরা ১৪ ভাগের কম হয়।

ঘ. **উপকরণ সংরক্ষণ পর্যায়ে সতর্কতা:** উপযুক্ত জায়গায়, উপযুক্ত পাত্রে/ব্যাগে ফসল সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে সংরক্ষিত ফসলের আর্দ্রতা বেড়ে না যায়। কোনো স্যাঁতসেঁতে ঘরে ফসল রাখা চলবে না। মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণিখাদ্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ নানা জাতের তৈলবীজ এবং এর খৈল। খৈল বেশি শুকিয়ে যাওয়া যেমন ভাল নয়, আবার বেশি আর্দ্রতা বা ভিজে-ভাবও ভাল নয়। এক্ষেত্রে এসপারজিলাস মোল্ডস জন্মানো ও আফলাটক্সিন তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ঙ. **খাদ্য উৎপাদনকারীর দায়িত্ব:** খাবারে আফলাটক্সিনের ঝুঁকি কমাতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাবার যাঁরা তৈরি করেন তাদের দায় দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তাঁদের সচেতনতা, সাবধানতা ও সতর্কতা এ ঝুঁকি কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষ ও প্রাণীর খাবার তৈরিতে গম, ভুট্টা, সোয়াবিন, বাদাম, তুলাবীজ, তিল, তিষি সরিষাসহ নানা ধরনের তৈলবীজ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এসব উপকরণ খাদ্য উৎপাদন কারখানায় সংগ্রহ, গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে নিম্নরূপ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলে উৎপাদিত খাবারে আফলাটক্সিনের ঝুঁকি প্রশমন সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

- মাছ ও প্রাণীর খাবার তৈরিতে ভিজা, অধিক আর্দ্রতাযুক্ত (শতকরা ১৪ ভাগের বেশি), চাপধরা, বিবর্ণ, পোকায় খাওয়া উপকরণ মিলগেইটে পরিহার করা। আর্দ্রতা পরীক্ষার পর উপযুক্ত হলেই কেবল গুদামে ঢুকানোর অনুমতি দিতে হবে। খামারে বা বাড়িতে তৈরি মাছ ও প্রাণীর খাবার তৈরিতেও একই ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- মাছ ও প্রাণীর খাদ্য উপকরণ কেনার চুক্তির আগে এর উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইতিহাস জেনে নেয়া ভালো। অধিক খরা, অপরিপক্ব অবস্থায় পানিতে ডোবা উপকরণ পরিহার করা ভালো। কম পরিপক্ব শস্য কর্তন করা হলে তা চিমটে লেগে যায়। এ ধরনের চিমটে লাগা উপকরণ পরিহার করা ভাল। ফসল কাটার পর কোথায়, কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল তা জেনেই চুক্তি করা উচিত।
- খাদ্য কারখানায় ভালো গুদাম ঘরে ভালোভাবে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে ঘরে ও মেঝেতে খাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ করা যাবে না।
- উপকরণের প্যাকিং ভালো হওয়া খুব জরুরি। গুদামে মালামাল ছোট ছোট স্তুপে সাজানো, গুছানো ও পরিপাটি রাখতে হবে যাতে বাতাস ও মানুষ চলাচলে কোনো অসুবিধা না হয়।
- খাদ্য গুদামে পরিকল্পিত পেস্ট ও রোডেন্ট ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে। যাতে গুদামজাত উপকরণে কোনো পোকামাকড় না ধরে। বিশেষজ্ঞ পরামর্শ মোতাবেক ফিউমিগেশন করা যেতে পারে।
- আগে আনা উপকরণ আগে ব্যবহার করতে হবে। দীর্ঘদিন ঘরে রাখা উপকরণ দিয়ে মাছ ও প্রাণীর খাবার তৈরি করা ঝুঁকিপূর্ণ।

উপসংহার (Conclusion)

ফাঙ্গাস বা মোল্ডস আক্রান্ত খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ থেকে সরাসরি আফলাটক্সিন মানব দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারে। অতঃপর মৃত্যুসহ মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াতে পারে। আবার খাদ্যের মাধ্যমে মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য খাদ্য প্রাণী আফলাটক্সিনের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। এতে চাষের প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়াসহ নানান রোগবালাইজনিত মৃত্যুহার বাড়তে পারে। আবার এ বিষের মাত্রাতিরিক্ত রেসিডিউযুক্ত মাছ, মাংস ও দানাদার খাবার খেয়ে মানুষ অসুস্থ হতে পারে। সেজন্য পচাঁ, বাসি বা ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়াজাত খাবার ও উপকরণ (গম, ভুট্টা, সয়াবিন, রাইসপালিশ, খৈল, বাদাম, ফিসমিল ইত্যাদি) সরাসরি খাওয়া কিংবা প্রাণিখাদ্যে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। এজন্য মাছ ও প্রাণিখাদ্যে যাতে আফলাটক্সিন উৎপন্ন হতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বাণিজ্যিক মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য উৎপাদনের সাথে যাঁরা বা যেসব প্রতিষ্ঠান জড়িত তাঁদের অধিকতর সচেতন থাকতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে উপকরণ ক্রয়, গ্রহণ ও সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পরিকল্পনা থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নিম্নমানের উপকরণ মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না। গুদাম ব্যবস্থাপনা অবশ্যই ভালো হতে হবে। উৎপাদনের সকল পর্যায়ে গুড ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিস (জিএম-পি) অনুসরণ করতে হবে। শুধু উৎপাদকারী নয়, খাদ্য ব্যবসায়ী, চাষি সকলকেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। চাষিরা বাড়িতে মাছ ও প্রাণিখাদ্য তৈরি করে থাকেন। মাছ ও প্রাণীর খাবার সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক ধারণা হলো- যেসব উপকরণ মানুষের খাবার তৈরির অনুপযোগী তা কম দামে কিনে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। আমাদের এ ধারণা বদলাতে হবে। মাছের খাবার তৈরিতে কোনো অবস্থাতেই নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। লোকাল কম্পিটেন্ট অথরিটি (এলসিএ) কর্তৃক খাদ্য তেরির প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন/অডিটের সময় এ বিষয়টি ভালোভাবে নজর দিতে হবে। চাষি, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্টদের সচেতন করে তুলতে হবে। আমরা অবশ্যই আফলাটক্সিনমুক্ত খাবার চাই। আসুন! সবাই মিলে সমন্বিত চেষ্টা চালাই। পচা বাসি ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়াজাত খাবার অথবা ফাঙ্গাস আক্রান্ত খাবার পরিহার করি।

বাংলাদেশের মাছ ও জলজ সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

Impacts of Climate Change on Fish and Aquatic Resources of Bangladesh

ড. জুবাইদা নাসরীন আখ্‌তার[১] ও ড. মো. খলিলুর রহমান[২]

Abstract

Fisheries are the renewable aquatic resources which provide food, nutrition, employment and foreign exchange earnings in many countries of the world. Fisheries sector assumes a unique status in Bangladesh. It has been playing a very significant role and deserves potential for future development in the agrarian economy of Bangladesh. Diversified fisheries ecosystems and fishing-based livelihoods are subjected to a wide range of climate-related variability from extreme weather events such as- floods, droughts, changes in aquatic ecosystem structure and productivity to changing patterns of diversity and abundance of fish stocks. Human induced climate change is likely to cause major shifts in ocean system productivity and surface freshwater availability. The long-term impact of climate change is less understood in fisheries sector. However, global ocean circulation patterns, sea level rise, changes in ocean salinity and pH, shifting coastal line and rise in inland water, increase sea surface temperature and extreme event all of which will affect the enriched biological properties, diversity and distribution of aquatic species. Impact of climate change on aquaculture production system can largely be grouped as: changes in air and water temperatures, changes in solar radiation, changes in sea surface temperature, changes in other oceanographic variables (currents, wind velocity and wave action etc.), and sea level rise and water stress. These changes will in turn create physiological (growth, development, reproduction, disease), ecological (organic and inorganic cycles, predation, ecosystem services) and operational (species selection, site selection, sea cage technology) changes. The difference between gradual mean changes in climate variables and intensity of the culture system are all considered here as an important general concepts when considering climate impacts. The probable impacts of climate change on aquaculture, inland open water fisheries and marine fisheries are now the great concern.

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের শুরু হতে জলবায়ু পরিবর্তন তথা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে তথা জলবায়ু পরিবর্তন হতে শুরু করেছে যা বর্তমানে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীকে পর্যাপ্ত উষ্ণ এবং বসবাস উপযোগী রাখার জন্য পৃথিবী নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস আবরণে আচ্ছাদিত। প্রকৃতির প্রতি মানুষের অন্যায় আচরণের কারণে এ নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাসের আবরণ দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। একদিকে মানুষ শিল্প-কারখানার জন্য অনবরত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করছে, অন্যদিকে কৃষি ভূমি বৃদ্ধির জন্য বন কেটে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে এনেছে। ফলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে জলবায়ু পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়েছে। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বরফের পাহাড় ও হিমালয়ের বরফ গলা শুরু হয়েছে। এতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এ দেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং করবে বলে ধরে নেয়া যায়। অসময়ে বন্যা (১৮২২, ১৮৫৪, ১৯২২, ১৯৫৫, ১৯৬৬, ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৪, ২০০৭), প্রচণ্ড খরা (১৯৫৭, ১৯৭২, ১৯৭৯), অসময়ে অতিবৃষ্টি (১৯৮৮, ১৯৯৮), ঘন ঘন সাইক্লোন (নিম্নের সারণি), টর্নেডো (এপ্রিল ১৪, ১৯৬৯; এপ্রিল ১১, ১৯৭৪; এপ্রিল ০১, ১৯৭৭; এপ্রিল ২৬, ১৯৮৯), জলোচ্ছ্বাস (১৯৭০, ১৯৯১) এর মতো দুর্যোগ বৃদ্ধি ও নদীতে লবণাক্ত পানির পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদসহ কৃষি ও অন্যান্য সেক্টরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সারণি : বাংলাদেশে আঘাত হানা কয়েকটি সাইক্লোনের বিবরণ

সাইক্লোনের তারিখ	বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ঘণ্টা)	জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা (মি)	মৃতের সংখ্যা
অক্টোবর ০৯, ১৯৬০	১৬০	৩.০-৪.০	৩,০০০
অক্টোবর ৩০, ১৯৬০	২০৮	৪.০-৬.০	৫,১৪৯
মে ০৯, ১৯৬১	১৪৪	২.৪-৩.৪	১১,৪৬৬
মে ২৮, ১৯৬৩	২০০	৪.২-৫.১	১১,৫২০
মে ১১, ১৯৬৫	১৬০	৩.৬-৪.০	১৯,২৭৯
ডিসেম্বর ১৪, ১৯৬৫	২০৮	৪.৬-৬.০	৮৭৩
অক্টোবর ০১, ১৯৬৬	১৪৪	৪.৬-৬.১	৮৫০
নভেম্বর ১২, ১৯৭০	২২৪	৬.০-৯.১	৩০০,০০০
মে ২৫, ১৯৮৫	১৫২	৩.০-৪.৬	১১,০৬৯
নভেম্বর ২৯, ১৯৮৮	১৬০	১.৫-৩.০	৫,৭০৮
মে ২৯, ১৯৯১	২২৫	৪.০-৫.০	১৩৮,৮৬৮
নভেম্বর ১৫, ২০০৭	২৪০	১.৮-২.৪	৩,৪০৬
মে ২৫, ২০০৯	৯০	১.৫-২.৪	১৯০

সূত্রঃ DMB ২০১০

নদী ও মোহনার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
(Effect of climate change on rivers and estuaries)

জানা মতে, অতীতে বাংলাদেশে অসংখ্য নদী ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৬১টি নদী আছে যার মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী। আন্তর্জাতিক নদীর ৫৪টি ভারতের সাথে ও ৩টি মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত। বরাক-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের মোট ড্রেনেজ এরিয়া ১.৭৫ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার যার মধ্য দিয়ে বছরে প্রায় ১৩৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বরাক-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদী সিস্টেম থেকে বাংলাদেশ প্রায় ৯২% পানি পায়। ভূমÐল উত্তপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে হিমালয়ের বরফ গলা ও অতিবৃষ্টির কারণে, প্রতিবছর বর্ষাকালে প্রায় সব নদীর পানির স্তর বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে আবার শীতকালে পানি কমে যাওয়ায় নদী শুকিয়ে যায় এবং পলি জমে নদীর মুখ ও মোহনা ভরাট হয়। বর্তমানে মরা নদীর সংখ্যা ১৯০টি এবং ৯৯% নদীর গভীরতা কমে গেছে। শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই বাংলাদেশের ৭৬১টি নদীতে পানির স্রোত আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় (উপরের সারণি)। ফলে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নদী ও মোহনা ভরাট হওয়ার প্রভাব মৎস্য, প্রাণী ও কৃষি সম্পদের ওপর পড়েছে এবং এর উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে জলজ পরিবেশ ধ্বংসের মুখোমুখী হচ্ছে।

মাছের প্রজাতি ও উৎপাদনের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
(Effect of climate change on fish species and prodcution)

জলবায়ু পরিবর্তনসহ মানবসৃষ্ট কারণে দেশের নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিল হতে মাছের উৎপাদন হ্রাসের সাথে সাথে প্রজাতি বিন্যাসও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীতে পানির স্রোত সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসার ফলে দেশের শতকরা ৯৭ ভাগ নদীতে মাছের প্রজাতির সংখ্যা এবং শতকরা ৮৮ ভাগ নদীতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদী, হাওর বাঁওড় ও খাল-বিল হতে যথাক্রমে ৩১, ৩৫, ২৯, ৩৪, ৩৭ এবং ২৮টি মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ভূমণ্ড উত্তপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে হিমালয়ের বরফ গলা ও অতিবৃষ্টির কারণে, প্রতিবছর বর্ষাকালে প্রায় সব নদীর পানির স্তর বিপদ এবং ৪৩, ৭৫, ৫৯, ১০২, ৫৭ এবং ৫৮টি প্রজাতির প্রাকৃতিক উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। একই কারণে চট্টগ্রামের হালদা নদীতে রুইজাতীয় মাছের ডিম এবং রেণু উৎপাদনের পরিমাণ কমে গেছে (পাশের সারণি)।

সারণী : বাংলাদেশের ৭৬১টি নদীর ভূগাঠনিক ও পারিবেশিক অবস্থা (বন্ধীতে শতকরা হার)

Co	রাজশাহী - ১৫১	খুলনা - ২০২	ঢাকা - ১৭৩	বরিশাল - ৬০	সিলেট - ৮৪	চট্টগ্রাম - ৯১	মোট - ৭৬১
Dd	১৫১ (১০০)	১৯৮ (৯৮)	১৭৩ (১০০)	৫৭ (৯৬)	৮৪ (১০০)	৯১ (১০০)	৭৫৪ (৯৯)
Df	১৫১ (১০০)	১৯২ (৯৫)	১৬৯ (৯৮)	৫৩ (৮৯)	৮৪ (১০০)	৮৯ (৯৮)	৭৩৮ (৯৭)
Dm	১৩০ (৮৬)	১৭৮ (৮৮)	১৪৭ (৮৫)	৪৫ (৭৫)	৫৪ (৬৪)	৭৫ (৮২)	৬২৯ (৮৩)
Dr	৪৫ (৩০)	৪২ (২১)	৬১ (৩৫)	২ (৩)	২৭ (৩২)	১৩ (১৪)	১৯০ (২৫)
Er	১১৪ (৭৫)	১৭৭ (৮৮)	১৪২ (৮২)	৪৮ (৮০)	৭৬ (৯০)	৮৫ (৯৩)	৬৪২ (৮৪)
Is	১৫১ (১০০)	১৯০ (৯৪)	১৭৩ (১০০)	৫০ (৮৪)	৮৪ (১০০)	৮৭ (৯৬)	৭৩৫ (৯৬)
Isn	-	২০২ (১০০)	-	৬০ (১০০)	-	১৮ (২০)	২৮০ (৩৭)
Lf	১৫১ (১০০)	২০২ (১০০)	১৭৩ (১০০)	৬০ (১০০)	৮৪ (১০০)	৯১ (১০০)	৭৬১ (১০০)
Lp	১২৮ (৮৫)	১৮২ (৯০)	১৫৮ (৯১)	৫১ (৮৫)	৭৭ (৯২)	৭৬ (৮৪)	৬৭২ (৮৮)
Ms	-	৩৪ (১৭)	-	২৯ (৪৮)	-	১৬ (১৮)	৭৯ (১০)
Of	১৫১ (১০০)	২০২ (১০০)	১৭৩ (১০০)	৬০ (১০০)	৮৪ (১০০)	৯১ (১০০)	৭৬১ (১০০)
Po	১৩ (৯)	২১ (১০)	৩২ (১৮)	৮ (১৩)	১১ (১৩)	৯ (১০)	৯৪ (১২)
Ra	৫৮ (৩৮)	৫২ (২৬)	৬৮ (৩৯)	১১ (১৮)	৪২ (৫০)	২৪ (২৬)	২৫৫ (৩৪)
Sb	১০২ (৬৭)	১৫০ (৭৪)	১৪৬ (৮৪)	৪৬ (৭৭)	৬৬ (৭৯)	৫৩ (৫৮)	৫৬৩ (৭৪)
Ue	৬২ (৪১)	৬৫ (৩২)	৯৮ (৫৮)	৩২ (৫৩)	৪১ (৪৯)	৩৩ (৩৬)	৩৩১ (৪৪)

(Co- Condition, Dd- Decreased depth, Df- Decreased fish diversity, Dm- Disrupted migration route, Dr- Dead rivers, Er- Erosion, Is- Increased siltation, Isn- Increased salinity, Lf- Low flow, Lp- Low fish production, Ms-Mouth silted, Of- Over-fishing, Po- Pollution, Ra- River-side agriculture, Sb- Sand bars, Ue- Unauthorised encroachment)

সূত্র: Rahman & Akhter 2006a

প্রতিকূল আবহাওয়া অনুঘটকের কারণে হালদা নদীর রুইজাতীয় মাছ ২০০৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে ডিম ছাড়তে পারেনি। এপ্রিল-মে ২০০৪ সালে হালদা নদী এলাকায় মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়নি কিন্তু খরায় তাপমাত্রা ছিল প্রচন্ড। এক মাস পর ২০ জুন, ২০০৪ এ বজ্রসহ প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের পর ২১ জুন ভোর রাত ৩:০০ ঘটিকায় মাছ অল্প ডিম ছেড়েছিল। ধৃত নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ ছিল ৭৮০ কেজি যা থেকে মাত্র ২০ কেজি রেণু পোনা উৎপন্ন হয়েছিল। একইভাবে ২০০৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে হালদা নদী এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য মানবসৃষ্ট কারণে গত ৫০ বছরে হাওরের পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। উজানে পাহাড়ি এলাকার বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে নদীতে ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে নদী এবং হাওরে পলি পড়ার হার ও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে হাওরের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে মৎস্যসম্পদের ওপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার হাওরে ১৯৬৭-১৯৭০ সালে মাছের উৎপাদন ছিল ১০০,০০০ মে.টন

সারণি: হালদা নদীর রুইজাতীয় মাছের ডিম এবং রেণু উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বছর	প্রজননের তারিখ	প্রজননের সময়	সংগৃহীত ডিমের পরিমাণ (কেজি)	১৯৪৫ সালের ভিত্তিতে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত রেণু ডিমের হার (%)	উৎপাদিত রেণু পোনার পরিমাণ (কেজি)	১৯৪৫ সালের ভিত্তিতে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত রেণু পোনার হার (%)
১৯৪৫*	৩০এপ্রিল	১৮:০০	৫০০০০	-	৫০০০	-
১৯৪৭*	২৩ এপ্রিল	২০:০০	৪৮৮০০	৯৭.৬	৪৯৬০	৯৯.২
১৯৪৮*	২৫ এপ্রিল	০৪:০০	৫০০০০	১০০.০	৫০০০	১০০.০
১৯৪৯*	০১ মে	২২:০০	৪৯৮০০	৯৯.৬	৪৯৯০	৯৯.৮
১৯৯৭	২৯ মে	২২:০০	১১৭০০	২৩.৪	৩০০	৬.০
২০০৩	০৩ জুন	১৬:০০	৮০০০	১৬.০	১৯৯	৪.০
২০০৪	২১ জুন	০৩:০০	৭৮০	১.৬	২০	০.৪
২০০৭	১৫ মে	১১:০০	১২৭০০	২৫.৪	৩০৭	৬.১
২০০৮	১৭ জুন	১৪:০০	৫০০০	১০.০	১২০	২.৮
২০০৯	২৪ মে	২৩:০০	৭৫০০	১৫.০	১৮০	৩.৬
২০১০	৩১ মার্চ	১৫:০০	৫৭০০	১১.৪	১৩৮	২.৮
২০১১	১৯ এপ্রিল ১৯ মে ১৬ জুন	০৯:০০ ০৬:০০ ১২:০০	৯৭০০	১৯.৪	২৩৫	৪.৭
২০১২	৮ এপ্রিল ০১ জুন	১১:০০ ০৬.০০	৭০০০০	৫১.৩	১৫৫৯	৩১.২
২০১৩	-	-	-	-	৬২৬	১২.৫২
২০১৪	-	-	-	-	৫০৮	১০.১৬

সূত্র: *DoF 1952, DoF 2014; Personal observations: 1997, 2003-2012

বিদ্যুৎ চমকানোর সংখ্যা এবং বজ্রপাতের পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য কিন্তু তাপমাত্রা ছিল প্রচন্ড। দেরীতে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে মাছের প্রজনন সফলতা কম হয় (উপরের সারণি)।

হাওরে মৎস্য বৈচিত্র্য এবং উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Effect of climate change on fish bio diversities and production in Haor)

বাংলাদেশে সিলেট-ময়মনসিংহ বেসিনে প্রায় ৪১১টি হাওর রয়েছে যার আয়তন ৫১৭৯৭ বর্গ কিলোমিটার।

যা কমে ১৯৯১- ১৯৯২ সালে ৩০,০০০ মে.টনে এসে দাঁড়িয়েছে সিলেট- ময়মনসিংহ বেসিন হতে রুইজাতীয় মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুনামগঞ্জ হাওরে ১৯৬৭ সালে রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন ছিল ৬৬.৪% যা কমে ১৯৮৪ সালে ১.৪% এসে দাঁড়িয়েছে। একই কারণে হাকালুকি হাওর হতে ৩২ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাঘাইড় ও ঘইন্যা মাছ টাংগুয়ার হাওর হতে বিলুপ্ত হতে চলেছে অন্যদিকে কাংলার হাওর হতে আংরোট, তিলাশোল ও গুতুম মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে হাইল হাওরে মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে

কিন্তু মনু নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কারণে কাউয়াদিঘি হাওর হতে ২৮ প্রজাতির মাছ হারিয়ে যেতে বসেছে। কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার হাওরে ১৯ প্রজাতির মাছের মজুদ এবং উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। অনুরূপভাবে একই জেলার মিঠামইন উপজেলার হাওরের ১০ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হতে চলেছে। নেত্রকোণা জেলার হাওর হতে নান্দিল, তিলাশোল এবং আংরোট মাছ হারিয়ে গেছে। অন্যদিকে কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, রুই, গুজি, চিতল ও বোয়াল মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে।

মাছের প্রজননক্ষেত্র, প্রজনন ঋতু ও অভিপ্রয়াণের ওপর প্রভাব (Effect on breeding ground, spawing season and migration of fish)

মাছের প্রজননক্ষেত্র, প্রজনন ঋতু, সময় ও অভিপ্রয়াণ প্যাটার্নের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ১৯৪০ সালের দিকে মেজর কার্প যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালবাউসের চারটি স্টক বাংলাদেশের হালদা, আপার মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদীতে ডিম ছাড়তো। বর্তমানে আপার মেঘনা স্টক ভারতের মনিপুর রাজ্যের টিপাইমুখ এলাকার বরাক নদীতে, ব্রহ্মপুত্র নদীর স্টক ভারতের আসাম রাজ্যের কামরূপ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীতে, পদ্মা স্টক ভারতের বিহার রাজ্যের বধূয়া ও মহানন্দা নদীতে ডিম ছাড়ে। ১৯৫০-১৯৬০ সালে হালদা নদীর স্টক উজানে নাজিরহাট ব্রীজের কাছে ডিম ছাড়তো। বর্তমানে হালদা নদীর স্টক ভাটিতে গড়দুয়ারা-মদুনাঘাট এলাকায় ডিম ছাড়ে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পলি জমে নোয়াখালী জেলার পরশুরাম উপজেলার কালিকাপুর নদীর সুস্বাদু ঘনিয়া মাছের এবং বগুড়া জেলার বাঙালি নদীর রুইজাতীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র দুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিক হতে মার্চ মাসের প্রথম দিকে ব্রুডমাছ শীতকালীন আবাসস্থল থেকে ব্রিডিং অভিপ্রয়াণ শুরু করে। যথাসময়ে বৃষ্টির অভাবে নদী ও সংযোগ খালে পানি না থাকার ফলে ব্রুডমাছ সঠিক সময়ে প্রজনন ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারে না। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত বিশেষ করে স্বল্পসময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পলি/বালি/পাথর নেমে বিল-হাওরের সাথে নদীর সংযোগকারী অংশ ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে ব্রুডমাছ ব্রিডিং অভিপ্রয়াণ করতে পারে না। অতীতে উত্তরাঞ্চলসহ প্রায় ১০০টি নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত কিন্তু মেঘনা নদীর মুখ পলি ভরাটসহ বিভিন্ন নদী ভরাট হওয়ার কারণে ইলিশ মাছ উজানে অভিপ্রয়াণ করতে পারে না। পদ্মা নদীর সাথে বড়াল, গড়াই, নবগঙ্গা, মধুমতি ও আড়িয়াল খাঁ নদীর এবং যমুনা নদীর সাথে লৌহজং, বংশী, কালীগঙ্গা ও ইছামতি নদীর সংযোগস্থল ভরাট হওয়ার কারণে রুইজাতীয় মাছের রেণু ফিডিং গ্রাউন্ডে অভিপ্রয়াণ করতে পারে না। মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা ও যথাসময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে পুকুরে মাছের গোনাডের পরিপক্বতা, প্রজনন সফলতা, নিষিক্ততা, পরিস্ফুটন ও বাঁচার হার কমে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মাছের কৃত্রিম প্রজননের ওপর প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলায় মৎস্য হ্যাচারি শিল্প আজ হুমকির মুখে পড়েছে।

ভূগর্ভস্থ পানির ওপর প্রভাব (Effect on ground waters)

বৃষ্টিপাত কম হওয়া ও নদীতে পানি না থাকার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ মানুষ ভূগর্ভস্থ পানি পান করে। ব্যাপকভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে সারা দেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ১৫ থেকে ৪৫ মিটার গভীরে চলে গেছে এবং প্রতিবছর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ১ থেকে ২ মিটার হারে গভীরে নেমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্য হ্যাচারি শিল্প হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের ৬১টি জেলার ২৭০টি উপজেলার ৮.৫০ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক দূষণের হুমকির মুখে, যার অন্যতম কারণ হলো ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার। সারাদেশে ৮.৫৭ লক্ষ টিউবওয়েলে আর্সেনিকযুক্ত পানি শনাক্ত করা হয়েছে। পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতি লিটারে ০.০১ মিগ্রা কিন্তু বাংলাদেশে এর রেঞ্জ প্রতি লিটারে ০.১ মিগ্রা থেকে ০.৫ মিগ্রা। কম বৃষ্টিপাত এবং নদীতে পানি না থাকার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রিচার্জ হতে পারে না। ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের ঘনত্ব/মাত্রা দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে।

লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ (Intrusion of saline water)

বৃষ্টিপাত কমসহ সকল আন্তর্জাতিক নদীতে বাঁধ থাকার কারণে স্রোত হ্রাস পাওয়ার ফলে শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। নদীতে স্রোত বেশী না থাকার ফলে জোয়ারের সময় পানির অনুপ্রবেশ বেশী হচ্ছে এবং সাগর থেকে উঠে আসা লবণ পানি ভাটার সময় সাগরে ফিরে যেতে পারে না। ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলসহ কুষ্টিয়া পর্যন্ত নদীর পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়েছে। নদীতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে স্বাদুপানির মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

উপসংহার (Conclusion)

পৃথিবীর জলবায়ু গ্রিনহাউজ গ্যাসের কারণে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এজন্য উন্নত বিশ্বকে আরো বেশি সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ শিল্পোন্নয়নের জন্য উন্নত দেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গত হচ্ছে। জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শক্তির অন্যান্য বিকল্প উৎস যেমন পানি, পানির স্রোত, ঢেউ, বায়ু প্রবাহ, সূর্যরশ্মি ইত্যাদি ব্যবহার বেশি করে এবং বনায়নসহ মিটিগেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রযোজ্য তা প্রত্যেকটি দেশকে মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের নদ-নদীর পানির স্রোত ধারা প্রাকৃতিকভাবে ঠিক রাখতে না পারলে শুধু মৎস্যসম্পদই ধ্বংস হবে না বরং নদীমাতৃক বাংলাদেশের উত্তরাংশ দ্রুত মরুভূমিতে রূপান্তরসহ দক্ষিণাংশ সাগরে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মিটিগেশন ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন।

[১]প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
[২]মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৬

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পদক	নাম ও ঠিকানা	ছবি
ক. স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান				
০১	**গুণগতমানের মাছের পোনা উৎপাদন** (দেশীয় প্রজাতির শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা এবং কৈ ও তেলাপিয়া মাছের পোনা)	স্বর্ণপদক	**শাহ্সুলতান শাহ্জালাল রূপালি মৎস্য হ্যাচারি** প্রো: জনাব মোঃ আব্দুল হালিম পিতা:আলহাজ্ব আহাম্মদ আলী, মাতা: মোছাঃ হালিমা খাতুন গ্রাম: বাঁশাটী মধ্যপাড়া, ডাকঘর: রামভদ্রপুর উপজেলা: মুক্তাগাছা, জেলা: ময়মনসিংহ, বিভাগ: ময়মনসিংহ	
০২	**মাছ উৎপাদন** (তেলাপিয়া মাছের একক চাষ)	স্বর্ণপদক	**হুসাইন এ্যাকুয়া ফিস ফার্ম** প্রো: জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান পিতা: মৃত জয়নাল আবেদিন, মাতা: মোছাঃ খাদিজা বেগম গ্রাম: চাঁচড়া, ডাকঘর: চাঁচড়া মোড় উপজেলা: যশোর সদর, জেলা: যশোর, বিভাগ: খুলনা	
০৩	**মাছ উৎপাদন** (কৈ মাছের একক চাষ)	স্বর্ণপদক	**জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান (টুকু)** পিতা: মৃত কাশেম আলী মোল্যা, মাতা: মোছাঃ রমিছা বেগম গ্রাম: গদখালী বাবুপাড়া, ডাকঘর: গদখালী উপজেলাঃ ঝিকরগাছা, জেলা: যশোর, বিভাগ: খুলনা	
০৪	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের অবদান**	স্বর্ণপদক	**ইরাওয়ান ট্রেডিং** প্রো: জনাব অংছিন, পিতা: মৃত মেমং, মাতা: মিসেস আমা গ্রাম: এভারসন রোড, ডাকঘর: কক্সবাজার উপজেলা: কক্সবাজার সদর, জেলা: কক্সবাজার বিভাগ: চট্টগ্রাম	
০৫	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তির অবদান**	স্বর্ণপদক	**জনাব সোহেল মোঃ জিল্লুর রহমান রিগান** সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নিজ বেতনে) ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর	
খ. রৌপ্যপদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান				
০১	**গুণগতমানের মাছের রেণু উৎপাদন** (রুই জাতীয় মাছের রেণু)	রৌপ্যপদক	**মাইজভান্ডারী মৎস্য খামার** প্রো: জনাব হামিদুল ইসলাম পিতা: মৃত খোদা বক্স ভান্ডারী, মাতা: মোছাঃ আনোয়ারা ভান্ডারী গ্রাম: বাঘমারা, ডাকঘর: মির্জাপুর, উপজেলা: শেরপুর জেলা: বগুড়া, বিভাগ: রাজশাহী	
০২	**গুণগতমানের মাছের পোনা উৎপাদন** (রুই জাতীয় মাছের পোনা)	রৌপ্যপদক	**জনাব মোঃ তমকিনুর রহমান** পিতা: মৃত কায়ম উদ্দীন আহাম্মদ, মাতা: মৃত তছকিনা বেগম গ্রাম: শিকারপুর প্রধানপাড়া, ডাকঘর: সাকোয়া উপজেলা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়, বিভাগ: রংপুর	
০৩	**মাছ উৎপাদন** (তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, কার্প মিশ্রচাষ)	রৌপ্যপদক	**জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোছেন** পিতা: মৃত ডা. ছিদ্দিক আহমদ, মাতা: সামসুন্নাহার চৌধুরী গ্রাম: আন্দারী (হিমছড়ি), ডাকঘর: সরই উপজেলা: লামা, জেলাঃ বান্দরবান, বিভাগঃ চট্টগ্রাম	
০৪	**মাছ উৎপাদন** (থাই কৈ, শিং, মাগুর, তেলাপিয়া, পাবদা গুলশা, বাটা ও রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ)	রৌপ্যপদক	**জনাব মোঃ সামছুল হক সরকার** পিতা: মৃত নিজামউদ্দিন সরকার, মাতা: মোসাঃ আনোয়ারা বেগম গ্রাম: কাটালিয়া পাড়া, ডাকঘর: সার কারখানা, উপজেলা: পলাশ জেলা: নরসিংদী, বিভাগ: ঢাকা	
০৫	**মাছ উৎপাদন** (কার্প, তেলাপিয়া, শিং, মাগুর পাবদা, গুলশা, কৈ মিশ্রচাষ)	রৌপ্যপদক	**জনাব খায়রুল ইসলাম** পিতা: মোঃ মর্তুজ আলী, মাতা: রেহেনা আক্তার গ্রাম: ভাটগাঁও, ডাকঘর: ব্রাহ্মণকুরী উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা: কিশোরগঞ্জ, বিভাগ: ঢাকা	

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পদক	নাম ও ঠিকানা	ছবি
০৬	**মাছ উৎপাদন** (পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কার্প ও শিং-মাগুর মিশ্রচাষ)	রৌপ্যপদক	**মেসার্স সাইফুল মৎস্য খামার** প্রো: জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পিতা: মোঃ আব্দুস সালাম মন্ডল, মাতা: মোছাঃ জীবন নেছা বেগম গ্রাম: মোলামগাড়ী হাট, ডাকঘর: মোলামগাড়ী হাট উপজেলা: কালাই, জেলা: জয়পুরহাট, বিভাগ: রাজশাহী	
০৭	**মাছ উৎপাদন** বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ	রৌপ্যপদক	**ছিকটিবাড়ি মৎস্য উৎপাদন সমিতি** প্রোঃ জনাব ক্যানেডি বিশ্বাস পিতা: মৃত মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা- মৃত সুমতি বিশ্বাস গ্রাম: ছিকটিবাড়ি, ডাকঘর: ছকটিবাড়ি উপজেলা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ, বিভাগ: ঢাকা	
০৮	**মাছ উৎপাদন** (খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	**জনাব মোঃ মতিউর রহমান** পিতা: মৃত আব্দুল খালেক, মাতা: মোসাঃ রোমিসা খাতুন গ্রাম: রাজারামপুর, ডাকঘর: রাজারামপুর উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিভাগ: রাজশাহী	
০৯	**মাছ উৎপাদন** (গুলশা মাছ একক চাষ)	রৌপ্যপদক	**জনাব মতিউর রহমান** পিতা: মোঃ জহর আলী, মাতা: সমেস্তা বেগম গ্রাম: শ্রীনগর পাঁচবাগ, ডাকঘর: পাঁচদোনা উপজেলা: নরসিংদী সদর, জেলা: নরসিংদী বিভাগ: ঢাকা	
১০	**বাগদা চিংড়ি উৎপাদন**	রৌপ্যপদক	**জনাব প্রফুল্ল রায়** পিতা: মৃত অনিল কৃষ্ণ রায়, মাতা: পাতা বালা রায় গ্রাম: ঘোলা, ডাকঘর: কৈয়া বাজার উপজেলা: বটিয়াঘাটা, জেলা: খুলনা বিভাগ: খুলনা	
১১	**মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকরণ**	রৌপ্যপদক	**জেমিনি সী ফুড লিমিটেড** প্রোঃ লে. কর্ণেল কাজী শাহেদ আহমেদ (অবসরপ্রাপ্ত) পিতা: মৃত কাজী আনিসুর রহমান, মাতা: মৃত হাজেরা খাতুন গ্রাম: জাবুসা, ডাকঘর ও উপজেলা: রূপসা জেলা: খুলনা বিভাগ: খুলনা	
১২	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান**	রৌপ্যপদক	**বিল রুহুল জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সংগঠন** সভাপতিঃ জনাব মোঃ মোবারক হোসেন গ্রাম: পাটুলিপাড়া, ডাকঘর: ভেড়ামারা উপজেলা: আঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা বিভাগ: রাজশাহী	
১৩	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের অবদান**	রৌপ্যপদক	**উপজেলা পরিষদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর** জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	
১৪	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান**	রৌপ্যপদক	**কাশিমপুর আদর্শ মৎস্য খামার** সাধারণ সম্পাদক: জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন গ্রাম: পশ্চিম বামন, ডাকঘর: কাশিমপুর উপজেলা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর বিভাগ: ঢাকা	
১৫	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তির অবদান**	রৌপ্যপদক	**জনাব সাধন চন্দ্র সরকার** সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০১৪-১৫)
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য সেক্টর	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা (%)	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়				
(১) মুক্ত জলাশয়				
১. নদী ও মোহনা	৮৫৩৮৬৩	১৭৪৮৭৮	৪.৭৫	২০৫
২. সুন্দরবন	১৭৭৭০০	১৭৫৮০	০.৪৮	৯৯
৩. বিল	১১৪১৬১	৯২৬৭৮	২.৫২	৮১২
৪. কাপ্তাই লেক	৬৮৮০০	৮৬৪৫	০.২৩	১২৬
৫. প্লাবনভূমি	২৬৯১৯১০	৭৩০২১০	১৯.৮২	২৭১
উপমোট	৩৯০৬৪৩৪	১০২৩৯৯১	২৭.৭৯	
(২) বদ্ধ জলাশয়				
৬. পুকুর	৩৭২৩৯৭	১৬১৩২৪০	৪৩.৭৯	৪৩৩২
৭. মৌসুমি চাষ জলাশয়	১৩৩৩৩০	২০১২৮০	৫.৪৬	১৫১০
৮. বাওড়	৫৪৮৮	৭২৬৭	০.২০	১৩২৪
৯. চিংড়ি খামার	২৭৫৫৮৩	২২৩৫৮২	৬.০৭	৮১১
১০. পেন কালচার	৭৫৫৩	১৩০৭০	০.৩৫	১৭৩০
১১. খাঁচায় মাছচাষ	১০	১৯৬৯	০.০৫	২০
উপমোট	৭৯৪৩৬১	২০৬০৪০৮	৫৫.	
অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট)	৪৭০০৭৯৫	৩০,৮৪,৩৯৯	৮৩.৭২	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়				
১২. ট্রলার	-	৮৪৮৪৬	২.৩০	-
১৩. আর্টিসেনাল	-	৫১৫০০০	১৩.৯৮	-
সামুদ্রিক জলাশয় মোট	-	৫,৯৯,৮৪৬	১৬.২৮	-
সর্বমোট	-	৩৬,৮৪,২৪৫	১০০	-

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	৯৫৪০৪৩০ (অ) ৯৩৪৯২৫৫ (বা) ০১৭১৭৪০৪১১০ (মো) ৯৫৪০১৮২ (ফ্যা) minister@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মাননীয় মন্ত্রীর পিএস	৯৫৪০৯৩০ (অ) ps_minister@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মাননীয় মন্ত্রীর এপিএস	৯৫৭৪৮১২ (অ) mizan.mofl@gmail.com
জনাব মোঃ শাহ্ আলম জনসংযোগ অফিসার	৯৫৭৮৮১৯ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫৪০৪৩০ (অ)
জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৯৫৪০০৭৫ (অ) ৯৩৬২২৫৫ (বা) ০১৭১১২১৭৫৪৮ (মো) ৯৫৪০২৫০ (ফ্যা) stateminister@mofl.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর পিএস	৯৫৪০০৭৯ (অ) ps_stateminister@mofl.gov.bd
জনাব সমীর কুমার দে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর এপিএস	৯৫৪০০৮১ (অ) samirdey274@yahoo.com
জনাব মাখম লাল শীল মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫৪০০৭৫ (অ)
জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান সচিব	৯৫৪৫৭০০ (অ) ৭২৫১৩৫৫ (বা) ০১৭১৬৪৭৫৮৫৬ (মো) ৯৫১২২২০ (ফ্যা) secretary@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ রাশেদুর রহমান সরদার সচিবের একান্ত সচিব	৯৫১৫৭৯৯ (অ) ps_secretary@mofl.gov.bd
রীনা মন্ডল সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫৪৫৭০০ (অ)
ডা. আফতাবুন নাহার মাকসুদা অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)	৯৫৭৪৪৯৫ (অ) addlsec_budget@mofl.gov.bd
ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ উপ-সচিব (বাজেট)	৯৫৫১০০৭ (অ) ds_budget@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)	৯৫১৪২০১ (অ) anisur3112@gmail.com addlsec_fisheries@mofl.gov.bd
সৈয়দ মেহদী হাসান উপ-সচিব (মৎস্য-১)	৯৫৭৭২৬২ (অ) fisheries-1@mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
বেগম হাফছা বেগম উপ-সচিব (মৎস্য-২ এবং আইন অধিশাখা)	৯৫৭৬৩৫৭ (অ) fisheries-2@mofl.gov.bd
সৈয়দ মেহদী হাসান উপ-সচিব (মৎস্য-৩)	৯৫৭৬৩৫৬ (অ) fisheries-3@mofl.gov.bd
বেগম নাসরিন সুলতানা সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)	৯৫৪০৪৩৮ (অ) fisheries-4@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান উপ-সচিব (মৎস্য-৫ অধিশাখা)	৯৫৪৯১৪১ (অ) fisheries-5@mofl.gov.bd
জনাব একরামুল হক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	৯৫৪৫৫৬৩ (অ) addlsec_admin@mofl.gov.bd
জি এস এম জাফরউল্লাহ্ উপ-সচিব (প্রশাসন-২)	৯৫৭৬৬৯৬ (অ) dsmofla@gmail.com administration-2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপ সচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৪০৪০৭(অ) administration-3@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)	৯৫৫৩৮৪০ (অ) administration-4@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ যুগ্ম সচিব (এমএফএ ও বিএফডিসি)	৯৫৪০০৮০ (অ) js_bfdc@mofl.gov.bd
কাজী ওয়াছি উদ্দিন যুগ্ম সচিব, (প্রাণিসম্পদ-২ ও ৪)	৯৫৭৬৬৯৪ (অ) js_livestock-2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ কামরুজ্জামান যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-১ ও ৩)	৯৫৬২৪৭৪ (অ) js_livestock@mofl.gov.bd
বেগম দেলোয়ারা বেগম উপ সচিব (প্রাণিসম্পদ-১)	৯৫৬৬৯৪৭ (অ) livestock-1@mofl.gov.bd
বেগম কে. এফ. এম. জেসমীন আখতার উপ সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩)	৯৫৬১১১৭ (অ) livestock-3@mofl.gov.bd
জনাব অসীম কুমার বালা উপ সচিব (প্রাণিসম্পদ-৪)	৯৫১৫৬৪৪ (অ) livestock-4@mofl.gov.bd
বেগম দিলরুবা ইয়াসমিন যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫৪৫৯৬৯ (অ) jc_planning@mofl.gov.bd
বেগম নিগার সুলতানা সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)	৯৫৭৬৬৯৮ (অ) livestock-2@mofl.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপ প্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫৭৪৮১৪ (অ) dc_planning@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহকারী প্রধান (মৎস্য পরি. ১ও ৩)	৯৫৭৪৮১৬ (অ) fisheriesplanning-1@mofl.gov.bd
বেগম তানজিনা শাহরীন সহকারী প্রধান (মৎস্য পরি. -২)	৯৫৭৪৮১৭ (অ) fisheriesplanning-2@mofl.gcv.bd
জনাব মোঃ নুরে আলম সহকারী প্রধান (প্রাস. পরি.-১)	৯৫৬১৬৭৭ (অ) livstockplanning-1@mofl.gov.bd
জনাব এইচ, এম, মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রাস. পরি.-২)	৯৫৬৫৭৭৫ (অ) livstockplanning-2@mofl.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ-আল-মারুফ সহকারী প্রধান (মনিটরিং-১)	৭১৭০১০৮ (অ) monitoring-1@mofl.gov.bd
বেগম মাহমুদা মাসুম সহকারী প্রধান (মনিটরিং-২)	৯৫৫০৩৭১ (অ) monitoring-2@mofl.gov.bd
বেগম ফাতেমা ইয়াসমিন প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মপ্রাম	৫৮৩১৬২৭৪ (অ)
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৭০৬৬০ (অ) accountsofficer@mofl.gov.bd

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকা www.fisheries.gov.bd	
সৈয়দ আরিফ আজাদ মহাপরিচালক dg@fisheries.gov.bd	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা) s_arif_azad@yahoo.com
জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার)	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) kbdmamun_1974@yahoo.com
সৈয়দ আরিফ আজাদ পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৭১৮১২ (অ) s_arif_azad@yahoo.com
জনাব নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) psofiqcdof@gmail.com
জনাব মোঃ ইসরাইল গোলদার পরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৭১৮১২ (অ) goldar4@gmail.com
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ ও পরিকল্পনা)	৯৫৬১৩৫৫ (অ) sumonazma@yahoo.com
জনাব পরিমল চন্দ্র দাস উপপরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৯৩৫৫ (অ) ৯৫৬৭২১৭ (ফ্যা) parimal.das58@yahoo.com
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ddaqua@fisheries.gov.bd goljer_1959@yahoo.com
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ) aminul@fisheries.gov.bd
জনাব আ.ক.ম. আজিজুল হক মোল্লা উপপরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ahoque1957@gamil.com
কাজী শামস আফরোজ উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৬১৭১৫ (অ) qsafroz@gmail.com
জনাব আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক উপপরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস)	০১৭১৬৬৯৬৬৩৩ (মো) ddfieldservice@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (জলমহাল)	৯৫৬০৬৫৩ (অ)
সৈয়দা শিরিন কুলসুমা খাতুন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৭২১৬ (অ) syedashirin@yahoo.com
ড. মোঃ আব্দুল কাদির জেলা মৎস্য কর্মকির্তা (রিজার্ভ) (বাস্তবায়ন)	৯৫৬৫০২১ (অ)
জনাব ফেরদৌস আহমেদ উপপ্রধান (সামুদ্রিক শাখা)	৯৫৬২৩৩৪ (অ) ferdous1959@gmail.com
জনাব এ বি এম জাহিদ হাবিব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫১৩৮৫৭ (অ) pdjatkadof@gmail.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ.দা)	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_aul@yahoo.com
জনাব মোঃ ইউসুফ খান সিস্টেম এনালিষ্ট ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক (আইসিটি শাখা)	৯৫৮১৪৭৯ (অ) yousuf@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) majibdof@yahoo.com
জনাব এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৯৩২০(অ) lutfur.dhaka@yahoo.com
জনাব তপন কুমার পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (চিংড়ি)	৯৫৫৬২৮৯ (অ) tapanaddof@yahoo.com
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান উপপ্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫১৪০৪২ (অ) ৯৫১৪০৪১ (ফ্যা) touhiddof@gmail.com
ড. আলী মোহাম্মদ ওমর ফারুক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সরবরাহ ও সেবা)	৯৫৬৭২১৯ (অ) faruqamo@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী উপপ্রধান	৯৫৭১৬৯৮ (অ) mizansiddiquee@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব কৃষ্ণেন্দু সাহা প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) sakrisna05@yahoo.com
বেগম শিল্পী দে সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)	৯৫৬৯০৪১ (অ) shilpiplus@yahoo.com
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির খান সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) houmyoun@fisheries.gov.bd
জনাবা তানমী শাহরীন সহকারী পরিচালক (মৎস্য চাষ)	৯৫৬০৫১৭ (অ) tanmi_s1988@yahoo.com
বেগম মাসুদ আরা মমি সহকারী পরিচালক	৯৫১৩৮৫৮ (অ) masudara_momi@yahoo.co.uk
জনাব সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ) sarkeripon@gmail.com
ড.মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী সহকারী পরিচালক (লিগাল শাখা)	৯৫৫০২৮০ (অ) Tanvir_h1998@yahoo.com
জনাব উম্মে কুলসুম ফেরদৌসী সহকারী পরিচালক (জলমহাল)	৯৫৬০৬৫৩ (অ) ferdousi@fisheries.gov.bd
জনাব কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ১)	৯৫৬৭২১৮ (অ) adadmin_1@fisheries.gov.bd kmmhasandof78@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) Kzaman25@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৯৫৬৬১০৩ (অ) admin-2@fisheries.gov.bd
বেগম তানমী শাহরীন সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ), ডোসিয়ার	৯৫৬৯০২৬ (অ) tanmi_s1988@yahoo.com
ড. জি এম শামসুল কবীর সহকারী প্রধান	৯৫১৪১৩৫ (অ) gmskabir@yahoo.com
জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৮৮১১২ (অ) alimuzzamanc@gmail.com
জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬০৫৪৩ (অ) firozahmedsikder@yahoo.com
জনাব হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ সহকারী প্রকৌশলী	৯৫৬৫০২৩ (অ) helalahmed@yahoo.com
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ মুকুল বাজেট অফিসার	৯৫৫৫৩৫১ (অ) sarkerferoz@yahoo.com
কাজী মফিজুল হক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৯৫৬৯২৯৫ (অ) mofiz.sodof@gmail.com
তথ্য সেবা কেন্দ্র	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)
সাধারণ শাখা	৯৫৫৪৮৭৫ (অ)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৮৮ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	
জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম এনপিডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৫৪৫৭৭ (অ) ৭১১১৫৪৪ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান ডিএনপিডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৬৮০৯ (অ) atiardof@yahoo.com
জনাব মোঃ রমজান আলী প্রকল্প পরিচালক (অতি. পরি.) ,বাঁওড় প্রকল্প (রাজস্ব)	০৪২১-৬৩১০৮ (অ)
জনাব জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক পিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫১৩৫০৭ (অ) anwarulhaque35@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আবু মাসুম সিদ্দিকী ডিপিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৮৮৫৯৪ (অ) masumdof@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ডিপিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৮৮৫৯২ (অ) habib.ict94@yahoo.com
জনাব সৈয়দ মোঃ আলমগীর ডিপিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প (২য় পর্যায়), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	৯৫৮৮৫৯৩ (অ) ah518775@yahoo.com
জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান সরকার এডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৮৮৫৯১ (অ) mkhsarkar@yahoo.com
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন পিডি, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	৯৫৮৮৭০৮ (অ) monwar.hossain@gmail.com
জনাব আয়েশা সিদ্দিকা এডি, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	৯৫৭১৬৯৬ (অ) asiddiqa16@yahoo.com
জনাব ছালেহ আহমদ এনপিডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১২১ (অ) saleh_ahmednpd@yahoo.com
জনাব এ বি এম শাব্বীর এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১৯৯ (অ) abm_sabbir@yahoo.com
জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান পিডি, ব্রুড ব্যাংক প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৯৫৮৮৫৪৬ (অ) serajurrahman62@gmail.com
জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান উপসচিব ও পিডি, এফসিডিআই প্রকল্প	৯৫৬৮৯৭ (অ) mmuhib@gmail.com
জনাব অজিত কুমার পাল উপ প্রকল্প পরিচালক, এফসিডিআই প্রকল্প	৯৫৫৮৩৩৯ (অ) akp589@hotmail.com
সরকার তরিকুল আলম সহকারী প্রকৌশলী, এফসিডিআই প্রকল্প	৯৫৬৮৯৭১(অ) alamst@live.com
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রকল্প সমন্বয়কারী, IAPP	৯১০৪৬৬৭ (অ)
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার পিডি, জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প	৯৫৫২১৭৯ (অ) arif@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিডি, বিল-নার্সারী প্রকল্প	৯৫৮৬৬৬৯ (অ) mrbe47@gmail.com
জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামান এডি, বিল-নার্সারী প্রকল্প	৯৫৮৮৩৯৬ (অ) monidof@yahoo.com
ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার এনপিডি, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প	৯৫১২৫৮৮ (অ) reaz_phd@yahoo.com
বেগম মনিকা দাস এডি, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প	৭১১৪৮৪৪ (অ)
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পিডি, মৎস্য স্থাপনা প্রকল্প	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_zul@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক সহকারী পরিচালক, মৎস্য স্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬১৩০ (অ) arazzaque41@yahoo.com
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম পরি. ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা, মৎস্য স্থাপনা প্রকল্প	৭১১৪৭০৯ (অ) rafiquedof@gmail.com
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম পিডি, নিমগাছি প্রকল্প	০১৭১১৪৭৮৮৮৬ salam_dof@59@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পিডি, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	৯৫৮৭০১১(অ) mdrafiq1101@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন এডি, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	৯৫৮৭০১০ (অ) eyasinfme@gmail.com
ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী পিডি, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ ও গবেষণা প্রকল্প	৯৫৮৮৬০৪ (অ) bborty@gmail.com
জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন পিডি, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৮১-৭৩৯৪৯ (অ) pdcomillaproject@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুর রহমান পিডি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ প্রকল্প	০৩৫১-৬২৬২৯ (অ)
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পিডি, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৫২১-৫৫৩৪৫(অ) nazruldof1969@gmail.com
জনাব মোঃ খালেদুজ্জামান এপিডি, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৫২১-৫৫৩৪৬ (অ)
জনাব মোঃ আবদুল কাইয়োম পিডি, ক্রেল প্রকল্প	৯৫৮৮৬০১ (অ) nkaiyum@yahoo.com
জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এপিডি, ক্রেল প্রকল্প	৯৫৮৮৬০২ (অ) mdhjamil@gmail.com
জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার পিডি, বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প	০৪২১-৬৪৭৩৪ (অ) pdjessore@fisheries.gov.bd

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন পরিচালক	০৩১-৭২১৭৩১ (অ) nasir_dof@yahoo.com
বেগম মরিয়ম সুলতানা উপপরিচালক	০৩১-২৫২৮২৮২ (অ) msultana860@yahoo.com
জনাব অধীর চন্দ্র দাস সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯১(অ) adhirdas7@gmail.com
জনাব সুমন বড়ুয়া সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯০ (অ)
জনাব মোঃ ইকবাল হারুন পিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট	০৩১-২৫২৯৮০০(অ) asifnafis@gmail.com

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

ড. এ. কে. এম. আমিনুল হক পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), এফটিএ, সাভার	০২-৭৭৪৭৫১৮ (অ) aminngn@yahoo.com
জনাব আ-ব-মোঃ আক্তারুজ্জামান অধ্যক্ষ, এফটিআই, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০২ (অ)
জনাব মোঃ জিয়াউল হক সরকার অধ্যক্ষ (চ.দা.), এফটিইসি, ফরিদপুর	০৬৩১-৬২৪৫৭ (অ)
জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এসএসও, এফবিটিসি, রায়পুর, লক্ষীপুর	০৩৮২২-৫৬০৩৭ (অ) ০৩৮২২-৫৬০৩৯ (ফ্যা)
জনাব তপন কুমার দাস প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (অ. দা.), এফবিটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)
জনাব মোঃ ইসহাক আলী খামার ব্যবস্থাপক, এফটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৪০২ (অ)
জনাব এস.এম. আশিকুর রহমান প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফটিসি, কৈচাদপুর	০১৭১৭৮২২৬১৪ (মো)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ	
জনাব ছালেহ আহমদ উপপরিচালক (অ.দা.), ঢাকা	৯৫৮২০১২ (অ)
বেগম প্রভাতী দেব উপপরিচালক (চ.দা.), চট্টগ্রাম	০৩১-৬৮২৬০৩ (অ)
জনাব প্রফুল্ল কুমার সরকার উপপরিচালক (চ.দা), খুলনা	০৪১-৭৬০৪৯৫ (অ)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ	
চৌধুরী মোহাম্মদ আবুল ফারাহ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার (চ.দা.), ঢাকা	০১৭১১৯০৩৪৪৬ (মো)
জনাব মোঃ শাহজাহান আলী কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার (নি.বে.), চট্টগ্রাম	০৩১-২৫৮০৮২৩ (অ)
জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার (নি.বে.), খুলনা	০৪১-৭৬২৩২৭ (অ)

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারমাড়ি, ঢাকা	
জনাব মিজানুর রহমান পরিচালক	৯১১২২৬০ (অ)
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রধান তথ্য অফিসার	৮১৩০৪৭২ (অ)
ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার	৯১১৪২৬৪ (অ)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান মহাপরিচালক	৯১৪০৮৫৭ (অ)
জনাব শেখ হেমায়েত হোসেন পরিচালক (সরেজমিন উইং)	৮১২৩১৪৭ (অ)
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	৯১৩১২৯৫ (অ)
জনাব মোঃ মনজুরুল হান্নান পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৯১১১৭৩৮ (অ)
জনাব আঃ মজিদ পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং)	৮১২৩৬৩৯ (অ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব অজয় কুমার রায় মহাপরিচালক	৯১০১৯৩২ (অ)
জনাব বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন পরিচালক (উৎপাদন)	৯১১৭৪৫৮ (অ)
জনাব ড. এ এইচ এম গোলাম মাহমুদ পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	৯৮৯৮৮৯৬ (অ)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	
ড. তালুকদার নুরুন্নাহার মহাপরিচালক	৭৭৯১৬৭৬ (অ)

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব এ এন সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী সদস্য (কৃষি)	৯১৮০৭৯৯ (অ)
জনাব ফকির মুহাম্মদ মনোয়ার হোসেন একান্ত সচিব	৯১৮০৬৪৮ (অ)
জনাব সরদার ইলিয়াস হোসেন বিভাগ প্রধান (কৃষি)	৯১১১৭২৫ (অ)
ড. শাহজাহান আলী খন্দকার যুগ্ম-প্রধান (বমপ্রাও সমন্বয়)	৯১৮০৭৫৮ (অ)
বেগম ইস্‌রাত জাহান তস্‌লিম উপ-প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭৫৪৬ (অ) ৯৬৬১৩৬৩ (বা)
বেগম শাহিনা সুলতানা সহকারী প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭০৩৯ (অ)

আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সচিব	৯১৮০৭৬১ (অ)
জনাব মোঃ ফারুক হোসেন মহাপরিচালক, সিপিটিইউ	৯১৪৪২৫২ (অ)
জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মহাপরিচালক (কৃষি,পল্লি উন্নয়ন ও গবেষণা)	৯১৮০৬৭৮ (অ)

ইআরডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন সিনিয়র সচিব	৯১১৩৭৪৩ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	
ড. আবুল কালাম আজাদ নির্বাহী চেয়ারম্যান	৯১১৩৭৪৩ (অ)
ড. কবীর ইকরামুল হক সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৮১১০৬১৮ (অ)

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা	
কৃষিবিদ আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম সভাপতি	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ মোহাম্মদ মোবারক আলী মহাসচিব	৯১১১৪৩২ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	
জনাব পিউস কস্তা চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১ (অ) ৮৩৬০১৬৬ (বা)
জনাব মোঃ ফজলুল হক পরিচালক (অর্থ)	৭১৬২৮০০ (অ) ৯৩৩১৩৫৭ (বা)
জনাব মোঃ রবিউল হক পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৬৪০০৭ (অ)
খন্দকার লুৎফন নেছা সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. ভাগ্য রানী বনিক মহাপরিচালক	৯২৬৩৮১৫ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল মহাপরিচালক	৯২৬৩৫৪০ (অ) ৯১২৪১৭৪ (বা)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	
জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান চেয়ারম্যান	৯৫৬৪৩২৮ (অ)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা	
জনাব মোঃ শেফাউল করিম উপপরিচালক (উপ-সচিব)	৯৫৮২১৬২ (অ)
জনাব সাজ্জাদ হোসেন তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৯৫৮২১৬১ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ মহাপরিচালক (চ.দা.)	০৯১-৬৫৮৭৪ (অ) ফ্যাক্স: ০৯১-৬৬৫৫৯ yahiamahmud@yahoo.com
ড. মোঃ খলিলুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন)	০৯১-৬৬২৭১০ (অ) krahman2863@yahoo.com
ড. মোঃ নূরুল্লাহ পরিচালক (গবেষণা)	০৯১-৬৫৯১০ (অ)
ড. মোঃ খলিলুর রহমান সিএসও, স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	০৯১-৫১২২১ (অ) krahman2863@yahoo.com
ড. খান কামাল উদ্দিন আহমেদ সিএসও, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট	০৪৬৮-৬২২৯১
ড. মাসুদ হোসেন খান সিএসও, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০৭(অ) rahman397@yahoo.com
ড. মোঃ ইনামুল হক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৮৫৫ (অ) hoq_me@yahoo.com
ড. সৈয়দ লুৎফর রহমান সিএসও, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা	০৪০২৭-৫৬০৩০ (অ) rahman397@yahoo.com
জনাব মোঃ আবুল বাসার এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২১৫৯ (অ)
জনাব এ এফ এম শফিকুজ্জোহা এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১-৬৮৯৮২ (অ)
ড. ডেভিড রিন্টু দাস এসএসও, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া	০৭৪১-৫৫৩১২
জনাব খোন্দকার রশীদুল হাসান এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৪
জনাব মোঃ আশরাফুল হক এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী	০৪৪২৫-৫৬০০২

মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৪০১০৬ ৬১৫১০ (ফ্যা.)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২১৩৯৩ ৭৩১২৪৪ (ফ্যা.)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯৬৬১৯০০-১৯ ৮৬১৫৫৮৩ (ফ্যা.)
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৫০৭৮৩
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১৪৯৪৯
মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৩৪৩৭৫
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৫৪২৯
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১-৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭০৮৪৭৮-৮৫
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	০৮২১-৭৬০৯৩০
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৪৪২৭-৫৬০১৪
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিসারিজ কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১ (অধ্যক্ষ)
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর	০৪২১-৬২০২০

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
এ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	৯৫৬২৮৬৮ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	৭৭৪৫০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (সি. স্কেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	০৮১-৬৩৬০০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট, বিএফএফইএ, ঢাকা	৮৩১৬৮৮২; ৮৩১৭৫৩১

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, খুলনা অঞ্চল	০৪১-৮১৩২৯২ (অ) ০৪১-৮১২৯২৫ (ফ্যা)
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, চট্টগ্রাম অঞ্চল	০৩১-৭২৪৯৪৫ (অ) ০৩১-২৫১১৮৮৭ (ফ্যা)
বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন, ঢাকা	৮৪১৭৭৩১ (অ) ৮৪১২৭০৯ (ফ্যা)
প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার এলায়েন্স	৮৩৯১৫৯৪ (অ)
সমন্বয়ক ফিসারিজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল	৯৫১৪৪৩৪ (অ)

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	৮১৫৯০০১
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৮১৫৬০০০-৮
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফএও	৮১১৮০১৫-৮
ইউএনডিপি	৮১৫০০৮৮
ওয়ার্ল্ড ফিস	৮৮১১১৫১
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আইইউসিএন	৯৮৯০৪২৩
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আইএমএফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৮৮৫২২৬৬
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮
জিআইজেড	৯৬৬৬৭০১০০০

ঢাকা বিভাগ	
বেগম ফরিদা বেগম উপপরিচালক	৯৫৫০৮২২(অ) ৯৫৬৫০২২(ফ্যা) dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব এস. এম. রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক	৯৫৫০৮২২ ৯৫৬৫০২২ (ফ্যা) rezaul6950@yahoo.com
ঢাকা জেলা	
জনাব মোঃ আবদুল কাইয়োম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৫৮৮৮৩ (অ) dfodhaka@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাভার	৭৭৪৭৫৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামরাই	০৬২২২-৭১১৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ	৭৭৬৬৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোহার	০৩৮৯৪-৬৮০০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৬২২৫-৫৬২৪৯ (অ)

মানিকগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ নুরতাজুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৭১০৩৯১(অ) dfomanikgonja@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৭১০৭৯৩(অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিঙ্গাইর	৭৭১৭১৯১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘিওর	৭৭২৭৩৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবালয়	৭৭১৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাটুরিয়া	৭৭২৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	৭৭১৫১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিরামপুর	৭৭২৮০৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	৭৭১১৫২৩ (অ)
মুন্সিগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ অলিয়ুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬১১৫৯১ (অ) dfomunshigonja@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৬১২৩৭৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীনগর	৭৬২৭৩২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজদিখান	০৬৯২৪-৮৮০২৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লৌহজং	৭৬২৫২৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টংগীবাড়ী	৭৬১৮২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গজারিয়া	৭৬১৬২৩২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মুন্সিগঞ্জ সদর	৭৬১১৫৮৩ (অ)
গাজীপুর জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬১১৫৮৩ (অ) dfogazipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০২-৯২০৫২৪৯ (অ)
সি, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৬৮২৫-৫১০৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া	০৬৮২৪-৫১৩৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর	০৬৮২২-৫১১৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ	০৬৮২৩-৫১১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, টংগী	০২-৯২৯১৩১৭ (অ)
নরসিংদী জেলা	
মোঃ তোফাজউদ্দীন আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০২-৯৪৬২৪১০ (অ) dfonarsingdi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	২০-৯৪৬২৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুরা	০২-৯৪৪৮১৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবপুর	০৬২৫৬-৭৫০৯৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরদী	০৬২৫৩-৫৬১৪৫ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশ	০২-৯৪৬৬৪১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলাবো	০৬২৫২-৬৩১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নরসিংদী সদর	০২-৯৪৬৩০০৬ (অ)
নারায়ণগঞ্জ জেলা	
বেগম মর্জিনা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৭৬৩০৬২৫ (অ) dfonarangonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৭৬৪৮৩৫৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনারগাঁ	০২-৭৬৫৬৩০১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার	০২-৭৬৫৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বন্দর	০২-৭৬৬১১১৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ	০২-৭৬৫০০২৭ (অ)
ফরিদপুর জেলা	
জনাব মোঃ এমদাদুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৩১-৬৩২২৩ (অ) dfofaridpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৩১-৬৬৬১২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুখালী	০৬৩২৬-৫৬১৫২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালমারী	০৬৩২৪-৫৬২৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলফাডাংগা	০৬৩২২-৫৬১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নগরকান্দা	০৬৩২৭-৫৬৩২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরভদ্রাসন	০৬৩২৫-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাংগা	০৬৩২৩-৫৬৫৪৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফরিদপুর সদর	০৬৩১-৬৩৯৯০ (অ)
রাজবাড়ী জেলা	
জনাব মো আফতাব হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৬৪১-৬৫৫৮৩ (অ) dforajbari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৪১-৬৫০৫৫ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ	০৬৪২৩-৫৬৩৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাংশা	০৬৪২৪-৭৫০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি	০৬৪২২-৫৬০২৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজবাড়ী সদর	০৬৪১-৬৫৩৬৪ (অ)
মাদারীপুর জেলা	
জনাব মো আখতারুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৬৬১-৬১৪৪২ (অ) dfomadaripur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৬১-৫৫৪১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালকিনি	০৬৬২২-৫৬১৮৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবচর	০৬৬২৪-৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজৈর	০৬৬২৩-৫৬১২৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাদারীপুর সদর	০৬৬১-৬১৪১৯ (অ)
গোপালগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শামীম হায়দার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৬৬৮৫৪৫৪ (অ) dfogopalgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৬৬৮৫৬১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টুঙ্গীপাড়া	০২-৬৬৫৬৩৫৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুকসেদপুর	০৬৬৫৪-৫৬২৪৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটালীপাড়া	০২-৬৬৫১৩১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাশিয়ানী	০৬৬৫২-৫৬২০৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোপালগঞ্জ সদর	০২-৬৬৮৫৯৪২ (অ)
শরীয়তপুর জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬০১-৬১৬৫৬ (অ) dfoshariatpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬০১-৬১৪৮২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ	০৬০২২-৫৬২২৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোসাইরহাট	০৬০২৪-৭৫৭৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জাজিরা	০৬০২৭-৫৬০৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডামুড্যা	০৬০২৩-৫৬৩৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়িয়া	০৬০১-৫৯১৪৫ (অ)
কিশোরগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা)	০৯৪১-৬১৯২৭ (অ) dfokishorgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৪১-৬১৭১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ	০৯৪২৭-৫৬০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভৈরব	০৯৪২৪-৭১৭১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাজিতপুর	০৯৪২৩-৬৪২৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কটিয়াদী	০৯৪২৮-৫৬১৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলিয়ারচর	০৯৪২৯-৫৬১৬৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মিঠামইন	০৯৪৩৫-৫৬০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাকুন্দিয়া	০৯৪৩৩-৫৬০৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াইল	০৯৪৩৪-৭৫১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইটনা	০৯৪২৬-৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম	০৯৪২২-৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোসেনপুর	০৯৪২৫-৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কিশোরগঞ্জ সদর	০৯৪১-৬১৮৬৯ (অ)
কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কটিয়াদি	০৯৪২৮-৫৬০৪৭ (অ)
টাঙ্গাইল জেলা	
জনাব মো লুৎফর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯২১-৬৩৬৭৮ (অ) dfotangail@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯২১-৬৪০৭১ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাপুর	০৯২২৯-৫৬২২৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর	০৯২২৬-৭৫১৪২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেলদুয়ার	০৯২২৪-৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগরপুর	০৯২৩৩-৭৩০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভুয়াপুর	০৯২২৩-৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিহাতী	০৯২২৭-৭৪০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাসাইল	০৯২২২-৫৬১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সখিপুর	০৯২৩২-৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাটাইল	০৯২২৫-৫৬০১০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুপুর	০৯২২৮-৫৬০৮৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধনবাড়ী	০৯২২৮-৫৬২৯৯ (অ)

ময়মনসিংহ বিভাগ	
জনাব মোহাম্মদ আলেক উজ্জামান উপপরিচালক (অ.দা.)	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ)
ময়মনসিংহ জেলা	
জনাব মোহাম্মদ আলেক উজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) dfomymensingh@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯১-৬৬১৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪-৫৬০৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলপুর	০৯০৩৩-৫৬১১৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নান্দাইল	০৯০২৯-৬৪৩৬০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ত্রিশাল	০৯০৩২-৫৬০৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ	০৯০২৭-৫৬০৫৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা	০৯০২৮-৭৫৩৫১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভালুকা	০৯০২২-৫৬০৫০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও	০৮০২৫-৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট	০৯০২৬-৫৬১৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধোবাউড়া	০৯০৩৪-৫৬০৮৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, শম্ভুগঞ্জ	০৯১-৬৬১৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	০৯১-৬৬৩৩৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গৌরিপুর	০৯০২৭-৫৬০১৬ (অ)
নেত্রকোনা জেলা	
শাহ মোঃ এনামুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৯৫১-৬১৪০৪ (অ) dfonetrokona@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৫১-৬১৩৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ	০৯৫২৪-৫৬০৪৪ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বারহাট্টা	০৯৫২৩-৫৬০৮৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেন্দুয়া	০৯৫২৮-৫৬০০২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২-৭৪০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পূর্বধলা	০৯৫৩২-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন	০৯৫২৯-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা	০৯৫২৭-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খালিয়াজুরী	০৯৫২৬-৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৯৫২৫-৫৬৩৪৪(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, দূর্গাপুর	০৯৫২৫-৫৬১৮৩ (অ)
জামালপুর জেলা	
জনাব মোহাম্মদ মুনীর উদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৯৮১-৬৩৬২০ (অ) dfojamalpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৮১-৬৩২০৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইসলামপুর	০৯৮২৪-৭৪১৭১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী	০৯৮২৭-৫৬২৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ	০৯৮২৩-৭৫১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারগঞ্জ	০৯৮২৫-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বকসীগঞ্জ	০৯৮২২-৫৬১৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৫৬১৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জামালপুর সদর	০৯৮১-৬৩৩৫১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৬৬১৮৪ (অ)
শেরপুর জেলা	
জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১-৬১৪৪৭ (অ) dfosherpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৩১-৬২৪৭৫ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নকলা	০৯৩২৩-৭৫০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নালিতাবাড়ী	০৯৩২৪-৭৩৩০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইগাতী	০৯৩২২-৭৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীবর্দী	০৯৩২৫-৫৬০৭৯ (অ)

খুলনা বিভাগ	
জনাব রণজিৎ কুমার পাল উপপরিচালক (চ.দা.)	০৪১-৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১-৭৬৩৩৪৫ (ফ্যা) ddkhulna@fisheries.gov.bd
জনাব মনিষ কুমার মন্ডল সহকারী পরিচালক	০৪১-২৮৫১৫১৯ (অ)
খুলনা জেলা	
জনাব অমল কান্তি রায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা)	০৪১-৭৬৩০১৬ (অ ০৪১-৭৬১৬৭৬ (ফ্যা) dfokhulna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলতলা	০৪১-৭০১৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেরখাদা	০৪০২৯-৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা	০৪০২২-৫৬০২৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫-৫৬০২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাকোপ	০৪০২৩-৫৬০৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকগাছা	০৪০২৭-৫৬২৬২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কয়রা	০৪০২৬-৫৬০৩৫ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া	০৪১-৮৯০০১২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপসা	০৪১-৮০০১২২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গল্লামারি	০৪১-৮১৩২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ডুমুরিয়া, খুলনা	০৪০২৫-৫৬১১৭ (অ)
সাতক্ষীরা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল অদুদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১-৬৩৩১৮ (অ) dfosatkhira@fisheries.gov.bd
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০১৭১২-৮৪৫৫৯৪
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৭১-৬৩৮৪০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলারোয়া	০৪৭২৪-৭৫৩২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তালা	০৪৭২৭-৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশাশুনি	০৪৭২২-৫৬০২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৭২৫-৫৬০৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্যামনগর	০৪৭২৬-৭৪০২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবহাটা	০৪৭৩২-৭২০৫৫ (অ)
বাগেরহাট জেলা	
জনাব নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৪৬৮-৬২৪৪৫ (অ) ০৪৬৮-৬২১৬১(ফ্যা) dfobagerhat@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬৮-৬২৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামপাল	০৪৬৫৭-৫৬০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ	০৪৬৫৬-৫৬২০৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোংলা	০৪৬৫৮-৭৩২১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৪৬৫৪-৫৬০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিতলমারী	০৪৬৫২-৫৬০২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোল্লাহাট	০৪৬৫৫-৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফকিরহাট	০৪৬৫৩-৫৬২৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরণখোলা	০৪৬৫৯-৫৬০৪৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৬৮-৬৪৩১৬ (অ)
যশোর জেলা	
জনাব মোঃ রমজান আলী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১-৬৫৭৫২ (অ) ০৪২১-৬০৭৫১(ফ্যা) dfojessore@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪২১-৬৮৯৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অভয়নগর	০৪২২২-৭১১২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা	০৪২২৫-৭১৫২২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনিরামপুর	০৪২২৭-৭৮৪২৪ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর	০৪২২৬-৫৬৩৭২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা	০৪২২৮-৭৫৪০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া	০৪২২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌগাছা	০৪২২৪-৫৬৩৬৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, যশোর সদর	০৪২১-৬৪০৪৬ (অ)
ঝিনাইদহ জেলা	
জনাব মোঃ আক্তার উদ্দীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা)	০৪৫১-৬২৮৫৭ (অ) ০৪৫১-৬২৯৫৭(ফ্যা) dfojhinaidah@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৫১-৬১৩৮১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৫২৩-৫৬১০৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর	০৪৫২৪-৬৫০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিণাকুন্ডু	০৪৫২২-৭৪০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশপুর	০৪৫২৫-৫৬২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শৈলকুপা	০৪৫২৬-৫৬০৬০ (অ)
নড়াইল জেলা	
জনাব হরিপদ মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১-৬২০৩৩ (অ) dfonarail@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮১-৬২০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগড়া	০৪৮২৩-৫৬৩৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া	০৪৮২২-৫৬০৫৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৮১-৬২০৬৬ (অ)
মাগুরা জেলা	
জনাব চন্দ্র শেখর নন্দী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮-৬২৩৪১ (অ) dfomagura@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮৮-৬২৩১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালিখা	০৪৮৫৩-৫৬১০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুহম্মদপুর	০৪৮৫২-৭৫১৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৪৮৫৪-৫৬১৫২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাগুরা সদর	০৪৮৮-৬২৮৫১ (অ)
কুষ্টিয়া জেলা	
ড. শেখ শফিকুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১-৬২১৮৯ (অ) dfokushtia@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক, কুষ্টিয়া	০৭১-৬২১০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭১-৭১১৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমারখালী	০৭০২৫-৭৬৪৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খোকসা	০৭০২৪-৫৬৩৭৬ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরপুর	০৭০২৬-৫৬৪৫৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা	০৭০২২-৭১৫৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৭০২৩-৭৫২৬২ (অ)
মেহেরপুর জেলা	
শেখ মোহাম্মদ মেছবাহুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১-৬২৫৪৩ (অ) dfomeherpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৯১-৬২৬৪৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুজিবনগর	০৭৯২৩-৩৭৪১৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাংণী	০৭৯২২-৭৫৮৫৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৭৯১-৬২৯১৮ (অ)
চুয়াডাঙ্গা জেলা	
জনাব মোঃ ফজলুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১-৬২৩৮৮ (অ) dfochuadanga@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৬১-৬৩১২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৭৬২৪-৭৫০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা	০৭৬২২-৫৬২৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দামুড়হুদা	০৭৬২৩-৫৬০৬৭ (অ)

রাজশাহী বিভাগ	
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান উপপরিচালক	০৭২১-৭৬০১৮৪ (অ) ddrajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী পরিচালক	০৭২১-৮৬০০০২ (অ) ০৭২১-৮৬০০০২ (ফ্যা)
বেগম মঞ্জুয়ারা বেগম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ জরিপ	০৭২১-৮৬১৫০১ (অ)
জনাব মোঃ রবিউল হাসান মৎস্যচাষ প্রকৌশলী	০৭২১-৭৬১২৪৫ (অ)
জনাব মোঃ রুহুল আমীন উপ-প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন প্রজেক্ট	০৭২১-৮৬০৫৯০ (অ)
রাজশাহী জেলা	
জনাব মোহাঃ গোলাম রাব্বানী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১-৭৬০২৪৫ (অ) dforajshahi@fisheries.gov.bd
ড. মুহা. নিয়জউদ্দিন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৭২১-৭৬০৮৫০(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পবা	০৭২১-৭৬০৮২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পুঠিয়া	০৭২২৮-৫৬৩২৪ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট	০৭২২৩-৫৬১১৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনপুর	০৭২২৬-৫৬০২৪ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী	০৭২২৫-৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৭২২৪-৫৬০২১ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘা	০৭২৩৩-৫৬১০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগমারা	০৭২২২-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর	০৭২২৯-৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজশাহী সদর	০৭২১-৮৬১৪৪০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পুঠিয়া, রাজশাহী	০৭২২৮-৫৬৩১৩ (অ)
নাটোর জেলা	
জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১-৬২৫৯০ (অ) dfonatore@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৭১-৬২৬৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়াইগ্রাম	০৭৭২৩-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গুরুদাসপুর	০৭৭২৪-৭৪৪০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া	০৭৭২৬-৬৩১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া	০৭৭২২-৭২০৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর	০৭৭২৫-৭৫০৬০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাটোর সদর	০৭৭১-৬২৯১৮ (অ)
নওগাঁ জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৭৪১-৬২৫৮৫ (অ) dfonaogaon@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৪১-৬২৮২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা	০৭৪২৫-৬২০৩৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহাদেবপুর	০৭৪২৬-৫৭১২৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীনগর	০৭৪৩৩-৫৬০৪৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আত্রাই	০৭৪২২-৭১০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	০৭৪২৭-৫৬০৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাপাহার	০৭৪৩২-৭৪০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছী	০৭৪২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামুইরহাট	০৭৪২৪-৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পত্নীতলা	০৭৪২৮-৬৩০৯৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোরশা	০৭৪২৯-৫৬০১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নওগাঁ সদর	০৭৪১-৬১৭৬১ (অ)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শামসুল আলম শাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৭৮১-৫২৪৮২ (অ) dfonawabganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৮১-৫২৮৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাচোল	০৭৮২৪-৫৬০৩২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৭৮২৫-৭৫২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোমস্তাপুর	০৭৮২৩-৭৪১১২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলাহাট	০৭৮২২-৫৬০৪৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাচোল খামার	০৭৮২৪-৫৬০৩২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, আনমুরা খামার	০৭২২৯-৫৬০২৮ (অ)
পাবনা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (ফ্যা) dfo.pabna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৩১-৬৪৯৩১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৯১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৭৩২৫-৬৪০২১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটমোহর	০৭৩২৪-৬৫৩২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটঘড়িয়া	০৭৩২২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গুড়া	০৭৩২৮-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেড়া	০৭৩২৩-৭৫১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাথিয়া	০৭৩২৭-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর	০৭৩২৯-৫৬১৬৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর খামার	০৭৩১-৫১৮৮৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী খামার	০৭৩২৬-৬৩৪২৭ (অ)
সিরাজগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১-৬২১৩৭ (অ) ০৭৫১-৬২০০৫ (ফ্যা) dfosirajgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৫১-৬২৯৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬১৮৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়গঞ্জ	০৭৫২৬-৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজীপুর	০৭৫২৫-৫৬২০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাদপুর	০৭৫২৭-৬৪৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কামারখন্দ	০৭৫২৪-৫৬০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াশ	০৭৫২৮-৪৬১০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলকুচি	০৭৫২২-৫৬৫০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌহালি	০৭৫১-৬৩৮২৩ (অ)
জয়পুরহাট জেলা	
জনাব সুভাস চন্দ্র সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১-৬২২২৪ (অ) dfojaipurhut@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৭১-৬২২৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাঁচবিবি	০৫৭১-৭৫২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালাই	০৫৭২৬-৫৬০৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আক্কেলপুর	০৫৭২২-৬৪০১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩-৫৬০৪৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পাঁচবিবি খামার	০৫৭২৪-৭৫৫৫৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ক্ষেতলাল খামার	০৫৭২৩-৫৬১৯৬(অ)

বগুড়া জেলা	
বেগম রওশন আরা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১-৬০৫৭০ (অ) dfobogra@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫১-৬৪৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৫০২৯-৭৭৪১৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদমদীঘি	০৭৪১-৬৯২২১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহালু	০৫০২৬-৫৬০৩০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম	০৫০২৭-৭৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৫০৩৩-৬৯০৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দী	০৫১-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া	০৫০২৪-৮৮০৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধুনট	০৫০২৩-৫৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাবতলী	০৫০২৫-৭৫০৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাতলা	০৫০৩২-৭৯১১৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাহানপুর	০৫১-৮২২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মালতিনগর খামার	০৫১-৬৫৩৩৮ (অ)

রংপুর বিভাগ	
মোঃ রকিব উদ্দিন বিশ্বাস উপপরিচালক rakibbiswas38@gmail.com	০৫২১-৬৪৭৭০ (অ) ০৫২১-৫৫০৪৬ (বা) ddrangpur@fisheries.gov.bd
জনাব অদ্বৈত চন্দ্র দাস সহকারী পরিচালক	০৫২১-৫৫০৪৫ (অ) adwaita41@gmail.com
রংপুর জেলা	
ড. মোঃ জিল্লুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১-৬২৯২৯ (অ) dforangpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫২১-৬২২৩০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫২২৭-৫৬০৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর	০৫২২৫-৫৬২৭৫ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ	০৫২২২-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউনিয়া	০৫২২৪-৫৬০৩৪ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গংগাচড়া	০৫২২৩-৫৬০০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগাছা	০৫২২৬-৫৬০৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ	০৫২২৮-৫৬০৩৪ (অ)
কুড়িগ্রাম জেলা	
সরকার আনোয়ারুল কবীর আহম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৫৮১-৬১৫০১ (অ) ০৫৮১-৬১০২৪ (ফ্যা) dfo.kurigram@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৮১-৬১৮৫৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী	০৫৮২৬-৫৬৩২১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলিপুর	০৫৮২৯-৫৬২৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৮২-৫৫৬০১৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজিবপুর	০৫৮২৩-৫৬২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিলমারী	০৫৮২৪-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রৌমারী	০৫৮২৫-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজারহাট	০৫৮২৭-৫৬০০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভুরুঙ্গামারী	০৫৮২২-৫৬০৭৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর খামার	০৫৮১-৬২৫০৫ (অ)
মিনি হ্যাচারী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	০৫৮২৬-৫৬৩২১ (অ)
নীলফামারী জেলা	
শাহ ইমাম জাফর সাদেক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১-৬১৫৭০ (অ) dfonilphamari@fisheries.gov.bd
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সৈয়দপুর	০৫৫১-৬১৭৭০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৫৫২৬-৭২৯৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডিমলা	০৫৫২২-৫৬২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৫৫২৫-৫৬০১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডোমার	০৫৫২৩-৭৫১৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জলঢাকা	০৫৫২৪-৬৪০৮৩ (অ)
ঠাকুরগাঁও জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার প্রাং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৫৬১-৫৩৪৬৩ (অ) dfothakurgaon@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬১-৫২৫২৭ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫৬২৪-৫৬৩৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীসংকৈল	০৫৬২৫-৫৬১১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াডাঙ্গী	০৫৫২৫-৫৬০১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিপুর	০৫৬২৩-৫৬০১৭ (অ)
দিনাজপুর জেলা	
জনাব মোঃ হাসান ফেরদৌস সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১-৬৪৪৮৬ (অ) dfodinajpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৩১-৬৩৩১৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ	০৫৩২৩-৭২৫১১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪২২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহারোল	০৫৩৩৫-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরল	০৫৩২৪-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিরিরবন্দর	০৫৩২৬-৫৬১৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৩২৭-৫৬৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরামপুর	০৫৩২২-৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাকিমপুর	০৫৩২৯-৭৫১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খানসামা	০৫৩৩২-৫৬০১০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘোড়াঘাট	০৫৩২৮-৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৫৩৩৩-৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোচাগঞ্জ	০৫৩২৫-৭৩২২১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পার্বতীপুর খামার	০৫৩৩৪-৭৪৪০১ (অ)
লালমনিরহাট জেলা	
জনাব মোঃ লতিফুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১-৬১৩৪৬ (অ) ০৫৯১-৬১১৩৭ (বা) dfolalmonirhat@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৯১-৬১০২৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৫৯২৪-৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদিতমারী	০৫৯২২-৫৬১৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতীবান্ধা	০৫৯২৩-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাটগ্রাম	০৫৯২৫-৫৬০৮৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট সদর	০৫৯১-৬১০৭১ (অ)
গাইবান্ধা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১-৬২৫৮৫ (অ) dfogaibandha@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৪১-৫১৫৪০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী	০৫৪২৪-৫৬০৫৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ	০৫৪২৩-৭৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঘাটা	০৫৪২৬-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর	০৫৪২৫-৫৬০৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলছড়ি	০৫৪২২-৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ	০৫৪২৭-৬৪০৭২ (অ)
পঞ্চগড় জেলা	
জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৫৬৮-৬১৩৬৯ (অ) dfopanchagarh@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬৮-৬১৯৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটোয়ারী	০৫৬৫২-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোদা	০৫৬৫৩-৫৬১৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ	০৫৬৫৪-৫৬০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া	০৫৬৫৫-৭৫০৬৩ (অ)
মিনি হ্যাচারী, বোদা, পঞ্চগড়	০৫৬৫৩-৫৬১৯৬ (অ)

চট্টগ্রাম বিভাগ	
কাজি ইকবাল আজম উপপরিচালক (চ.দা.)	০৮১-৭৬১২৭ (অ) ddchitagonj@fisheries.gov.bd
জনাব বিপ্লব দাস সহকারী পরিচালক	০৮১-৭৬৫১১ (অ)
চট্টগ্রাম জেলা	
বেগম প্রভাতি দেব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) dfochitagonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরসরাই	০৩০২৪-৫৬২৪৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা	০৩০২৯-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড	০৩০২৮-৫৬০৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী	০৩০৩৭-৫৬১৩৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাউজান	০৩০২৬-৫৬২৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাটহাজারী	০৩১-২৬০১৮৯৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চন্দনাইশ	০৩০৩৩-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা লোহাগাড়া	০৩০৩৪-৫৬৫১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি	০৩০২২-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতকানিয়া	০৩০৩৬-৫৬৪৭৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গুনিয়া	০৩০২৫-৫৬২০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালখালী	০৩০৩২-৫৬১৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সন্দ্বীপ	০৩০২৭-৫৬২০৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩৪৮ (অ)
কক্সবাজার জেলা	
জনাব অমিতোষ সেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৬৩২৬৮ (অ) ০৩৪১-৫১১৭৬ (ফ্যা) dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৪১-৬৪২৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী	০৩৪২৪-৭৪২৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ	০৩৪২৬-৭৫০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া	০৩৪২২-৫৬৫৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পেকুয়া	০৩৪২৮-৫৬১৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু	০৩৪২৫-৫৬২৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া	০৩৪২৭-৫৬১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	০৩৪২৩-৫৬১৫৫ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৫১১২৬ (অ)
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মৎস্যচাষ প্রকল্প, এডিপি, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৫৪৩ (অ)
ফেনী জেলা	
জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা)	০৩৩১-৭৪০৪৬ (অ) ০৩৩১-৬১২৮৭ (বা) dfo.feni@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৩১-৭৪০৭৩ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া	০৩৩২২-৭৮৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরশুরাম	০৩৩২৪-৫৬০০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী	০৩৩২৬-৭৭১৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাগনভূঞা	০৩৩২৩-৭৯১৫৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফেনী সদর	০৩৩১-৭৪২৩২ (অ)
চাঁদপুর জেলা	
জনাব মোঃ সফিকুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১-৬৩১৬৫ (অ) dfochadpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৪২৩-৫২২০১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১৮০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (দ:)	০৮৪২৬-৫৬৩৯০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (উ:)	০৮৪২৮-৫১০২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাইমচর	০৪৪২৩-৫২২০১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহরাস্তি	০৮৪২৭-৫৬২০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ	০৮৪২৪-৭৫০৫৮(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদগঞ্জ	০৮৪২২-৬৪৩৭৬(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১২৮(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ	০৮৫২৮-৭৪১০১ (অ)
কুমিল্লা জেলা	
জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮১-৭৬১৫১ (অ) dfocomilla@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদর্শ সদর	০৮১-৭৬৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বুড়িচং	০৮০২৯-৫৬১৬৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম	০৮৩২-৫১৩৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম	০৮০২০-৫৬২১১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চান্দিনা	০৮০২২৫৬৪১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবিদ্বার	০৮২৪-৫৩২৪৪ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুরাদনগর	০৮০২৬-৫৬০৩৭ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাউদকান্দি	০৮০২৩-৫৫৩৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট	০৮০৩৩-৬৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরুড়া	০৮০২৭-৫২০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ	০৮০৪২-৫৭০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেঘনা	০৮০৩৫-৫১১৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তিতাস	০৮০২৩-৫৫৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোমনা	০৮০২৫-৫৪২৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণপাড়া	০৮০২৮-৫৬২৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরগঞ্জ	০৮০৩৭-৫৩০৩১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, দেবীদ্বার খামার	০৮০২৪-৫৩৩৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জাঙ্গালিয়া খামার	০৮১-৭৬৫৪২ (অ)

রাঙ্গামাটি জেলা	
জনাব আব্দুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৫১-৬২৩২৭ (অ) ০৩৫১-৬১৩৩৪ (ফ্যা) dforangamati@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৫১-৬৩০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজস্থলি	০৩৫১-৮১০১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লংগদু	০৩৫১-৪২০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৩৫১-৩১০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নানিয়ারচর	০৩৫১-৪১০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘাইছড়ি	০৩৫১-৫৬০১৪ (অ)
বান্দরবান জেলা	
জনাব এনায়েত হোসেন চৌধুরী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ) dfobandarban@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৬১-৬৩০০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলীকদম	০৩৬১-৮১০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লামা	০৩৬১-৭১০২৮ (অ)
খাগড়াছড়ি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১-৬১৭২৬ (অ) dfokhagrachari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৭১-৬২০৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহালছড়ি	০৩৭১-৫১০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দীঘিনালা	০৩৭১-৮১০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লক্ষীছড়ি	০৩৭১-৮৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পানছড়ি	০৩৭১-৭৬০৩২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাটিরাংগা	০৩৭১-৯৬০৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মানিকছড়ি	০৩৭১-৭১০০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগড়	০৩৭১-৪৬০৯৬ (অ)
লক্ষ্মীপুর জেলা	
জনাব এস. এম. মহিবউল্লাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৮১-৬১৪৬৫ (অ) dfolaksmipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৮১-৬১৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কমলনগর	
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি	০৩৮২-৩৫৬২৭৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুর	০৩৮২-২৫৬৪৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগঞ্জ	০৩৮২-৪৭৫৪৯৫ (অ)
নোয়াখালী জেলা	
বেগম বিলকিস তাহমিনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩২১-৬১৬৮১ (অ) ০৩২১-৬১৪৭৩ (ফ্যা) dfonoakhali@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৩২১-৬১৬৪৮ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ	০৩২১-৫২৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৩২২৩-৫৬৩৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেনবাগ	০৩২২৫-৫৬১৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতিয়া	০৩২২৪-৫৬০৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটখিল	০৩২২২-৭৫০৫৩ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুবর্ণচর	০৩২২৮-৫২১৫৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কবির হাট	০৩২৩২-৫৩২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ি	০৩২২৭-৫১০১৩ (অ)
সিলেট বিভাগ	
জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন উপপরিচালক (চ.দা.)	০৮২১-৭২৬১৩০ (অ) (ফ্যা) ddsylhet@fisheries.gov.bd
আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল সি. সহকারী পরিচালক, ইউনিয়ন প্রজেক্ট	০৮২১-৭২৩২৫৭ (অ)
সিলেট জেলা	
জনাব শঙ্কর রঞ্জন দাশ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১-৭১৬২৪১ (অ) dfosylhet@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য দপ্তর	০৮২১-৭১১২৯৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮২১-২৮৭০০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ	০৮২২২-৫৬১২২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বনাথ	০৮২২৪-৫৬০৭০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর	০৮২২৯-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট	০৮২২৮-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জকিগঞ্জ	০৮২৩২-৫৬০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দক্ষিণ সুরমা	০৮২১-৬৭৮২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেঞ্চুগঞ্জ	০৮২২৬-৫৬২৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কানাইঘাট	০৮২৩৩-৫৬১১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার	০৮২২৩-৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৮২২৫-৫৬০৯৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	০৮২১-২৮৭০২২৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৪ (অ)
সুনামগঞ্জ জেলা	
জনাব সুলতান আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১-৬১৪৯৭ (অ) dfosunamgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৭১-৬১৬৬২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই	০৮৭২৪-৫৬৪৭৫ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা	০৮৭২৫-৭৫০৫১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাতক	০৮৭২৩-৫৬০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০৮৭৩২-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোয়ারাবাজার	০৮৭২৬-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাল্লা	০৮৭২৯-৫৬০৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০৮৭২২-৫৬১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালগঞ্জ	০৮৭২৮-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দ: সুনামগঞ্জ	০৮৭১-৪১০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর	০৮৭২৭-৫৬০৪২ (অ)

হবিগঞ্জ জেলা	
জনাব আশরাফ উদ্দিন আহাম্মদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১-৬৩৩৫০ (অ) dfohabigonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৩১-৬২৩১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীগঞ্জ	০৮৩২৮-৫৬৩০২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানিয়াচং	০৮৩২৪-৫৬২১০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুনারুঘাট	০৮৩২৫-৫৬১৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আজমিরীগঞ্জ	০৮৩২২-৫৬১১৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাহুবল	০৮৩২৩-৫৬০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাধবপুর	০৮৩২৭-৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাখাই	০৮৩২৬-৫৬০৩৪ (অ)
মৌলভীবাজার জেলা	
জনাব আ ক ম শফিক-উজ-জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৮১৩ (অ) dfomoulavizazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৬১-৬২৯০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল	০৮৬২৬-৭১৪৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজনগর	০৮৬২৫-৭৫৪৯৭ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলাউড়া	০৮৬২৪-৫৬৬৪৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়লেখা	০৮৬২২-৫৬৬১৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ	০৮৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জুড়ী	০৮৬২৭-৫৭১৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মৌলভীবাজার সদর	০৯৬১-৫২২৯২ (অ)

বরিশাল বিভাগ	
জনাব মোহাঃ বজলুর রশীদ উপপরিচালক	০৪৩১-৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১-২১৭৫২৭৭ (ফ্যা) ddbarishal@fisheries.gov.bd
জনাব আজিজুল হক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৪৩১-৬৩৪৫২ (অ)
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস উপ-প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন প্রকল্প	০৪৩১-৬৩২৭২ (অ)
বরিশাল জেলা	
জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১-৬৪০১৮ (অ) dfobarisal@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক	০৮৬১-৬৪০৩০(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৩১-৬২৬০৫ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাবুগঞ্জ	০৪৩২৭-৭৩০৪৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুলাদী	০৪৩২৬-৭৫২৩৭ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা	০৪৩২৪-৫৬০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আগৈলঝড়া	০৪৩২৩-৫৬২৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ	০৪৩২৮-৭৪২৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উজিরপুর	০৪৩২৯-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরনদী,	০৪৩২২-৫৬৫৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানারীপাড়া	০৪৩৩২-৫৬৩৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেদিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর খামার	০৪৩১- ২১৭৩৫১৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেহেদিগঞ্জ খামার	০৪৩২৫-৫৬১৬৫ (অ)

ভোলা জেলা	
জনাব মোঃ রেজাউল করিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১-৬২৪০৭ (অ) dfobhola@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯১-৬২৮৬৭ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশান	০৪৯২৩-৭৪০৯০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতখান	০৪৯২৪-৫৬১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তজুমদ্দীন	০৪৯২৭-৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোরহানউদ্দিন	০৪৯২২-৫৬১৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমোহন	০৪৯২৫-৭৫৬১৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনপুরা	০৪৯২৬-৫৬০২১ (অ)
ঝালকাঠি জেলা	
জনাব প্রীতিশ কুমার মল্লিক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮-৬৩২৫৮ (অ) dfojhalokathi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯৮-৬৩২৫৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজাপুর	০৪৯৫৪-৬৫৩৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাঠালিয়া	০৪৯৫২-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নলছিটি	০৪৯৫৩-৭৪০৩৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর খামার	০৪৯৮-৬২২৪১
বরগুনা জেলা	
জনাব মোঃ মোহছেন আলী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৪৪৮-৬২৩৯৬ (অ) dfoborguna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪৮-৬২৩৮১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আমতলী	০৪৪৫২-৫৬১৩৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা	০৪৪৫৫-৭৫২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বামনা	০৪৪৫৩-৫৬০৭৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী	০৪৪৫৪-৫৬১৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, বরগুনা সদর	০৪৪৮-৬২৬৮১ (অ)
পটুয়াখালী জেলা	
ড. মোঃ আবুল হাসানাত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১-৬২৫০১ (অ) dfokpatuakhali@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৪১-৬২০৯৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলাপাড়া	০৪৪২৫-৫৬৩৬১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গলাচিপা	০৪৪২৪-৫৬১৩৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ	০৪৪২৬-৭৫২৮৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দশমিনা	০৪৪২৩-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাউফল	০৪৪২২-৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুমকী	০৪৪২৭-৫৬২২৯
খামার ব্যবস্থাপক, পটুয়াখালী সদর	০৪৪১-৬২৮০৫ (অ)
পিরোজপুর জেলা	
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম সরদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১-৬২৫৯৭ (অ) dfopirojpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬১-৬২৬৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া	০৪৬২৫-৭৫১৮৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাজিরপুর	০৪৬২৬-৭৪০৫৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৪৬২৪-৫৬২৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেছারাবাদ	০৪৬২৭-৫৬০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জিয়ানগর	০৪৬২২-৫৬১৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভান্ডারিয়া	০৪৬২৩-৫৬৪৩৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর সদর	০৪৬১-৬২০৬৩ (অ)

মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
প্রফেসর ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী ডীন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	০৯১-৬৭৪২৬ (অ) subhash55chakraborty@yahoo.co.uk
ড. নাহিদ সুলতানা লাকী প্রধান, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স ২৯১০ (অ)
প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সালাম প্রধান, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স ২৯২০ (অ)
ড. মোঃ জসিম উদ্দিন প্রধান, ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স ২৯৫৬ (অ)
প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নওশাদ আলম প্রধান, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স ২৯৭২ (অ)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	
প্রফেসর ড. মোঃ ফায়েক-উজ্জামান ভাইস-চ্যান্সেলর	০৪১-৭২১৩৯৩ (অ) ০৪১-২৮৩০১১১ (বা)
প্রফেসর ড. মোঃ আইয়াজ হাসান চিশতী প্রধান, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১-৭৩২১৫৭ (অ) mahchisty@gmail.com
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	
প্রফেসর ড. মোঃ শামস উদ্দিন ভাইস-চ্যান্সেলর	০৪১-৭২১৩৯৩ (অ) ০৪১-২৮৩০১১১ (বা)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	
প্রফে. ড. মুহম্মদ আফজাল হোসাইন চেয়ারম্যান, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১-৭১১১১৭ (অ) afzalh_ru@yahoo.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
প্রফেসর ড. কানিজ ফাতেমা চেয়ারম্যান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ	৯৬৬১৯২০/৭৭৮৫ (অ) kaniz@du.ac.bd
প্রফে. ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ	৯৬৬১৯০০/৭৫৯৩ (অ) anwar1955@gmail.com
ড. এম. নিয়ামুল নাসের অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ	৯৬৬১৯২০-৫০ এক্স ৭৫৯৮ (অ)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	
প্রফেসর ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	৯২০৫৩৩১ (অ)
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	
প্রফে. ড. মোহাম্মদ নূরুল আফসার খান ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	০৩১-৬৫৯২১০(অ)
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	
ড. মোঃ শাহাব উদ্দিন ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	০৮২১-৭৬১৯৫২ (অ)
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	
ড. মোঃ রিজোয়ানুল হক ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	০৫৩১-৫১৭৩৪
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর	
ড. মোঃ আনিসুর রহমান চেয়ারম্যান, ফিশারীজ এন্ড মেরিন বায়োসাইন্স বিভাগ	০৩১-৬৫৯২১০(অ)
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী	
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর সরকার চেয়ারম্যান, ফিসারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স	০৩২১-৭১৪৮৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	
ড. এম শাহাদাত হোসেন পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্স এন্ড ফিশারিজ	০৩১-৭১০৩৪৭

সংকলনে

কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ১)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

USAID Disclaimer: "This publication is made through support provided by the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WorldFish

www.fisheries.gov.bd